পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ -সঙ্কীর্তনম্

শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি

তৃতীয় কিরণ

বা

শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্য



নামবিজ্ঞানাচার্য

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

18

শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি

(তৃতীয় কিরণ)

শ্রীভগবন্নামের শক্তি
বা
শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গাম।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গাম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি,—সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩।২০।১০-১১)

নামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি

Shree Shree Naam-Cintamani (Tritiya Kiran) by Shrimat Kanupriya Goswami

গ্রন্থস্বত্ব — শ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ, প্রাচীন মায়াপুর, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

সম্পাদক —৺শ্রীগৌররায় দাস গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

প্রকাশক — শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

প্রথম প্রকাশ — ৫০৩ চৈতন্যাব্দ।
দ্বিতীয় প্রকাশ — ৫৩০ চৈতন্যাব্দ।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান — (ক) গৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ, প্রাচীন মায়াপুর, শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া- ৭৪১৩০২
(খ) স্বর্গীয় শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী, ৩বি, গাঙ্গুলী-পাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা- ৭০০০০২
(গ) স্বাগতম, মহাপ্রভুপাড়া, নবদ্বীপ।
(ঘ) শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর মন্দির, সীতানাথ লেন, প্রাচীন মায়াপুর, শ্রীধাম নবদ্বীপ।
(ঙ) মডার্ন বুক ডিপো—হরিসভাপাড়া, নবদ্বীপ।

প্রচ্ছদ অলংকরণ : শ্রীঅভিজিৎ সিকদার, চিত্রালী, নবদ্বীপ।

অক্ষর বিন্যাস :

[আনুকূল্যঃ ষাট টাকা মাত্র]

— শ্রীহরি —

উৎসর্গ-পত্র

"আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায়
হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।"

কলিযুগ-পাবনাবতার, "হরে কৃষ্ণ"—মহামন্ত্র ও সংকীর্তনের
উদ্‌গাতা ও পিতা এবং আমাদের নিত্য আরাধ্য
দেবতা মূর্তিমন্ত প্রেম-সুধাকর ত্রয়
শ্রীশ্রীগৌররায় জীউ, শ্রীশ্রীকিশোর গোপাল জীউ
ও শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ জীউকে
তদীয় অভিন্নাত্ম এই
নাম-মহিমা গ্রন্থ নিবেদন করিয়া
সেই প্রসাদী নির্মাল্য মদীয় গুরুদেব ও জ্যেষ্ঠতাত
শ্রীহরিপাদপদ্মগত (ওঁ বিষ্ণুপাদ)
নাম বিজ্ঞানাচার্য শ্রীশ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুপাদ,
ও অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত নিত্যধামগত
শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী প্রভুপাদের
পুণ্য স্মৃতি-কল্পে
এবং
মদীয় পিতৃদেব শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামীর
করকমলে
পরম শ্রদ্ধায় উৎসর্গীকৃত হইল।

বন্দনা-দ্বাদশী

(১)

মায়াহত মুই যবে করি ঘোর বিপথে গমন।
কেশে ধরি উদ্ধারিলে সেই তুমি সুরেন্দ্রনন্দন।।
সংস্কার করি তবে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ।
কিবা সে অপূর্ব কৃপা না যায় কথন।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।১।।

(২)

আত্মহত্যাকামী মুই বড় অভাজন।
যেতেছে বিফলে জন্ম করিয়া ভাবন।।
কর্ণধাররূপে করাও কৃষ্ণানুশীলন।
ভবসিন্ধু তরাইতে গুরুরূপে দরশন।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।২।।

(৩)

উলুকের ন্যায় ছিনু ঘোর অন্ধতমজন।
জ্ঞানাঞ্জনে করিলেন সেই চক্ষুরুন্মিলন।।
তাপতপ্ত হিয়া মাঝে, যাঁর শীতল চরণ।
সেই সে আমার গুরু পতিতপাবন।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।৩।।

(৪)

মলিন চিত্ত-দর্পণেরে করিয়া মার্জ্জন।
তাপদগ্ধ মো অধমে কৃষ্ণে ভক্তিমান্।।
তোমার অপূর্ব কৃপা কানুপ্রিয় রূপবান্।
জগন্মঙ্গল নামরূপ চিন্তামণিদান।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।৪।।

(৫)

ব্যবহারিক গুরু তেঁই জ্যেষ্ঠতাত হন।
কুলগুরুরূপেও আছে তাঁর প্রকাশন।।
নিত্যসিদ্ধ আম্নায়ে সিদ্ধ যে, সে জন।
কৃষ্ণ মন্ত্রদাতা, তায় পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।৫।।

(৬)

শান্ত, নির্মৎসর, শুদ্ধ ভক্তাগ্রগণ্য।
সম্প্রদায়ী সদাচারী সে এক অনন্য।।
শুক্লাম্বর, সেবাপর, সর্বাশ্রয়দাতা।
বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত হ'ন মোর ত্রাতা।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।৬।।

(৭)

প্রিয়দর্শী, গুণজয়ী, কৃষ্ণ-গুণগান।
যাঁহার বদনে স্ফুরে নিত্য অবিরাম।।
সেবানন্দ দাতা সেই পিতৃমাতৃ অগ্রগণ্য।
সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণ করেন পরম বদান্য।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।৭।।

(৮)

যাঁর প্রসন্নতায়, হন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।
যাঁর অপ্রসাদেতে আর গতি নাহি অন্য।।
তব কৃপা লভি মুই আজি অতি ধন্য।
কানুপ্রিয় তব কীর্ত্তি সর্বাগ্রগণ্য।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।৮।।

(৯)

সমষ্টির গুরু সেই মূল নারায়ণ।
ব্যষ্টিরূপে তৎপ্রকাশে অধমতারণ।।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে সে স্বয়ং ভগবান্।
গুরুরূপে আসি সেই, পুনঃ কৃষ্ণদাস হন।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।৯।।

(১০)

সর্বদেবময় সেই মোর গুরু হন।
মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যে কভু তাঁরে না করি ভাবন।।
কৃষ্ণের প্রকাশরূপ সেই লয় মন।
বেদাচার্য জ্ঞানে করি তাঁহার বন্দন।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।১০।।

(১১)

কানুপ্রিয় কানু-প্রিয় সদা ধ্যায় মন।
এই হেতু গুরু-কৃষ্ণে অভেদ চিন্তন।।
গুরু-মূর্ত্তে কৃষ্ণকৃপা হয় প্রকাশন।
শাস্ত্রসিদ্ধ এই তত্ত্ব করি সন্দর্শন।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।১১।।

(১২)

রাধাকৃষ্ণ যুগলসেবা কুঞ্জে রাত্রিদিন।
লভিব কি সিদ্ধ-দেহে মুই পাপী হীন।।
গুরুরূপা সখী পার্শ্বে সে অপূর্ব দরশন।
মঞ্জরীর আনুগত্যে কি মোর বাঞ্ছিত পূরণ।।
করি মোর পরমারাধ্য কানুপ্রিয় দেবের ভজন।।১২।।

ইতি—
শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-কৃপাপ্রার্থী
গৌররায় (দাস) গোস্বামী।

।। শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ।।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

আমার ইষ্টদেবতা ও অভিভাবক শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর সুমঙ্গল ইচ্ছায় শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (৩য় কিরণ) গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে আমাদিগের বিজ্ঞাপনাদি কোনোপ্রকার ব্যবস্থা না থাকিলেও সারগ্রাহী চিন্তাশীল সজ্জনগণ কর্তৃক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সমাদরে গৃহিত হইয়াছে—ইহা ভক্তিজগতের নিকট অতীব সুসংবাদ বলিয়া আমরা মনে করি।

গ্রন্থকারের রচনামাত্রই একান্ত মৌলিক ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ; দেশ বিদেশের বহু প্রখ্যাত ধর্মাচার্য্য মনিষীগণ, সাধুসজ্জনবৃন্দ ও পত্রপত্রিকা কর্তৃক বিপুলভাবে সমর্থিত, অভিনন্দিত ও উচ্চপ্রশংসিত (গ্রন্থের অভিমত সকল দ্রষ্টব্য)। প্রভুপাদের গ্রন্থসকল একান্ত ভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয় ও আদরের সামগ্রী। তাই তাঁহার রচিত গ্রন্থসকল যাহাতে দুষ্প্রাপ্য না হয় সে বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য সচেষ্ট হইয়াছি।

বর্তমান সময়ে কাগজের মূল্য ও গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায় বাধ্য হইয়াছি গ্রন্থের মূল্যমান যথাসাধ্য কম রাখিবার চেষ্টা করিয়াও বর্দ্ধিত করিতে হল।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—মদীয় মন্ত্রশিষ্যত্রয়—শ্রীমান মহাদেব, শ্রীমান কৃষ্ণদাস ও শ্রীমান মধুসূদন বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ তাহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

এছাড়াও আমাদের প্রতিটি প্রকাশনা বিষয়ে যাঁহাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা বিজড়িত রহিয়াছে, সেই সকল উদারচরিত ভক্তবৃন্দের নিমিত্ত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে ভজনানুকূল্য ও সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি। একই সঙ্গে মুদ্রণ সংস্থার সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে ভক্তপাঠকদিগের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা—জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নামাশ্রয়ে অতিবাহিত করিয়া যাহাতে কোনজন্মে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে চিরাশ্রয় লাভ করিতে পারি, এই দীনের প্রতি আপনারা সেই কৃপা বিস্তার করুণ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪২২
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫৩০

ইতি—
শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর শ্রীচরণাশ্রিত
দীনাতিদীন
প্রকাশক

।। শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ।।

সম্পাদকীয় নিবেদন

আমাদের গৃহদেবতা ও অভিভাবক শ্রীশ্রীগৌররায়হরির অবিচিন্ত্য কৃপা সাপেক্ষে অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি গ্রন্থের তৃতীয় কিরণ, শ্রীভগবন্নাম-মহিমা বুকে লইয়া প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনার দুরূহ কর্মে, আমার ন্যায় একজন অজ্ঞ, মূর্খ ও সাধন-ভজন-হীন জন নিমিত্তমাত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করায়, তদীয় রাতুল শ্রীচরণারবৃন্দে অশেষ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে এ দীনজনের সামান্য নিবেদন নিম্নে বিবৃত হইল। গ্রন্থ-প্রণেতা মদীয় পরমারাধ্যতম জ্যেষ্ঠতাত ও শ্রীগুরুদেব (ওঁ বিষ্ণুপাদ) শ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভু মহোদয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বনাম-খ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত বিখ্যাত 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি', 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম' 'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা' প্রভৃতি মৌলিক গবেষণা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ সকল বিগত প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব-সমাজে সমাদৃত, পঠিত ও বহুল আলোচিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীমৎ গোস্বামী প্রভুবর তদীয় প্রকটকালের শেষ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসরকাল একাদিক্রমে শ্রীধাম নবদ্বীপে সুরধুনী সন্নিকটবর্তী আশ্রমবাটিতে অবস্থান করিয়া একান্তভাবে তদীয় আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর নিত্যসেবাদি কার্যে ও গ্রন্থ-রচনায় সংরত ছিলেন—ইহা অনেকেই অবগত আছেন। উক্ত আশ্রম-প্রাঙ্গনে প্রতি মঙ্গলবাসরীয় অধিবেশনে সমাগত সাধু সজ্জনগণ সমক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমূলক সাধ্য, সাধন ও বিশেষভাবে শ্রীনাম-তত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম্য এবং নামাপরাধাদি বিষয়ে তৎকর্তৃক নিয়মিতভাবে যে সকল ভাষণ প্রদত্ত এবং গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচিত হইত—যাহা শ্রবণে বহু লোক বিশেষ উপকৃত বোধ ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেন—বর্তমান গ্রন্থ তাহারই একতম অংশের ফলশ্রুতি।

১৩৪৯ সালে (৪৫৭ চৈতন্যাব্দ) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণির প্রথম কিরণে, যাহাতে শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ বা শ্রীনামতত্ত্ব বিষয়ে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। সেই প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরণে শ্রীভগবন্নামের শক্তি বা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য এবং তৃতীয় কিরণে শ্রীভগবন্নামাপরাধ বা শ্রীনামের অপ্রসন্নতা ক্রমে প্রকাশিত হইবে, এইরূপ পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে গ্রন্থ সম্পাদনাকালে তদীয় আদেশে দ্বিতীয় কিরণে নামাপরাধ বিষয়টি সংস্থাপিত হইয়া ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তৃতীয় কিরণে **'মধুরেণ সমাপয়েৎ'** রূপে নাম-মাহাত্ম্য বা নামের মহিমা প্রকাশিত হইলেন।

শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি প্রথম কিরণের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিরণ প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্বের কারণ, প্রভুপাদ নিজ আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর নিত্যসেবাদি কার্য ও স্বীয় ভজনে দিনের প্রায় সর্বক্ষণ সংরত থাকার দরুণ গ্রন্থরচনাকর্মে একান্ত সময়াভাব সত্ত্বেও একযোগে প্রায় ৫/৬টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা ও পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থত্রয়ের নূতন সংস্করণ প্রকাশাদি কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তদুপরি শরীর মধ্যে মধ্যে অসুস্থ হওয়ায় ও অন্যান্য নানাবিধ বাধাবিপত্তিতে পাণ্ডুলিপি রচনায় বিলম্ব ঘটে।

অবশ্য ইতিপূর্বে বহু ভক্তজনের সনির্বন্ধ অনুরোধে, বর্তমান কালের প্রবল উদ্বেগ, অশান্তি ও অস্বস্তিকর অবস্থার ভিতর প্রকৃষ্ট শান্তি লাভের উপায় নির্দেশ ও পরমার্থ পথের পথিকগণের পক্ষে প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শনার্থ পূর্বোক্ত মঙ্গলবাসরীয় সভায়—গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও তদন্তর্গত দুরূহ তত্ত্বসকল শ্রীভগবৎ কৃপাশক্তির প্রেরণায় তদীয় বাগ্মিতা ও ভাবাবেগ-স্পর্শে প্রাঞ্জলতা প্রাপ্ত হইয়া, সুসিদ্ধান্ত ও বর্তমান যুগোপযোগী যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণসহ সুমধুর ভাষণে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত ভাষণ দান কালে মৎকর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া ও ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতি মত সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনার মানসে প্রভুপাদ যে সংক্ষিপ্তসার (notes) ও পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাহাকেই সুবিন্যস্ত করিয়া এবং প্রয়োজনস্থলে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপিত ও বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থকলেবর প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থের আরও এক বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বিশ্লেষণের নূতনত্ব ও চিন্তাধারার মৌলিকত্ব সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। অতীব সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তগুলিও সুব্যাখ্যান কৌশলে সর্বসাধারণের বোধগম্য করা হইয়াছে।

গ্রন্থ সম্পাদনাকালে প্রভুপাদের রচনা প্রায় আনুপূর্বিকই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি—তথাপি সর্ববিষয়ে অযোগ্য মাদৃশজনের অনভিজ্ঞতাদি দোষনিবন্ধন তন্মধ্যে ভ্রম প্রমাদাদি সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুধী পাঠকবৃন্দ সেইরূপ কিছু ত্রুটি থাকিলে সংশোধন করিয়া লইবেন,—ইহাই বিনীত নিবেদন।

পরিশেষে নিবেদন—শ্রীগ্রন্থ স্বপ্রকাশ, শ্রীভগবানের স্বতঃপ্রকাশিকা শক্তিবলে এই জগতে লোকলোচনে প্রকাশিত হন স্বেচ্ছায়। উক্ত অবসরে সেবানুকূল্য বিধানের নিমিত্ত নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী (কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ) শুধুমাত্র এই গ্রন্থ প্রকাশনায় আংশিক ব্যয়ভারই যে বহন করিয়াছেন তাহা নহে, প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রাঙ্কন কার্যের সমুদয় তত্ত্বাবধানভার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিশেষ উৎসাহপূর্বক গ্রহণ করিয়া আমার উপর ন্যস্ত গুরুভার প্রভূত পরিমাণে লাঘব করিয়াছেন। এইহেতু তাঁহার নিকট অশেষ ঋণ স্বীকারপূর্বক শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর শ্রীচরণে তদীয় ভজনানুকূল্য ও সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

শিল্পী শ্রীযুক্ত অশোক চৌধুরী মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন, উহার ব্লক ও মুদ্রণকার্যে সহায়তা করিয়া অশেষ ধন্যবাদের ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজমণ্ডলনিবাসী শ্রীল শ্যামসুন্দর দাস বাবাজী মহারাজ স্বকীয় বৈষ্ণব জনোচিত ঔদার্যে এই গ্রন্থের ব্যয়ের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর নিকট তাঁহার ভজনানুকূল্য প্রার্থনা করি।

প্রভুপাদের প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে যাঁহাদের ঐকান্তিক সহানুভূতি, আনুকূল্য, উৎসাহ, সহযোগিতা এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছার অনাবিল সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, সেই সকল উদারচরিত সজ্জন ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রমানাথ গোস্বামী, অনুজ শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী ও শ্রীকিশোররায় গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় (বি.ই., সি.ই.—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার সিভিল), ডাঃ শ্রীমণিন্দ্র কুমার সিংহ (এম.বি.), শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র নারায়ণ শর্মা চৌধুরী (বি.এস.সি., ডিপ.লিব.—কলিকাতা পৌরসভার ভুতপূর্ব ডেপুটি পার্সোনেল অফিসার)। শ্রীল চৈতন্যচরণ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশঙ্করলাল গাঙ্গুলী (এম.কম., এল.এল.বি.,—চার্টার্ড সেক্রেটারী কষ্টিং), শ্রীমান প্রশান্ত রায় (বি.এম.ই.-যাদবপুর, এম.এস.-যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীমান কল্যাণ রায় (এম.টেক.-কলিকাতা, পি.এইচ.ডি.-যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীনকুলচন্দ্র সাহা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ চরণে ইঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি।

সর্বশেষে, সর্ব বৈষ্ণবচরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে, নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি, সংসারে আবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাঁহারা সেই অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করুন।

ইতি—
শ্রীগৌররায়জীউর শ্রীচরণাশ্রিত
দীনাতিদীন
সম্পাদক

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা
১৮ই কার্তিক ১৩৯৪ সাল
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৩

ভূমিকা

মদীয় অভীষ্টদেবতা শ্রীশ্রীগৌররায়হরির কৃপা-বিশেষ ও প্রেরণায়, মাদৃশ হীনজনের লেখনীমুখে প্রকাশ করাইয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি' গ্রন্থের প্রথম কিরণ। 'শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ' বা 'ভগবন্নাম-তত্ত্ব' বুকে লইয়া, যাহা প্রকাশিত হইয়াছেন—বহু বৎসর পূর্বে। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরণে শ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা বা ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ হইবার কথা থাকিলেও কিন্তু উহা এযাবৎ কার্যতঃ সম্পন্ন হইতে পারে নাই। ধর্ম-বিরোধী কলির বিরুদ্ধ প্রভাবরূপ নানা বাধা বিঘ্নাদি ও অন্য অসুবিধার জন্যই হউক কিম্বা তাহার অন্তরালে শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী কোন ইচ্ছাই হউক, আমার শত-সহস্র চেষ্টাকে পরাভূত করিয়া উহা অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে—এই সুদীর্ঘ বৎসর ব্যাপী।

পরে—জীবনেরই অন্তিমকালে, আজ বহু প্রত্যাশিত সেই (দ্বিতীয়) তৃতীয়-কিরণ শ্রীনামেরই কৃপায় ও নাম হইতে অভিন্নাত্ম—শ্রীগৌরহরিরই প্রেরণায়, মাদৃশ ক্ষুদ্রাধমের দ্বারা প্রকাশ করাইয়া এতদিনে পূর্ণ করিলেন আমার প্রতিশ্রুতি—আমার অন্তরের একটি নিগূঢ় বাসনা, সেই দীন-দয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীচরণাম্বুজে সর্বপ্রথম শত-সহস্রবার ভূলুণ্ঠিত সকৃতজ্ঞ প্রণতি নিবেদন করিয়া, সদাশয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের শ্রীকরে ইহা তুলিয়া দিবার সঙ্গে, ইহার বিষয় বস্তুর দিগ্‌দর্শন রূপে ভূমিকার অবতারণা করা যাইতেছে।

দীনবৎসল শ্রীগৌরসুন্দরের কেবল যে কৃপার প্রেরণায় ইহা লিখিত—তাহাই নহে, তদীয় অমূল্য শিক্ষাষ্টক শ্লোকের প্রথম শ্লোকটির নিগূঢ় মর্মার্থ মদীয় ক্ষীণ বুদ্ধির নিকট উদ্‌ঘাটন ও উহার অনুসরণ পূর্বক, ইহাকেই প্রকৃষ্ট নাম-মহিমারূপে ব্যক্ত করিবার নির্দেশও তাঁহারই দেওয়া। সুতরাং কেবল প্রেরণা নহে, গ্রন্থের উপাদান রূপেও তদীয় সেই নিজস্ব মহার্হ-সম্পদ এই দীনহীন কাঙ্গালকে প্রদান করায়, "দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্"—তদীয় এই দীনবাৎসল্যের, মহামহিমা জগতে ঘোষিত হইল আর একটি যথার্থস্থানে। তবে প্রকৃষ্ট দীনতা প্রকাশের যোগ্যতার অভাবে, আমার এই দীনতাও কপটতা হইলেও, এই অসরলতাকে আরও আরও অধিকতর অধমাধমতা বোধে, তাই এই প্রকৃষ্ট অধমজনে 'অধম-তারণ' রূপে প্রকাশ হওয়ায়, তদীয় এই কৃপাবৈশিষ্ট্য হইয়াছে আরও অচিন্ত্য।

অতএব এই গ্রন্থ কেবল শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটির মর্মার্থের অনুসরণ ও তৎপ্রদর্শিত রীতিতে বিশ্লেষণ ব্যতীত আমার স্বকল্পিত কিছুই নাই ইহাতে। সুতরাং ইহার দ্বারা ভক্তজনেও বহুল পরিমাণে আশ্বস্ত হইতে পারিবেন বহুল পরিমাণে।

স্বয়ং নামী যে নিজ নামের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার ব্যক্ত করিতে যাইয়াও সীমা না পাইয়া, নিজেই "শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং পরং বিজয়তে" অর্থাৎ এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন সর্বোপরি পরম উৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন—এই বলিয়া শ্রীনামের সর্বোপরি জয় জয়াকার ঘোষণা করিয়াছেন, সেই শ্রীনামের মহিমাদি তিনি ভিন্ন অপর কেই বা বর্ণন করিবার যোগ্য ? তাই যাঁহার বর্ণনায় দিশা পান নাই দেব ও মুনিগণ হইতে চতুরানন—পঞ্চানন—সহস্রানন অবধি মহাবিজ্ঞগণও, সেই নামের মহিমা কথনের অপর সকল পন্থা পরিত্যাগ পূর্বক, অনুসরণ করা হইল কেবল স্বয়ং নামীকৃত শিক্ষাষ্টকেরই প্রথাম শ্লোক। উক্ত প্রকারে এই ভগবন্নাম-মহিমা ব্যাখ্যাত হইতেছেন, উহার সূক্ষ্ম ও সারমর্ম সকলের সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-মহাপ্রভু নিজে বিশেষ কোন গ্রন্থাদি রচনা না করিলেও তদীয় স্বরচিত শিক্ষা শ্লোকাষ্টকের মাধ্যমে সমস্ত ভক্তি-সিদ্ধান্তের সমাবেশ করাইয়া, জীবজগতের পরম শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যাহা কিছু সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন—অতীব সূক্ষ্ম ও সার সূত্রাকারে, তৎসমুদয় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন প্রধানরূপেই জানিতে হইবে। শ্রীনামের একমুখ্যতা কিম্বা অঙ্গীত্ব সমস্ত ভক্ত্যঙ্গেই সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

শিক্ষাষ্টকের অপর শ্লোক মধ্যে নাম-মহিমা ব্যক্ত থাকিলেও, সমুদয় শিক্ষা শ্লোকের ভূমিকা-স্বরূপ প্রথম শ্লোকটি বিরচিত হওয়ায়, যাহা নাম-মাহাত্ম্যের হইয়াছে মহা-রত্নাকর। ইহার অতল তলে নিহিত রহিয়াছে যে কতই রত্ন, কেহই পারেন না তাহার ইয়ত্তা করিতে। যত বড় ডুবুরিয়াই যিনি হউন তাঁহার যথাসাধ্য রত্ন আহরণ করিয়া উঠিলেও উহার অশেষ ভাণ্ডার থাকিয়া যাইবে—অফুরন্তই।

শ্রীভাগবতার্থের বিশালতা ও অসীমতা সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে—"প্রতিশব্দে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ স্ফুরে"। সেইরূপ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখাম্বুজ বিনির্গত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে—সেই একই কথা সুনিশ্চিতরূপে।

তাই দেখা যায়—মহান্ ভাগবত শাস্ত্রের একটিমাত্র শ্লোক বিশেষের ("আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা—" ইত্যাদি।—শ্রীভাগবত-১।৭।১০) নয় প্রকার অর্থ মহাপ্রভুর সমক্ষে ব্যাখ্যা ও উহার অপর অর্থ হইতে পারে না, প্রকারান্তরে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া, নিজ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য অন্তরে শ্লাঘান্বিত হইয়াছিলেন—শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ;—যদিও ইহাতে রহিয়াছে তাঁহাদের লোকশিক্ষার অভিনয়। আবার দেখা যায় সেই একই শ্লোকের তদীয় ব্যাখ্যার কোন একটিও স্পর্শ না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর উহার অষ্টাদশ প্রকার পৃথক অর্থ তৎসমীপে ব্যাখ্যা করিয়া বিস্মিত সার্ব্বভৌমকে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন—শ্রীভাগবত-সমুদ্রের অসীমতা। আবার সময়ান্তরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের প্রশ্নোত্তরে সেই একই শ্লোকের

একষষ্টি প্রকার অর্থের আবিষ্কার করিয়া পুনরায় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন ভাগবতার্থের অসীমতাকে।

সেইরূপ সাক্ষাৎ বেদময় পুরুষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের বিশেষতঃ প্রথম শ্লোকে অফুরন্ত অর্থরূপে মহারত্নরাজি নিহিত থাকিলেও, সর্বপ্রকারে অযোগ্য মাদৃশ হীনজনের পক্ষে উহা উত্তোলনের না থাকিলেও কোন সামর্থ্য, কেবল তদীয় নির্দেশ বুকে ধরিয়া, তদীয় নির্দেশপ্রাপ্ত পন্থার অনুবর্তী ও প্রদর্শিত আলোকে দিগ্‌দর্শন করাইয়া যে কিছু রত্ন আহরণে সমর্থ করাইয়াছেন,—অল্পাধিক যাহাই হউক, সেই রত্নরাজি গ্রথিত শ্রীনাম-মহিমার কণ্ঠহার ভক্তগণের শ্রীকরে অর্পণ করিতে পারিয়া,—এইরূপে আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি জীবনান্তকালেও পূর্ণ হইল—যাঁহার করুণায় ও প্রেরণায়—সেই অহৈতুকী শ্রীগৌরকৃপাই—অযোগ্য আমি, আমার জীবনের সকল যোগ্যতা, সকল বল, ভরসা ও আশ্রয় হউন।



গ্রন্থের ভূমিকাটি প্রভুপাদ কর্তৃক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাতে বহুকাল পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল। আমরা তাহাই এখানে পরিবেশন করিলাম। এ'বিষয়ে যথাযথ বক্তব্য সম্পাদকীয় নিবেদনে বিবৃত হইয়াছে।

—জয় শ্রীশ্রীগৌররায়হরি—

কলিযুগ-পাবনাবতার পরমকারুণিক আদ্যহরি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু উপদিষ্ট

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধু-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্।।১।।

নাম্নামকারী বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ ! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।২।।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।৩।।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।৪।।

অয়ি নন্দ-তনুজ ! কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ,-স্থিতধূলি-সদৃশং বিচিন্তয়।।৫।।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।।৬।।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।।৭।।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।৮।।

অবতরণিকা

বেদাদি শাস্ত্রে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, এই বিষয়ত্রয়কেই লক্ষ্য করিয়া সমুদয় বাক্য পরিকীর্তিত হইয়াছে। একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি, বেদাদি সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য একমাত্র সেই আনন্দময় পুরুষেই পর্যবসিত। আনন্দঘন মূর্তি শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র সেব্য এবং সমগ্র জীবজগৎ তাঁহার সেবক—এই পবিত্র বাণী—এই পবিত্র ঝঙ্কারে সমুদয় শাস্ত্রবীণা মুখরিত। এই সম্বন্ধ ঘোষণাই সর্বশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীভগবানই সেব্য—আমরা সেবক—ইহাই জীবেশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগাঃ
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২২ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বাক্য)

অর্থাৎ—শ্রুতিই মানবের মাতা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আপনারই আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন। মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহারই অনুমোদন করেন। পুরাণাদি ভ্রাতৃগণও জননী ও ভগিনীর অনুগত। অতএব হে মুরহর ! আপনিই একমাত্র আশ্রয়—ইহা সত্য বুঝিয়াছি।

সুতরাং যে শাস্ত্রে যে ভাবে যাহাই বর্ণনা করুন না কেন, কেবল আনন্দের সংবাদ জীব-জগতে প্রচারিত করাই সকলের একমাত্র লক্ষ্য। শ্রুতি এই আনন্দকেই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম,—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ইহার পরিচায়ক। আবার এই আনন্দের ঘনীভূত অবস্থাকেই শ্রুতি 'রস' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" অর্থাৎ যিনি সেই সুকৃত (স্বয়ং কর্তা) তিনিই রস স্বরূপ। জীব রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দিত হয়।

সুতরাং আনন্দকেই ব্রহ্ম, আর সেই আনন্দের ঘনীভূত অবস্থা বা 'রস'ই রসরাজ শ্রীভগবানের স্বরূপ। এইজন্যই শাস্ত্র শ্রীভগবান্‌কে 'আনন্দঘনমূর্তি' রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দঘন মূর্তি, রসরাজ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রুতি বর্ণিত "রসো বৈ সঃ।" সেই অনন্যাপেক্ষী—সুকৃত—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও

ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। একমাত্র তিনিই জ্ঞান-যোগীর সম্বন্ধে জীবাতিরিক্ত—বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত-শুদ্ধ-বিশেষ্যরূপ—ব্রহ্মস্বরূপে, অষ্টাঙ্গ-যোগীর নিকট অন্তর্যামিত্বাদি—মায়িক-বিশেষণ প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্মরূপে এবং ভক্তিযোগীর নিকট পরিপূর্ণ, সর্বশক্তি সমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়, কেবল উপাসকের ভাব ও যোগ্যতানুসারে তাঁহার প্রকাশভেদ হইয়া থাকে মাত্র।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।। (শ্রীভাগবত—১.২.১১)

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। এই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, নির্বিশেষরূপেপ্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন। অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন ; আর সর্বশক্তি-সমন্বিতরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন।

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—সর্বশক্তিমান—সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিই নির্বিশেষ-প্রকাশ রূপ 'ব্রহ্ম' নামে শাস্ত্রে পরিকীর্তিত হইয়াছেন। যথা,

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষ বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (ব্রহ্মসংহিতা—৫.৪৯)

অর্থাৎ যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে—অশেষ বসুধাদি বিভূতি ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি—আমি (ব্রহ্মা) সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। আর যিনি পরমাত্মা, তিনি পূর্ণ ভগবান্ শ্রীগোবিন্দেরই অংশবিশেষ। যথা,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।। (শ্রীভাগবত—১০.১৪.৫৫)

অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি অখিল আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের হিতার্থ, কৃপায় যোগমায়া দ্বারা দেহধারী জীবের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।। (গীতা—১০.৪২)

অথবা হে অর্জুন ! তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি ? আমি একাংশ দ্বারা অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্মা দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি

করিতেছি।

সুতরাং প্রকাশভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্, এই নাম-ভেদে পরিলক্ষিত হইলেও, সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সেই একমাত্র আনন্দময় পুরুষেই পরিসমাপ্ত। জীবমাত্রেই আনন্দের সেবক;—আর সেই আনন্দ বা রসস্বরূপ শ্রীভগবানই একমাত্র সেব্য। এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধই শাস্ত্রের সম্বন্ধ তত্ত্ব অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়,—এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধই বেদাদি শাস্ত্র অনাদিকাল হইতে জগতে ঘোষণা করিতেছেন।

এখন 'প্রয়োজন' তত্ত্বের কথা। যাহা পাইবার জন্য জীবজগৎ নিরন্তর ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, যাহা পাইবার পর জীব আর কিছু চাহিবে না, তাহাই প্রয়োজন—তাহাই জীবের অত্যন্ত পুরুষার্থ। এই প্রয়োজন তত্ত্ব নির্ণয়চ্ছলে তাই শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সবিনয়ে সর্বাগ্রেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে আমি আমায় কেন জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি আমি, কেমনে হিত হয়।।
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২০-২১)

মায়া-নিগড়বদ্ধ—ত্রিতাপের তীব্র দহনে পরিদগ্ধ জীব, যাহা পাইয়া বিমল সুখলাভে সমর্থ হয়, তাহাই তাহার সাধ্য বা প্রয়োজন। আর সেই সাধ্য প্রাপ্তির উপায় যাহা, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ, সাধন বা অভিধেয় নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রয়োজন স্থিরীকৃত না হইলে, তাহার অভিধেয় কি, তাহা নির্ণয় হইতে পারে না ! সেইজন্য আমরা অভিধেয় বিষয় আলোচনার পূর্বে, জীবের প্রয়োজন বা সাধ্য কি, তাহার অনুসন্ধান করিয়া, পরিশেষে অভিধেয় বা সাধন-বিষয় নির্ণয়ে সচেষ্ট হইব।

মহর্ষি কপিল তদীয় সাংখ্যদর্শনের প্রথমেই বলিয়াছেন,—**"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।।"** ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকেই অত্যন্ত পুরুষার্থ কহে। বদ্ধ জীবমাত্রেই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের অধীন। যে পর্যন্ত এই তাপত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তি, বা সম্পূর্ণ পরিহার না ঘটে, তাবৎ অত্যন্ত পুরুষার্থ বা পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া জীব, চিরশান্তির সুশীতল অঙ্গে বিশ্রাম লাভ করিতে কিছুতেই সক্ষম নহে। 'অত্যন্ত পুরুষার্থ' কি বস্তু এবং তৎপ্রাপ্তির সাধনই বা কি, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু এই ত্রিবিধ দুঃখ-পাশ সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিতে না পারিলে পূর্ণানন্দের উপভোগ হইতে পারে না—সেই অত্যন্ত পুরুষার্থ না পাইলে, অনাদিকালব্যাপী এই অবিচ্ছেদ গতায়াতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, অনন্ত বিশ্রাম লাভ যে ঘটিতে পারে না, ইহা সর্বশাস্ত্রকারগণ-সম্মত—সর্বযুক্তি ও বিচারসহ স্থির সিদ্ধান্ত।

আনন্দময় পুরুষের শক্ত্যংশস্বরূপ জীব, জ্ঞানতই হউক বা অজ্ঞানতই হউক, সেই আনন্দময়েরই অনুসন্ধানে অনাদিকাল হইতে নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে। কায়িক, বাচিক বা মানসিক, আমরা যখন যে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, আনন্দই আমাদিগের ঈপ্সিততম, আনন্দই আমাদিগের চরম ও পরম লক্ষ্য,—সমগ্র জীব-জগতে আনন্দই একমাত্র পুরুষার্থ।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, যাহা আমাদের ঈপ্সিততম, আমরা সে বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা সম্যক্ অবগত নহি। বিষয়েন্দ্রিয়—সন্নিকর্ষজনিত পরিবর্তন বিশেষকেই আমরা 'সুখ' নামে অভিহিত করিয়া থাকি,—বিষয়ানন্দই আমাদের সমীপে 'সুখ' নামে পরিচিত। বিষয়-ভোগ-জনিত সুখও যে 'আনন্দ', সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাও সেই ভূমানন্দেরই যৎকিঞ্চিৎ অংশ মাত্র। প্রাকৃত আনন্দ—স্বরূপানন্দ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হইলেও, ইহা 'ভূমা' নহে; ইহা অল্প ক্ষণভঙ্গুর—পরিচ্ছিন্ন। বিষয়-সুখ উপভোগে তাই আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। অনন্ত পিপাসিত প্রাণ, বারিবিন্দু পানে কখনও কি পরিতৃপ্ত হয় ? তাই দুঃখ—অতৃপ্তি—আকাঙ্খা ! এত অভাব—এত অভিযোগ—এই অল্পতাই ইহার একমাত্র কারণ।

এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যথান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যাদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৭.২৩-২৪)

অর্থাৎ অল্পে সুখ নাই,—"ভূমা"ই সুখ। ভূমা কি ? তাহাই বলিতেছেন,—যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না,—তাহাই 'ভূমা'। আর যেখানে অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে—তাহাই 'অল্প'। যাহা 'ভূমা' তাহাই সুখ, তাহাই আনন্দ। আর যাহা অল্প, তাহাই পরিচ্ছিন্ন,—তাহাই চিরতপ্ত সংসার মরু।

স্বজাতি স্বজাতীয়ের সাথে মিশিতে চাহে,—ইহাই জগতের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। তাই সরিৎ সরিৎপতির সহিত সঙ্গত হইবার জন্য ধাবমান হয়, সমীরণ মহাসমীরণাভিমুখে ছুটিয়া যায় ; পার্থিব যাহা, পৃথিবীর অসীম ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতে সচেষ্ট রহে। এই বিচিত্র নিয়ম, সমগ্র জীব-জগতেও নিরন্তর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আনন্দঘনমূর্তি শ্রীভগবানের তটস্থা-শক্তিস্বরূপ জীব, অণুধর্মী হইলেও, সেই বিভু-আনন্দেরই যৎকিঞ্চিৎ অংশ মাত্র। সুতরাং আনন্দ-কণ-স্বরূপ জীব, প্রতিনিয়ত ভূমানন্দের অন্বেষণেই প্রধাবিত হইতেছে। সরিৎ সম্ভূত জলচরগণ যেমন জল ব্যতীত

ক্ষণকালের নিমিত্ত জীবন ধারণ করিতে অক্ষম, তদ্রূপ আনন্দ সম্ভূত জীবজগৎ আনন্দ ব্যতীত এক মুহূর্তও জীবিত থাকিতে পারে না। আনন্দ হইতেই জীবের জন্ম,—আনন্দই জীবের জীবনোপায়—আনন্দই তাহার শেষ বিশ্রামস্থল। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,—আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—৩.৬.১)

সেইজন্য বলিয়াছি, ভূমানন্দ সম্ভূত জীব, জ্ঞানতই হউক কি অজ্ঞানতই হউক, সেই ভূমানন্দের অন্বেষণেই সচেষ্ট। অপরিচ্ছিন্ন ভূমানন্দ প্রাপ্তকাম জীব, পরিচ্ছিন্ন—আনন্দাভাস মাত্র অত্যল্প বিষয়-সুখে কিছুতে পরিতৃপ্ত হইতেই পারে না,—যতক্ষণ না এই ত্রিতাপজ্বালাময় সংসার-ধাম ত্যাগ করিয়া, সেই সদানন্দময়ের সর্বদুঃখ-প্রশমন—শমনভয়-নিবারণ—শান্তিময় পাদপদ্ম লাভ করিয়া, ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণকে শীতল করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ জীব অতৃপ্ত আকাঙ্খা বুকে করিয়া ঘুরিয়া মরিবে। ততদিন তাহার গতায়াতের বিরাম নাই,—ততদিন দুঃখের "আত্যন্তিকী নিবৃত্তি" সুদূরপরাহত। কবি বলিয়াছেন,— "বায়ু সাথে মিশে যাবে বায়বীয় যাহা,

জল সাথে মিশে যাবে জল।
ক্ষিতির অসীম ক্ষেত্রোপরি,—মিলাইবে পার্থিব সকল।
ক্ষুদ্র বায়ু ফুকারিছে মহাবায়ু বলে,
ক্ষুদ্র জল মহাজলে হবে পরিণত,—
দৈহিক এ অনুপুঞ্জ মিশে পৃথ্বীকোলে,—
শুধু আত্মা তুমি কিগো নিরাশ্রয় এত ! (প্রেমাশ্রু—শ্রীল সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী)

হে আমার নিরাশ্রয় চির বিপন্ন আত্মা ! তুমি সেই সর্বাশ্রয়—সর্বৈশ্বর্য পূর্ণের সন্তান হইয়াও, আজ নিজ কর্মদোষে অবিদ্যার ঘনান্ধকারে নিজেকে আবৃত করিয়া, আপনিই আপনাকে নিরাশ্রয় করিয়াছ। আনন্দময়ের নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ প্রবাহের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তাই আজ তুমি বিপন্ন—তুমি ভিখারী। বায়ু বায়ুর সাথে মিশে, জল মহাজলে পরিণত হয়। পার্থিব যাহা—ক্ষিতির অসীম ক্ষেত্রোপরি বিশ্রাম লাভ করে, কিন্তু তুমি ত ক্ষিতি নহ, জল নহ, অগ্নি নহ,—বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, তুমি সে সকল কিছুই নহ, সুতরাং ভৌতিক বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগে তোমার পরিতৃপ্তি কোথায় ? তুমি সেই সচ্চিদানন্দময়ের শক্ত্যংশস্বরূপ। অতএব সেই ভূমানন্দের অন্বেষণই তোমার জপ, তপ, সাধনা,—সেই ভূমানন্দের সঙ্গলাভ,—তাহাই তোমার ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। তাহাই তোমার অত্যন্ত পুরুষার্থ।

পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভূমানন্দ-স্বরূপ। একমাত্র ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত, সেই ভূমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার গত্যন্তর নাই। শ্রীভগবান্ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই

বশীভূত হইয়া থাকেন বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'[১] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ভক্তি আবার সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবিধরূপে উক্ত হইয়াছেন।

সাধ্যভক্তি যাহা, তাহাই প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়েন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধন হয়েন না ; কিন্তু সাধ্যভক্তিরূপ প্রেম দ্বারা পরম্পরায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনা হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত শ্রবণাদি সাধনভক্তিকে অভিধেয় ও প্রেমরূপ সাধ্যভক্তিকেই প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হইয়া থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় হইতেও প্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়া, শাস্ত্র এই প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন ধনের লাভে সুখভোগরূপ ফলের লাভ ও তৎসঙ্গেই দুঃখের নিবৃত্তি হয় ; সেইরূপ ভক্তিলাভে প্রেমরূপ ফলের লাভ ও তল্লাভে ভূমানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণরসাস্বাদনের সহিত ত্রিবিধ সংসার-দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া যায়। প্রেমানন্দই ভক্তির মুখ্য ফল এবং দুঃখ-নিবৃত্তি উহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। অতএব দুঃখ-নিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন হইলেও, উহা মুখ্য প্রয়োজন নহে—প্রেমলাভই একমাত্র মুখ্য প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ শিরোমণি।

সুতরাং পঞ্চম পুরুষার্থ-স্বরূপ প্রেমানন্দলাভই জীবের প্রয়োজন, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর এই প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভের অভিধেয় বা সাধন কি, তাহারই আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

যাঁহার অঙ্গকান্তি নবোদিত দিবাকরের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিকেও ম্লান করিয়া দিয়াছিল, মানস-সরসীর বিকশিত স্বর্ণকমল-মাধুরীকেও যাঁহার মাধুর্য পরাভূত করিয়াছিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাবিধৌত শুভ্র কৈরবের শীতলতা যাঁহার অঙ্গের শীতলতার নিকট বিলজ্জিত হইয়াছিল, যাঁহার প্রসারিত বাহুযুগলের মধ্যে বারেক আশ্রয় লাভ করিয়া ত্রিতাপ-তাপিত কত জন অনন্তকালের জন্য আপনহারা হইয়া গিয়াছে, যাঁহার প্রেমময় কণ্ঠোদ্গীত ভুবনমঙ্গল হরিনামের মধুর ধ্বনি নিশীথের দূরাগত বংশীধ্বনিকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। যাঁহার শ্রীঅঙ্গের মহাভাবের অপূর্ব পুলকাবলী দর্শন করিয়া দর্শক, সিন্ধুর মহোচ্ছ্বাসকেও সংকীর্ণ বলিয়া বোধ করিয়াছেন,—যাঁহার রক্তোৎপল-বিনিন্দিত চরণযুগলের রেণুকণার স্পর্শমাত্র লাভ করিয়া জীব পরশমণির অধিকারী অপেক্ষাও নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছে, সেই পূর্ণতম ভগবান্, কলিপাবনাবতার, শ্রীনাম-সংকীর্তনের মহাগুরু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—ত্রিতাপ-তাপিত জীবকে পরমানন্দের অধিকারী করিবার জন্য, পঞ্চম পুরুষার্থের সন্ধান দিবার জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ, সর্বজন সুখসাধ্য, দেশ-কালাদি নিয়মানপেক্ষী, শুক-সনক-নারদাদি-নিষেবিত, গোলোকের গুপ্তনিধি,—জগৎ-উদ্ধারণ-মন্ত্র শ্রীহরিনাম-সংকীর্তনকেই একমাত্র পরম উপায় বলিয়া নির্দেশ

১। গোপালতাপনি শ্রুতি।

করিয়া গিয়াছেন। নামসংকীর্তন আমাদের পরম অভিধেয়, পরম সাধনা, ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির পক্ষে নামই পরম মহৌষধ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলার শেষের দিনগুলিতেও প্রেমভরে স্বরূপ ও রামরায়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, কলিহত জীবের পরিত্রাণোপায় হরিনাম মহামন্ত্র তাঁহাদিগকেও প্রচার করিতে বলিয়া গিয়াছেন ;—

হর্ষে প্রভু কহে,—শুন, স্বরূপ রামরায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ—পরম উপায়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি নববিধ সাধনাই অত্যন্ত পুরুষার্থের অভিধেয়রূপে পরিকীর্তিত হইয়া আসিতেছে এবং ইহার যে কোন অঙ্গসাধনে সাধকের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে সত্য। যথা,—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্।। (পদ্যাবলী-৫৩)

কিন্তু নামকীর্তন উক্ত নববিধ সাধনের অন্তর্গত হইলেও, ইহা যে পরম অভিধেয়, ইহা যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ'কথা ভুবন-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্বে এমন করিয়া আর কেহ প্রচার করে নাই।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৪.৬৫-৬৬)

এই পবিত্র ঘোষণা, এমন স্পষ্ট করিয়া, এমন দৃঢ়তার সহিত প্রায় পাঁচশত বৎসরের পূর্বে জগদ্বাসী আর কখনও শ্রবণ করে নাই।

বৃহন্নারদীয়োক্ত 'হরের্নামৈব কেবলম্' বাক্য তৎপূর্বে প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থলতার মধ্যেই কীটদষ্ট কুসুমকলিকার ন্যায় নীরবে—গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন ; তাঁহার সংস্কার করিয়া, তাঁহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুই সেই কুসুম-সৌরভে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। তিনিই দৃঢ়তার সহিত এই ভবরোগ-মহৌষধি সর্বপ্রথম প্রচার করিলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।। (বৃহন্নারদীয়পুরাণ—৩৮.১২৬)

প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির দ্বারা অলৌকিক বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। শ্রীহরি যেমন অলৌকিক অচিন্ত্য বস্তু, নাম ও নামীর অভিন্নতাবশতঃ, তদীয় নামও সেইরূপ অলৌকিক অচিন্ত্য বস্তু। সুতরাং অনাদি সিদ্ধ,

সাধুপুরুষ পরম্পরায় আগত, লৌকিকালৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র আকরস্বরূপ আপ্তোপদেশ ব্যতীত অলৌকিক সেই ভগবন্মহিমাদি বর্ণনের আর উপায়ান্তার নাই; শাস্ত্রও তাই বলিয়াছেন;—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।। (মহাভারত-বনপর্ব-৩১৩.১১৭)

তাই মহাজ্ঞানী কপিল, প্রত্যক্ষ ও প্রমাণাদির দ্বারা সেই জ্ঞানানন্দ স্বরূপের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ অসম্ভব দেখিয়াই বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।।"—

অর্থাৎ ঈশ্বর নাই, একথা নহে। জ্ঞানের দ্বারা, প্রমাণাদির দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবার নহেন, ইহাই এই সূত্রের মুখ্যার্থ। পরিচ্ছিন্ন সংসারে, পরিচ্ছিন্ন জীব, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের দ্বারা কি প্রকারে সে অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ পুরুষকে ভাব ও ভাষার সীমায় আবদ্ধ করিবে ? তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।।" (তৈত্তিরিয়োপনিষদ্—২.৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদের ইহাই অচিন্ত্য"। কপিলের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্র ইহারই সমর্থক।

তাই বলিতেছি, যখন প্রমাণাদির দ্বারা সেই বস্তুর নিরূপণে সক্ষম হইবার নহে এবং ত্রিতাপতাপিত জীবের পক্ষে 'অভিধেয়' কি ?—তাহা যখন আমরা বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋষিবাক্যের দ্বারাও নির্ণয় করিতে সমর্থ নহি, তখন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করাই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুগম উপায়। অচিন্ত্যবস্তু প্রমাণে 'বিশ্বাসই' একমাত্র গতি, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর"—তাই মহাজনোক্তি। যে সকল ভাগ্যবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সেই মহাজন-সেবিত-চরণ শ্রীগৌসুন্দরের প্রচারিত অভিধেয়কেই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা ইহার পরেও প্রমাণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন একটু চিন্তা করিয়া দেখেন যে, অপরাপর সুমহান্ যুক্তি ও তর্কবহুল শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থে যে মতেরই সিদ্ধান্ত করুন না কেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মহাজনই নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, ভগবদ্ভক্তি, গুণ ও লীলাদি এবং তদীয় নামের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তাই দেখিতে পাই মহর্ষি পতঞ্জলি তদীয় যোগসূত্রে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—যোগের এই অষ্টাঙ্গকেই জীবের অভিধেয়রূপে, বর্ননা করিয়া, পরিশেষে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন,—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌বা।।" (যোগসূত্র-১.২৩) টীকাকার 'প্রণিধান' শব্দের "প্রণিধানাভক্তি-বিশেষাৎ" এই অর্থ করিয়াছেন। সূত্র-কর্তার হৃদয়ের ভাব এই যে, পূর্বোল্লিখিত যম, নিয়ম, আসনাদি অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনে সাধক সিদ্ধকাম হইতে পারেন বটে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা 'শ্রীভগবানে ভক্তিই' যোগের শ্রেষ্ঠ ও সুগম উপায়। শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।। (শ্রীভাগবত—১১.১৪.২০)

অর্থাৎ, হে উদ্ধব ! ভক্তিদ্বারা আমাকে যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে'রূপ যোগ, ধর্ম, সাংখ্য, বেদাধ্যয়ন, তপ ও ত্যাগাদির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আবার যখন আমরা, সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার, বিদ্যার বিশাল জলধি, অদ্বৈতবাদের মহাগুরু আচার্য শঙ্করের জীবনী পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদের মহাগুরু আচার্যপ্রবর, স্বীয় জননীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে দাড়াইয়া জননীকে শমনভয়হারী নামামৃত পান করাইতেছেন, আর সেই নাম শ্রবণ করিয়া, জননীর মৃত্যুযন্ত্রণাক্লিষ্ট মলিন মুখচ্ছবি, কোনও এক অলৌকিক আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে।

আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন পণ্ডিত-রাজাধিরাজ ভট্টপাদ কুমারিল, প্রয়াগের পুণ্যতীর্থে তুষানলে দগ্ধ হইয়া গুরু-পরাভবরূপ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে শঙ্কর, ভট্টপাদকে ভুবনমঙ্গল 'হরিনাম' শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সে নাম শ্রবণে তুষানল—সে ত তুচ্ছ কথা—ভবদাবানল হইতে, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া কুমারিল বৈষ্ণবধাম লাভ করিয়াছিলেন।

অধিক আর কি বলিব, যখন দেখি মহাভক্ত আচার্যপ্রবর সেই রসরাজ শ্রীগোবিন্দের মধুরাদপি মধুর লীলামৃত-সকল, স্বরচিত গোবিন্দাষ্টকে গ্রথিত করিয়া (আবার অপরের জন্য নহে—নিজের পরিতৃপ্তির জন্য) লীলা-হেমকুম্ভে নামামৃত স্থাপনপূর্বক ভক্তি-পুলকিত হৃদয়ে আস্বাদন করিতেছেন,—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমাকাশং পরমাকাশং
গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসাম্।
মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং
ক্ষমানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্।।১।।
মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসন্ত্রাসং
ব্যাদিবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দ্দশলোকাবলিম্।

লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্।।২।। ইত্যাদি।

তখন আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে, সেই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে একমাত্র ভক্তিই পরম অভিধেয়—একমাত্র নামই ভগবদাকর্ষণ মন্ত্র।

অতঃপর আমাদিগের আলোচ্য বিষয় এই যে, অবিদ্যা বা মায়াই জীবের যাবতীয় দুঃখের একমাত্র কারণ। শ্রীভগবান্ মায়াধীশ—জীব মায়াধীন। শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে দুর্ভেদ্যা, সুদুস্তরা মায়া এক সুবিশাল যবনিকারূপে ব্যবধান ঘটাইয়া, আনন্দের নিত্যসেবক জীবকে, সেই ভূমানন্দময়ের নিত্য-সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। এই মায়াধীনতাই জীবের অনন্ত দুঃখ—অনন্ত পিপাসা—অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের একমাত্র কারণ। অনাদিকাল হইতেই ঈশ্বর মায়াধীশ—মায়ার নিয়ন্তা, আর জীব মায়াধীন,—মায়া নিয়ন্ত্রিত। অনাদি কাল হইতেই জীব যখন নিজ অসমর্থতাবশতঃই মায়ার নিকট পরাজিত হইয়া আসিতেছে, তখন স্বকীয় সামর্থ্যের দ্বারা সেই মায়াকে পরাভূত করা জীবের পক্ষে কোন কালেও সম্ভব নহে। যদি সম্ভব হইত, তবে সে মায়ার ক্রীতদাস হইয়াই বা থাকিবে কেন ? প্রাকৃত জগতে এমন কোনও বস্তু নাই, এমন কোনও অস্ত্র নাই, যাহার দ্বারা এই দুরত্যয়া মায়াকে সংহার করা যাইতে পারে,—যেহেতু এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের যাহা কিছু, সে সমুদয়ই প্রকৃতি বিনির্মিত, সুতরাং মায়ারই সম্পূর্ণ অধীন। এখন প্রশ্ন এই, তবে কি এ চির-বন্ধনের মুক্তি নাই ? তবে কি জীব, এ সুদৃঢ় মায়াজাল ছিন্ন করিতে কোন কালেই সমর্থ হইবে না ?

উপায় আছে। নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া, দুরত্যয়া এই মায়াশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার উপায় স্বয়ংই বলিয়া দিয়াছেন,— দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীতা—৭.১৪)

অর্থাৎ আমার চিরানুগতা, ত্রিগুণময়ী এই দৈবী মায়া, জীবের স্বসামর্থ্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুরতিক্রমণীয়া হইলেও, যে আমারই শরণাগত হইয়া, আমাকেই আশ্রয় করিয়া, নিজ হৃদয়ে আমাকেই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, এই দুরত্যয়া মায়া-যবনিকা অপসারিত করিতে সে-ই সমর্থ হয়।

যুক্তি সিদ্ধান্তপূর্ণ বটে। যেহেতু মায়া জীবের উপর অধিকার বিস্তারে সমর্থা হইলেও, সে শ্রীভগবানের চিরানুগতা—চিরাশ্রিতা ও তাহার কার্যকারিণী সেবিকা ; সুতরাং ভগবান্ হইতে সর্বদাই বিলজ্জমানা।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমিক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।। (শ্রীভাগবত—২.৫.১৩)

অর্থাৎ,—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়, নির্বোধ জীব সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প, ফণা বিস্তারপূর্বক দুর্বল ভেকের ভয়োৎপাদনে সমর্থ হইলেও, মন্ত্র-বিশারদ সাপুড়িয়ার নিকট যেমন মুহূর্তকাল মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়, রজনীর ঘনান্ধকার যেমন দিবাকরের উদয়াভাসেই অপসারিত হইয়া যায়, সেইরূপ মায়া জীবের উপর যতই অধিকার বিস্তার করুক না কেন, ভগবদাবির্ভাবের আভাস মাত্র পাইয়াই সে সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। সুতরাং এতাদৃশ মায়াধীশ ভগবানকে হৃদয়ে আবির্ভূত করিতে সমর্থ হইলে, জীব যে অচিরাৎ মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে, ইহা যে অতীব সুসিদ্ধান্তপূর্ণ যুক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে !

বুঝিলাম বটে। তথাপি প্রশ্নের অবসান হইল কি ? দিগন্ত-বিস্তৃত মহাসমুদ্রকুলে নিরুপায়, ভয়-বিহ্বল কোন পরপারের যাত্রীকে বিষাদিত প্রাণে দণ্ডায়মান দেখিয়া, যদি কোন ব্যাক্তি কৃপাপরবশ হইয়া, তাহাকে উপদেশ করেন—হে যাত্রিক ! তুমি অবসন্ন হইও না। সমুদ্রের অপর কূলে একখানি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিচিত্র তরণী অবস্থান করিতেছে। তাহার এমনই অচিন্ত্য প্রভাব যে, তাহার দর্শনমাত্র ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র আপনিই শান্তভাব ধারণ করে,—তাহার পথ বিপদশূন্য করিয়া দেয়। তুমি সে তরণী আশ্রয় করিয়া, এই বিশাল সমুদ্র নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হও। একমাত্র ইহারই আশ্রয় লাভ ব্যতীত এই মহাসমুদ্র পার হইবার গত্যন্তর নাই। তাহা হইলে যেমন বুঝিতে হইবে, এইরূপ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন তরণী, ভীষণ ভয়সঙ্কুল পারাবার পার হইবার উৎকৃষ্ট অবলম্বন হইলেও, তাহা যেমন ঐ বিপন্ন পরপারের যাত্রীর নিকট দুর্লভতাবশতঃ কোনও কার্যকরী হইতেছে না।

সেইরূপ মায়াতীত ভগবান্, মায়াধীন জীবের পক্ষে মায়া-সমুদ্র পার হইবার অচিন্ত্য তরণীস্বরূপ হইলেও, তাঁহাকে লাভ করা জীবের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না ; যেহেতু তাঁহাকে লাভ করিলে, মায়াসমুদ্র পার হওয়া সুখসাধ্য হয় বটে, কিন্তু এই মায়াই শ্রীভগবানকে পাইবার পক্ষে একমাত্র প্রবল অন্তরায়। তবে এমন উপায়, এমন মন্ত্র যদি কিছু থাকিত, যে শক্তি দ্বারা এ পারের ব্যক্তি পরপারস্থিত সেই অচিন্ত্য নৌকাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত, তাহা হইলে ঐ নৌকা দ্বারা তাহার অভীষ্ট পূরণ হইতে অবশ্যই পারিত—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব শ্রীভগবান্ আকর্ষিত হইতে পারেন, এমন কোন শক্তি বা উপায় যদি না থাকে, তাহা হইলে মায়াজাল ছেদন স্ব-সামর্থ্যের দ্বারা জীবের পক্ষে অসম্ভব কার্য, মায়াধীশ সেই শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করা জীবের পক্ষে তদপেক্ষা যে বহুতর অসম্ভব। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং "শ্রীভগবানই যে জীবের পক্ষে মায়াসমুদ্র উদ্ধারের একমাত্র তরণীস্বরূপ ইহা পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ জীবকে বলিয়া দিলেও, তাহাতে জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে

না—যতক্ষণ শ্রীহরি তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার উপায় বা মন্ত্র জীবকে নিজে শিক্ষা না দিতেছেন।

তাই শ্রীভগবান্ আবার নিজেই বলিতেছেন—হে মায়াহত জীবগণ ! তোমাদিগকে মায়াসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার আমিই একমাত্র তরণীস্বরূপ হইলেও, মায়াধীন পরিচ্ছিন্ন সংসারে এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা মায়াসমুদ্রের পরপার হইতে তোমরা আমাকে আকর্ষণ করিয়া আমারই সাহায্যে ভব-মহাপারাবার পার হইতে পার। অতএব তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, আমাকে ধরিবার উপায়—আমার আকর্ষণ মন্ত্র আমি নিজেই বলিয়া দিতেছি। ভগবান্ বলিতেছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।। (শ্রীভাগবত—৯.৪.৬৩)

ভক্তি যাঁহার হৃদয়ে বিকশিত, তিনিই ভক্ত। আমি ভক্তির অধীন হইয়া ভক্তির অনুগমন করিয়া, ভক্তহৃদয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই নিমিত্ত আমি স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তের নিকট আমার স্বাতন্ত্র্য থাকে না—আমি একমাত্র ভক্তিরই সম্পূর্ণ বশীভূত।

শ্রুতিও এই ভগবদ্‌বশীকরণ-মন্ত্র জগতে ঘোষণা করিয়াছেন,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি। বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি-যোগে তিষ্ঠতি।।" (প্রীতিসন্দর্ভধৃত মাঠরশ্রুতিঃ, শ্রীগোপালোত্তর তাপিনী—৯) অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যাইয়া ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বিজ্ঞান-ঘনানন্দরূপ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট সাধনা।

এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, (১) মায়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে জীব সক্ষম নহে, যতক্ষণ সে ভগবৎ সাহায্য লাভ না করিতেছে। (২) আবার সেই মায়াসম্মোহনকারী শ্রীভগবানের সাহায্য প্রাপ্তিও জীবের পক্ষে সম্ভব নহে—যতক্ষণ না জীব ভগবদাকর্ষিণী ভক্তির অধিকারী হইবে।

এখন আলোচ্য এই—যে ভক্তি ভগবানকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থা, তাঁহার স্বরূপ কি ? ইহা কোন দেশের বস্তু ? জীবেরই বা ইহাতে কতটুকু অধিকার ? যে সকল প্রতিবন্ধকতাবশতঃ জীব, স্বসামর্থ্যে মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে না এবং ভগবৎসাক্ষাৎ লাভেও অসমর্থ, সেইরূপ কোনও প্রতিবন্ধকতা, এই ভক্তি লাভেও আছে কিনা ?

পুজ্যপাদ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় 'সিদ্ধান্তরত্ন' গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ এক সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া ভক্তির স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করিব।

"ভগবদ্‌বশীকারহেতুভূতা ভক্তি কিং স্বরূপেতি, কিং প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা, কিংবা ভগবজ্‌জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা, উত হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসার-রূপেতি। নাদ্যঃ, ভগবতো মায়াবশ্যত্বা শ্রবণাৎ স্বতঃপূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, অতিশয়া-সিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ, জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ।" (১.৩৮)

অর্থাৎ ভগবদ্‌বশীকরণের হেতুভূতা ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য বলিতেছেন, উহা প্রাকৃত জ্ঞানানন্দরূপিণী, অথবা উহা শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী, কিংবা উহা কি জীবের জ্ঞানানন্দ স্বরূপিণী, অথবা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তির সাররূপা যে হ্লাদিনীশক্তি উহার সার-সমেত সম্বিৎশক্তির সাররূপা ?—ভক্তি কখনই প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপিণী হইতে পারে না। কেন না, শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য ভক্তির আছে,—প্রাকৃত কোনও শক্তির সে সামর্থ্য নাই। যেহেতু মায়াধীশ ভগবানের কখনও মায়ার বশ্যতা স্বীকার শ্রবণ করা যায় না। দ্বিতীয়পক্ষও সঙ্গত হয় না (অর্থাৎ ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞানানন্দরূপিণী, এ' কথারও স্বার্থকতা নাই।) যেহেতু ভগবান্ স্বতন্ত্র হইয়াও, ভক্তের ভক্তির নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন,—ভক্তের ভক্তিতে অধিক আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীভগবান্ পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী আনন্দের হ্রাস-বৃদ্ধির অসম্ভবনাবশতঃ উহাও সম্ভব হয় না। তৃতীয় জীবের জ্ঞানানন্দও ভক্তি নহে। কেননা, জীবের আনন্দ পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, ক্ষয়শীল সুতরাং জৈব-আনন্দ—বিপুল জ্ঞানানন্দস্বরূপা, নিত্যা ভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। অতএব চতুর্থপক্ষই স্বীকার্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তির সমবেত সাররূপাই ভক্তি। শ্রীভগবান্ যখন তদীয় ভক্তের প্রেমভক্তিতে বশীভূত হয়েন, ভক্তি যখন সর্বচিত্তাকর্ষক ভগবচ্চিত্তকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থা হয়েন, তখন ভক্তি যে হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তির সমবেত সাররূপিণী, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

ভক্তির স্বরূপ অবগত হইলাম সত্য, কিন্তু এখনও প্রশ্নের অবসান হইল কৈ ? ভক্তিই একমাত্র ভগবদাকর্ষণে সমর্থা, ইহা বুঝিলাম বটে; কিন্তু জীবের পক্ষে ইহা লাভ করিবার প্রবলতম অন্তরায়ই ঘটিয়া উঠিল। যখন জীব ভগবদধীনা মায়াকেই স্বসামর্থ্যে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তখন সেই পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীব, শ্রীভগবানও যাঁহার নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন ; এমন বিপুলা, নিত্যা, হ্লাদিনী-শক্তির সারভূতা ভক্তিকে কি প্রকারে নিজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা লাভ করিবে ?

হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ নির্ণয়ে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতি হ্লাদয়তে চ সা হ্লাদিনী।"

শ্রীভগবান্ সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের আনন্দস্বরূপ হইলেও, যে শক্তি আবার সেই ভগবান্ ও তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদগণেরও আনন্দস্বরূপ, সেই ভক্তিকে জীব নিজ সামর্থ্যে

যে কোন কালেও লাভ করিতে পারে না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

সুতরাং এই পর্যন্ত আলোচনা করিয়া ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, জীবের পক্ষে নিজ সামর্থ্যে (১) মায়াকে পরাজয় করা প্রবল অন্তরায় (২) শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিয়া, তাঁহার সাহায্যে মায়াকে পরাজয় করা প্রবলতর অন্তরায় ; এবং (৩) ভক্তিকে আকর্ষণ করিয়া, তাঁহার প্রভাবে ভগবানকে আকর্ষণপূর্বক সেই শ্রীভগবানের সাহায্যে মায়াকে পরাজয় করা প্রবলতর অন্তরায়।

তবে এখন উপায় কি ? ত্রিতাপের তুষানল হইতে তবে কি জীব আর কোনও কালে, কোনও উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না ? মায়া-নিগড়ে বদ্ধ হইয়া তবে কি জীব অনন্তকাল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াই কাটাইবে ?

কখনই নহে। উপায় নিশ্চয়ই আছে। গতিহীনের গতি যদি নাই হইবে, তবে শ্রীভগবানের 'অগতির গতি' নামের সার্থকতা কোথায় ? তাই ভগবান্ পুনরায় শাস্ত্রমুখে জীবকে বলিতেছেন,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাৎ নামনামিনোঃ।।

[হরিভক্তিবিলাস ধৃত (১১-৫০৩) পদ্মপুরাণ বাক্য]

অর্থাৎ নাম ও নামীর ভেদ না থাকায়, চৈতন্যরসমূর্তি, সর্ববিধ শক্তিপূর্ণ, মায়াগন্ধ-বর্জিত, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণিসদৃশ সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ 'নাম'রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

নাম ও নামী নিত্য মিলিত, নিত্য যুক্ত, নিত্য আলিঙ্গিত, অভেদাত্মা। তাই পরমেশ্বরের অপর একটি নাম বা পর্যায় 'নামনামিক', ইহা মহাভারতের শান্তিপর্বে উক্ত হইয়াছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৭.১২৮)

নাম নামী হইতে অভেদ বুঝিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নামীতে যে ধর্ম, যে শক্তি যে পরিমাণে অবস্থিত ; নামেতেও সেই ধর্ম, সেই শক্তি, সেই পরিমাণেই পরিস্থাপিত হইয়াছে। যদি কিঞ্চিৎ অংশেও ন্যূনাধিক থাকিত, তাহা হইলে অভিন্ন শব্দের সার্থকতা হইত না। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, ভগবৎ হ্লাদিনী-শক্তি সারভূতা ভক্তি যেমন নামীরূপ শ্রীভগবানকে বশীভূত করিয়া তাহাতেই অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ নাম ও নামীর অভিন্নতাবশতঃ নামরূপ ভগবানেও ভক্তি সেই ভাবেই অবস্থিত রহিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন হইয়াও অভিন্নের ন্যায়—কখনও পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন না। দাহিকা শক্তি পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি এবং

অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া দাহিকা শক্তি যেমন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীভগবান্ তদীয় শক্তিকে এবং শক্তি শ্রীভগবানকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করিতে সক্ষম নহেন। অতএব শ্রীভগবানের ভক্তি, অনাদি অনন্ত শক্তিই নামের সহিত নিত্যযুক্ত রহিয়াছেন। সেই সহজলভ্য নামকে গ্রহণ করিলেই তৎসহ ভক্তিকেও জীব লাভ করিয়া থাকে। কারণ শক্তি ও শক্তিমান নিত্যযুক্ত সুতরাং নামরূপ ভগবানের সহিত ভক্তি নিশ্চয় অবস্থিত আছেন। অবিরত নাম-কীর্তনের সহিত ভক্তি যতই পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন, শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট ততই সুখলভ্য হইবেন। ক্রমে জীব যখন ভক্তির ফলস্বরূপ প্রেমরূপ পুরুষার্থ-শিরোমণিকে প্রাপ্ত হইবে, তখন নামরূপ ভগবান্ নামীরূপ ভগবানে পরিণত হইবেন। ভগবান্ সর্বদা স্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার কোনও বিকার নাই। তবে এই যে তাঁহার পরিবর্তনের কথা উক্ত হইল, ইহা বুঝিতে হইবে বস্তুতঃ তাঁহার পরিবর্তন নহে। মেঘ যেমন সরিয়া গেলে সূর্যেরই গতি বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ জীবের মায়াজাল উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারই দৃষ্টির পরিবর্তনে, ভগবানেরই পরিবর্তন বলিয়া মনে হয়। জীব নামের আশ্রয় লইয়া ভক্তির সাধনা করিতে সমর্থ হয়। ভক্তি পরিপক্ক হইলেই প্রেমের উদ্গাম হইয়া থাকে, নাম নামীতে পরিণত হন। তখন তাহার দৃষ্টি যেখানেই পতিত হয় সেখানেই নামীর স্ফুরণ হইয়া থাকে।

মহাভাগবতে দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার কৃষ্ণের স্ফুরণ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.২২৬)

অতএব ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থরূপ প্রেমানন্দের অধিকারী হইতে হইলে একমাত্র কৃষ্ণনামই অভিধেয়, পূর্বে যে ভক্তিকে অভিধেয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এই নাম, সেই নববিধ সাধন ভক্তিরই অন্যতম এবং তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। শুধু শ্রেষ্ঠতমই নহে, ইহা নববিধ ভক্তির উৎপাদক অর্থাৎ অঙ্গীস্বরূপ। সুতরাং পরম অভিধেয় নববিধ ভক্তি একমাত্র নামরূপ সলিল সিঞ্চনেই প্রস্ফুটিত হইয়া, পরিশেষে প্রেমরূপ ফলের উৎপাদক হইয়া থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার সেই জন্য বলিয়াছেন,—

এক কৃষ্ণ নামে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।।
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে।।
অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০৮-১১০)

নামের অচিন্ত্য শক্তি জীবকে জানাইবার জন্য নাম নামী অভেদাত্মা এই আশার বাণী জগতে ঘোষণা করিবার জন্য শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন,—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।

[হরিভক্তিবিলাস (২-২৮৪) ধৃত পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা সংবাদীয়-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীপৃথু-নারদ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তি]

অর্থাৎ হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করি না, যোগীর হৃদয়েও নহে। যেখানে মদ্গতপ্রাণ ভক্ত আমার নাম কীর্তন করেন, আমি সেইখানেই, সেই নামের সহিত জড়িত, মিলিত, আলিঙ্গিত হইয়া নিত্য অবস্থান করি।

সুতরাং এতাদৃশ নামের আশ্রয় লইলে যে জীবের সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে তাহাতে আর সংশয়ের বিষয় কি থাকিতে পারে। অলৌকিক, অচিন্ত্য বস্তুর প্রভাব কেবলমাত্র নিজের অনুভব দ্বারাই উপলব্ধি হইতে পারে। তাহা সকল তর্ক ও যুক্তির সম্পূর্ণ অতীত এবং সাধনলব্ধ বস্তু। তুচ্ছ মণি প্রবালাদি ধারণ করিয়া, তাহাদের অলৌকিক শক্তি কতজন, কত সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ; আর এই অপ্রাকৃত হরিনামে যে অচিন্ত্য শক্তিসকল নিহিত থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? যে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া উঠে, দেহে অপূর্ব পুলকাবলীর সঞ্চার হয়, মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহা যে কি অমৃত দিয়া বিনির্মিত, কি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, যে ভাগ্যবান্ একবারমাত্র আস্বাদন করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই তাহা বুঝিতে সমর্থ। তবে ইহা স্থির যে কৃপাসিন্ধু শ্রীহরির পরম কৃপা, একমাত্র নামেতেই সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মায়াময় সংসারে তাঁহার সম্বন্ধ মাত্রেরই উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইলেও, শ্রীভগবান্ জীবের উদ্ধারের জন্য নামরূপে জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তথাপি আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমরা সে নামের স্বরূপ না বুঝিয়া আজীবন ঘুরিয়া মরিতেছি। তাই মহাপ্রভু জীবকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছে,—

নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।। (শিক্ষাষ্টক—২)

অর্থাৎ হে ভগবন্ তুমি—মায়ামুগ্ধ আমরা—আমাদের উদ্ধার মানসে, নিজ মঙ্গলময় নামকে, বিভিন্ন জীবের বাঞ্ছানুরূপ বিভিন্নরূপে বিভক্ত করিয়াছ। শুধু তাহাই নহে, আবার তোমার সমুদয় শক্তিই সেই সেই নামে সমর্পণ করিয়াছ। অধিকন্তু স্মরণ করিবার কোন কালাদিরও বিচার রাখ নাই। হে ভগবন্ আমার উপর এতাদৃশী কৃপা

সত্ত্বেও, এমনই দুর্দ্দৈব যে, এ হেন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

শাস্ত্রবর্ণিত নাম-মহিমার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, হয়ত আমরা অনেকেই অনেক সময় নামের তাদৃশী শক্তি অনুভব করিতে পারি না। যে হরিনাম, শাস্ত্রে 'মধুরাদপি মধুর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, আস্বাদন করিতে গিয়া আমরা হয়ত অনেকেই মিষ্টতার পরিবর্তে তিক্তপ্রায় অনুভব করিয়া থাকি। যে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনায় শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য কি যে তত পাপ করে।।

সেই বাক্য কার্যের সহিত মিলাইতে গিয়া সাধারণতঃ আমরা বিফল মনোরথ হইয়াই থাকি। সর্ব শক্তিসম্পন্ন, সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীহরিনামে অনুরাগ না জন্মিবার ইহাই প্রধান কারণ।

নাম ও নামীর অভেদ বিষয়ে, কেবল শাস্ত্রবাক্যকেই প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু যুক্তি-তর্কের অগোচর বলিয়া সর্বশাস্ত্রকারগণ ঘোষণা করিয়াছেন। যথা,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ৫.১২)

অর্থাৎ অচিন্ত্য বস্তুসকল তর্কের সহিত যোজনা করা অকর্তব্য। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাকেই অচিন্ত্য বলিয়া জানিবে।

অপ্রাকৃত বস্তু তর্কের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না বলিয়াই বেদান্ত সূত্রকারও বলিয়াছেন,—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য বস্তু তত্ত্ব-নির্ণয়ে আমাদের লৌকিক যুক্তি-তর্কাদি সকল সময় জয়যুক্ত হয় না বলিয়াই যে আমরা অলৌকিক বস্তুসকল "তুচ্ছজ্ঞানে" অবহেলাপূর্বক পরিত্যাগ করিব, ইহা অত্যন্ত অসার যুক্তি। আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন লৌকিক জ্ঞান যে সীমা অতিক্রমে সম্পূর্ণ অসমর্থ, সেই গভীর তমসাচ্ছন্ন, অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত পথ প্রদর্শনে একমাত্র শাস্ত্র-বাক্যই আমাদিগের পক্ষে উজ্জ্বলতম আলোক। অচিন্ত্য ও অলৌকিক বস্তু নির্ণয়ে শাস্ত্রই একমাত্র উপায়-স্বরূপ বলিয়াই, বেদান্ত সূত্রকার বলিয়াছেন,—

"শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ"। (১.১.৩)

সুতরাং অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন শ্রীহরিনামের স্বরূপ ও মহিমাদি নির্ণয়ে অনাদি-সিদ্ধ, অপৌরুষেয়, লৌকিকালৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র আকর-স্বরূপ শাস্ত্রবাক্যই যে প্রধানতম উপায়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু জীবের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই অনির্বচনীয়, অপার করুণা যে, তাঁহার নাম তাঁহারই ন্যায় অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন হইলেও, সর্বজীবের হিতার্থ এই প্রাকৃত জগতে, প্রাকৃত বস্তুর

ন্যায় সহজলভ্যরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভুবন-মঙ্গল হরিনাম, প্রাকৃত জীবের পক্ষে অন্যান্য অপ্রাকৃত বস্তু অপেক্ষাও নিগূঢ়তম, অচিন্ত্যতম ও একমাত্র আপ্তোপদেশ-গ্রাহ্য হইলেও, কৃপাসিন্ধু শ্রীহরির এমনই অসীম করুণা যে, লৌকিক যুক্তিস্পৃহ জীবের পক্ষে শাস্ত্রবাক্য স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদিগের পরিচ্ছিন্ন যুক্তি-পক্ষেও নামনামী অভিন্নাত্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

কেবল লৌকিকদৃষ্টিতেও যদি আমরা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি, এই প্রাপঞ্চিক জগৎ, পদ এবং পদার্থেরই সমষ্টি মাত্র। জাগতিক সমস্ত পদ ও পদার্থ পরস্পর সাপেক্ষ বিষয় ; এখানে কোনও একটি পদার্থশূন্য পদ বা পদশূন্য পদার্থ পরিলক্ষিত হয় না। পদ এবং পদার্থ ভিন্ন হইলেও, পদার্থ ভিন্ন একটি অতিরিক্ত পদ আজ পর্যন্তও সৃষ্টি হয় নাই। পত্র, পুষ্প, কাণ্ড শাখাদি বিশিষ্ট কোনও উদ্ভিদ পদার্থ আছে বলিয়াই, তাহার অর্থবাচক বৃক্ষ নামক একটি পদও আছে। বৃক্ষ পদটি স্বয়ং পূর্ববর্ণিত শাখা-পল্লবাদি বিশিষ্ট পদার্থবিশেষ না হইলেও উক্ত পদার্থ আছে বলিয়াই বৃক্ষ পদটিরও সার্থকতা হইয়াছে। 'বৃক্ষ' নামধেয় পদার্থটির সত্তা জগতে না থাকিলে, বৃক্ষ পদটি কোনও কালে অভিধানে স্থান পাইত কি ? কেবল বৃক্ষ বিষয়েই নহে, প্রাপঞ্চিক যে কোন পদ ও পদার্থ আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, পদার্থ ব্যতীত এখানে কোনও একটি অতিরিক্ত পদ নাই। পদার্থশূন্য পদ হইতে পারে না—নামীশূন্য নাম নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এইবার আমরা একটি পদের উল্লেখ করি। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, এই সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চের মধ্যে আমরা একটি পদের সন্ধান দিব, যাহা আপাত দৃষ্টিতে পদার্থশূন্য, অর্থহীন, এই পদটির এই পদার্থশূন্যতা—এই অর্থহীনতাই প্রাকৃতিক যাবতীয় পদ বা নাম হইতে ইহার একমাত্র বিশেষত্ব। এই পদ আর কিছুই নয়,—

শ্রীভগবন্নাম।

হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রাম প্রভৃতি পদ যখন সেই শ্রীভগবন্নামরূপে পরিকীর্তিত হয়, তখন জাগতিক সমুদয় পদের মধ্যে কেবল এই ভগবন্নামই একমাত্র পদার্থশূন্য পদরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে,—অনাদিকাল হইতে এই পদের যিনি পদার্থ, এই নামের যিনি নামী, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য জীব কতই না চেষ্টা করিয়াছে। সেই পদার্থের সন্ধানে বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল তন্ন তন্ন করিয়া বিচার বিতর্কের পর অবশেষে 'নিহিতং গুহায়াং' বলিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। স্বয়ং বেদ সে পদার্থের সন্ধান করিতে গিয়া "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ"—অর্থাৎ যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে আর কোন কারণ দ্বারা জানা যাইবে, এই বলিয়া বিশ্রাম

লাভ করিয়াছেন। এই সকল পর্যালোচনা করিয়া মনে হয়, একি হইল ? পদ আছে, অথচ পদার্থের সন্ধান মিলে না, নাম আছে, অথচ নামীকে খুঁজিয়া পাই না,—এ'রূপ ঘটনা এ' জগতে কুত্রাপি ত দেখি নাই। ইহা চিন্তার অতীত, যেন কোনও এক অলৌকিক কুহকে সমাচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক অন্যান্য নামের সহিত শ্রীভগবন্নামের ইহাই বিশেষত্ব। এই গেল সাধারণ যুক্তির কথা। এখন আর একটু গভীর ভাবে যদি আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, তবে দেখিব,—প্রাকৃতিক অন্যান্য নামের সহিত শ্রীভগবানের নামের বিশেষত্ব আছে সত্য, কিন্তু যে বিশেষত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইল (অর্থাৎ জগতে শ্রীভগবন্নামই একমাত্র পদার্থশূন্য পদ), প্রাকৃতিক সমুদয় নামের সহিত শ্রীভগবন্নামের এ জাতীয় বিশেষত্ব নহে, বিশেষত্ব এই যে, কেবল একমাত্র শ্রীভগবন্নামই একাধারে পদ এবং পদার্থ, নাম ও নামী নিত্য মিলিত, নিত্য যুক্ত, নিত্য আলিঙ্গিত, অভেদাত্মা। তাই পরমেশ্বর শ্রীহরির অপর একটি নাম বা পর্যায় 'নামনামিনো', ইহা মহাভারতের শান্তি পর্বে উক্ত আছে।

পদ যখন আছে, তখন পদার্থ থাকিবেই,—নামী ব্যতীত নামের সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা সিদ্ধান্ত। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীভগবন্নামের নামীকে খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই ইহাকে পদার্থশূন্য পদ বলিতে হইবে ইহা অতীব অসার যুক্তি। জ্ঞানের দ্বারা, তর্কের দ্বারা, নিজ সামর্থ্যের দ্বারা জীব নামীকে বাহির করিবে—ইহা পঙ্গুর শৈল লঙ্ঘন-প্রবৃত্তির ন্যায় বাতুলতা মাত্র। তিনি স্বয়ং ধরা না দিলে কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না—তিনি স্বয়ং দেখা না দিলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, ইহাই শ্রীভগবানের ভগবত্তা। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন,
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।। (কঠোপনিষদ্—১.২.২৩)

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে বেদাধ্যাপন, মেধা (অর্থাৎ গ্রন্থার্থ ধারণ শক্তি) বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না ; যে ভক্তকে ইনি আত্মদর্শনার্থ বরণ করেন, তাঁহার নিকটই ইনি স্বকীয় তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মায়াধীন আমরা মায়ামুগ্ধতাবশতঃ সেই মায়াধীশ ভগবানকে প্রাকৃতিক লক্ষণের সহিত মিলাইয়া বাহির করিতে সচেষ্ট হই। আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন জগতের সমুদয় পদ এবং পদার্থ পরস্পর বিভিন্ন মানি বলিয়া, সেই দৃষ্টান্তবলে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নামকে সেইরূপ বিভিন্ন মনে করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া খুজিয়া বেড়াই—তথাপি পাই না। এই প্রাকৃত জগতে ভগবন্নামের অভাব কেহ স্বীকার করিতে পারেন না—নামীরই অভাব

আছে। পদার্থ খুঁজিয়া পাই নাই। সুতরাং ভগবানের নাম জীবের বাঞ্ছানুরূপ বহুধা বিভক্ত হইয়া যে সর্বত্রই অবস্থান করিতেছেন, সকলেরই সুখলভ্য হইয়াছেন, এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্য বোধ হয়, প্রমাণাদির দ্বারা কাহাকেও আর দেখাইয়া দিতে হইবে না। আমরা নামীর সন্ধান পাই না মাত্র। কিন্তু নামের সত্তা কোনদিনও অস্বীকার করি নাই। নাম ও নামী অভেদাত্মা[১]। ইহা জানিনা বলিয়াই আমরা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অন্যান্য পদের মত শ্রীভগবন্নামও পদার্থশূন্য মনে করিয়া লোকে যেমন ভ্রমবশতঃ হীরক খণ্ডকে কদাচিৎ বা কাচ খণ্ডের সহিত একই স্থানে ফেলিয়া রাখে ; তদ্রূপ হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রাম, প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভগবন্নাম সকল প্রাকৃত নামের সহিত একই আসনে সংস্থাপিত করিয়াছি। এই ভ্রমই আমাদের ত্রিবিধ সংসার-দুঃখের একমাত্র হেতু, তাই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১.১৯)

সুতরাং শ্রীভগবন্নামই যে কলিহত জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

কলের্দ্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। (শ্রীভাগবত—১২.৩.৫১)

অর্থাৎ হে নৃপতি ! কলির নিখিল দোষ সত্ত্বেও, এই একটি মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে হরিনাম কীর্তন করিলে বন্ধনমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণনামের অনির্বচনীয় মহিমা ও অনন্ত শক্তির কথা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে কেহই সক্ষম নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী, তদীয় হরিভক্তিবিলাস নামক মহাগ্রন্থের ১১শ বিলাসে বহু শাস্ত্র-প্রমাণাদি-সম্বলিত প্রায় দুই শতাধিক শ্লোক দ্বারা নামের অচিন্ত্য মাহাত্ম্য ও অনন্ত শক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। নামের মহিমা অনির্বচনীয় বলিয়া, তিনিও তাঁহার এই প্রয়াস বিষয়ে বৈষ্ণব-জন-স্বভাবোচিত দৈন্য প্রদর্শনপূর্বক পরিশেষে বলিতেছেন,—

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বিখ্যাতং সংক্ষেপেণাত্র লিখ্যতে।

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য অতি বিস্তৃত ও বিখ্যাত হইলেও এ'স্থলে তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

আমি এই মহাজনেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই মহাগ্রন্থ হইতে অতি সামান্য কয়েকটি অংশমাত্র আপনাদিগের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বাহুল্যভয়ে মূল শ্লোক

১। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।।

উদ্ধৃত না করিয়া, কেবল অনুবাদ মাত্রই উল্লেখ করিব।

করুণার মহাপারাবার শ্রীভগবান্ বদ্ধজীবের উদ্ধার মানসে নিজ নাম বহুধা বিভক্ত করিয়া, তাহাতে আবার নিজ সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীব, কৃষ্ণ ভুলিয়া নিরন্তর সংসারের প্রতিই আসক্ত রহিয়াছে। শ্রীভগবানের কেবল একটি মাত্র নাম হইলে, যদি সকলের পক্ষে গ্রহণ করিবার অভিলাষ না হয়, এইজন্য পরমকরুণাময় শ্রীহরি, বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বাঞ্ছানুরূপ নিজেকে বিভিন্ন নামরূপে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। তাই যত বাঞ্ছা, তত নাম। এমন অপার করুণা কেহ কি কোথাও দেখিয়াছে ? এমন কৃপার কথা কেহ কি কখন শুনিয়াছে ? কামনা সিদ্ধির মানসেও জীব যদি নিজ বাঞ্ছা ও রুচি অনুরূপ কোনও একটি নামের স্মরণ লয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই নামের আনুষঙ্গিক ফলে নিজ অভীষ্ট পূরণ ও মুখ্য ফলস্বরূপ ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অশেষ কৃপার একমাত্র নামেতেই সার্থকতা হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীগোপালভট্ট তাই সর্বাগ্রে কামনা বিশেষে ভগবানের নাম বিশেষের মাহাত্ম্য দেখাইতেছেন।

সর্ববিধ কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত—কামপ্রদ, কান্ত, হরি, আনন্দ ও মাধব প্রভৃতি নাম সর্বদা স্মরণ করিবে। যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত, পুরুষোত্তম নাম তাঁহার পক্ষে জপ করা কর্তব্য। বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে দামোদর নাম স্মরণ করা উচিৎ। সঙ্কট সময়ে হৃষিকেশ নাম ও ঔষধ-সেবনে অচ্যুত ও অমৃত নাম চিন্তা করিতে হইবে। যুদ্ধযাত্রাকালে অপরাজিতের নাম জপ করিবে। বাণিজ্যে উন্নতি কামনায় অজিত, অধিপ, সর্ব ও সর্বেশ্বর নাম স্মরণ করা কর্তব্য। দস্যু ও বৈরিগণের আক্রমণে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কটকালে অথবা ভীষণ বিপদ ও ঘোর অন্ধকারে নৃসিংহ নাম জপ করিবে। অগ্নিদাহে জলশায়ী, দুঃস্বপ্ন দর্শনে নারায়ণ ও বিষপ্রয়োগ ঘটিলে গরুড়ধ্বজ প্রভৃতি নাম স্মরণীয়। এইরূপ জীবের বহু প্রয়োজন ও কামনা পূরণোপযোগী বহু নামের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবিধ কামনাগ্রস্ত বহির্মুখ জনের অভীষ্ট পূরণ করিয়াও কোন প্রকারে স্বীয় নামে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ত্রিতাপ-জ্বালা হইতে উদ্ধারপূর্বক ভূমানন্দের অধিকারী করিবার জন্যই শ্রীভগবানের এই প্রয়াস—এই করুণা। নচেৎ তাঁহার যে কোন নাম-মাত্রই সর্বাভীষ্টপ্রদ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন। শাস্ত্রও তাই বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ।।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ।।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.১৩৪)

অর্থাৎ ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী সর্বার্থ-শক্তিসম্পন্ন, অতএব যাঁহার যে কোন নামে অভিরুচি হয়, তাহাই কীর্তন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য, কারণ পরমব্রহ্ম শ্রীহরির এই নাম-সকল একার্থবোধক, সুতরাং সকল নামেই সর্বার্থ সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

এই মায়ামুগ্ধ সংসারে শ্রীভগবন্নাম অসংখ্য, অপরিসীমভাবে প্রচারিত হইবার হেতু প্রদর্শন করিয়া, গোস্বামিপাদ পরিশেষে সেই প্রত্যেক নামই যে সর্বসিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্ববিঘ্ন-নাশন, সর্বমঙ্গলজনক, সর্বাভিধেয় শিরোমণি তাহাই বিভাগানুসারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নামের অখিল পাপ-ধ্বংসনত্ব বিষয়ে বলিতেছেন—হে মানবগণ ! প্রদীপ্ত পাপবহ্নি দেখিয়া তোমরা ভয়ভীত হইও না। কারণ, যে'রূপ জলদের জলবিন্দুসমূহে হুতাশন নির্বাপিত হয়, সেইরূপ গোবিন্দ-জলধরের নামরূপ জলবিন্দু সিঞ্চনে পাপাগ্নি নিঃশেষিতরূপে নির্বাপিত হইয়া থাকে। যাঁহাতে চিত্তার্পিত করিলে কখনও নরক দর্শন হয় না, যাঁহাকে ধ্যান করিলে স্বর্গলাভও বিঘ্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, যাঁহার সমাধিতে ব্রহ্মলোক তুচ্ছ বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে, যে অব্যয় পুরুষ অন্তরে অবস্থিতি করিলে, মুক্তি হইতেও অধিক সম্পদ লাভ ঘটে, সেই ভগবন্নাম-কীর্তনে যে পাপ বিদূরিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য বা সন্দেহ কি ? কর্মজ, বাক্যজ বা চিত্তজ এমন কোনও পাপ নাই, গোবিন্দ নামোচ্চারণ যাহাকে ক্ষয় না করিতে পারে। অধিক কি, যে পাপ বর্তমান, যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ভগবানের নামাগ্নি সংস্পর্শেই সে সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জানিয়া বা না জানিয়াও হউক, উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করে, অগ্নি যে'রূপ ইন্ধন দহন করে, সেইরূপ তাহার সমুদয় পাপ ভস্মীভূত হয়। না জানিয়া স্পর্শ করিলেও যে'রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ পুত্রাদি নামচ্ছলেও তাঁহার নামকীর্তন ঘটিলে সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। অধিক কি সংকেতে,—সন্তানাদির নাম গ্রহণে, পরিহাসে, গীতাদিতে অথবা অবহেলাক্রমেও বৈকুণ্ঠ নাম উচ্চারিত হইলেও (এই নামাভাসেই) অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়। এই কলিকালে একমাত্র 'গোবিন্দ' এই নাম দ্বারা মাধবের সংকীর্তন করিয়া দেহীদিগের যাদৃশ শুদ্ধি সম্পাদিত হয়,—পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াও তাদৃশ শুদ্ধি হয় না। পৃথিবীতে যে সকল কোটি কোটি পবিত্র পদার্থ আছে, কৃষ্ণনামের সহিত তাহাদের তুল্যতা দাঁড়াইতে পারে না। তুল্যতা ত বহু দূরের কথা, তুলনা করিবার প্রয়াস পাইলেও নিরয়গামী হইতে হয়। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে,—

কোটি-অশ্বমেধ সম এক কৃষ্ণনাম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৩.৬৪)

কৃষ্ণনামের কলুষনাশিত্ব সম্বন্ধে উক্তরূপে বর্ণন করিয়া সর্বশেষ বলিতেছেন, পাপ হরণ বিষয়ে হরিনামের যে শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, পাতকী-জনে সে পরিমিত

পাপানুষ্ঠান করিতেই পারে না। যথা,—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.১৫৯)

অতঃপর শ্রীভগবন্নাম-কীর্তন-কারীর কুল-সঙ্গিজন পাবকত্ব, সর্ব-ব্যাধিনাশিত্ব, সর্বদুঃখপ্রশমনত্ব প্রভৃতি অচিন্ত্য গুণাবলীসকল একে একে উল্লেখ করিতেছেন,—

(১) কীর্তনকারীর কুল ও সঙ্গিজন-পাবকত্ব—বিষ্ণু-নামনিষ্ঠ রসনা যে কেবল একমাত্র বক্তাকেই রক্ষা করেন, তাহা নহে, শ্রীভগবানের নামাত্মিকা কীর্তি শ্রবণ করাইয়া নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, হে নৃসিংহ ! যাহারা আনন্দিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম কীর্তন করেন, তাঁহারাই সাধু, তাঁহারাই সর্বজীবের অকপট ও স্বার্থশূন্য বন্ধু। (হরিভক্তিবিলাস—১১.১৬৫-১৬৭)

(২) কীর্তনকারীর সর্বব্যাধিনাশিত্ব—ব্যাসদেব শাম্বকে বলিতেছেন, হে শাম্ব ! যখন অন্যান্য ঔষধে ব্যাধিজনিত দুঃখ বিদূরিত হয় না, তখন তদ্দ্বারা উহার প্রতিকার কর্তব্য নহে, তখন একমাত্র হরিনামরূপ মহৌষধই যে সর্বব্যাধি-বিনাশক, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। (হরিভক্তিবিলাস—১১.১৬৮)

(৩) শ্রীভগবন্নামের সর্বদুঃখোপশমনত্ব—শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, ভগবানের নাম গুণাদি সংকীর্তন অথবা তদীয় বিক্রম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে ভগবান্ হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবাকর যেমন তমোরাশি বিনাশ করেন, অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু জলদজাল বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ জীবগণের নিখিল দুঃখ অপসারিত করেন।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.১৬৯-১৭২)

(৪) শ্রীভগবন্নামের কলিবাধাপহারিত্ব—বৃহন্নারদীয়ে কলিধর্ম প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, যে সকল মনুষ্য এই ঘোর কলিযুগে হরিনাম পরায়ণ, তাহারাই কৃতার্থ হইয়াছেন। যেহেতু কলি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.১৭৩)

(৫) শ্রীভগবন্নামের কর্মসম্পূর্তিকারিত্ব—শ্রীভগবানের প্রতি শুক্রাচার্য বলিতেছেন, মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যূনতা ঘটে, (নিরন্তর) তোমার নামকীর্তনে সে সমুদয়কে নিশ্ছিদ্র করিয়া থাকে। (হরিভক্তিবিলাস—১১.১৮০)

(৬) শ্রীভগবন্নামের সর্ববেদাধিকত্ব—বিষ্ণুধর্মোত্তরে প্রহ্লাদ বলিতেছেন, যিনি 'হরি' এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় তদ্দ্বারা ঋক, সাম, যজু, অথর্ব এই বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়নের সমুদয় ফল লাভ করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণে পার্বতীর উক্তিতেও আছে, বৎস ! তুমি বেদ চতুষ্টয়ের কিছুই পাঠ করিও না,—শ্রীহরির 'গোবিন্দ' এই গানযোগ্য নাম নিত্য কীর্তন কর।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.১৮১-১৮৩)

(৭) শ্রীভগবন্নামের সর্বতীর্থাধিকত্ব—স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই দুইটি বর্ণ বাস করিতেছেন, তাঁহার কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন কি ? অথবা কাশী ও পুষ্করতীর্থেই বা আবশ্যক কি ? বামনপুরাণেও বলিয়াছেন, শতকোটি তীর্থই বল, অথবা সহস্রকোটি তীর্থই বল, বিষ্ণুর নামানুকীর্তন প্রভাবে জীব সেই সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(৮) শ্রীভগবন্নামের সর্বসৎকর্মাধিকত্ব—সূর্যগ্রহণ-সময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগে গঙ্গাজলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরু পরিমিত সুবর্ণ দান, ইহার কিছুই গোবিন্দ নাম কীর্তনের শতাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

(৯) শ্রীভগবন্নামের জগদ্বন্দ্যতা প্রতিপাদকত্ব—বৃহন্নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সর্বদা 'নারায়ণ', 'জগন্নাথ', 'বাসুদেব', 'জনার্দন' প্রভৃতি শ্রীহরির নামসকল কীর্তন করেন, তাঁহারা সর্বত্র সকলের বন্দিত হইয়া থাকেন। স্ত্রীজাতি, শূদ্র, চণ্ডাল এমন কি, অন্য কোনও অন্ত্যজ যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্তন করে, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

(১০) শ্রীভগবন্নামের সদা সর্বত্র-সেব্যত্ব—বিষ্ণুধর্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—হে লুব্ধক ! শ্রীহরিনাম কীর্তন বিষয়ে দেশ ও কালাদির কোন নিয়ম নাই, এমন কি উচ্ছিষ্ট মুখেও নাম গ্রহণের নিষেধ নাই। যখন 'হরি' পবিত্রকারী, তখন তাঁহার নাম-কীর্তনে অশৌচাপেক্ষা কোথায় ? অতএব সর্বদা, সর্বত্র তাঁহার নাম কীর্তন করা কর্তব্য।

এতদ্ব্যতিত শ্রীভগবন্নামের মুক্তিপ্রদত্ব, বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপকত্ব, শ্রীভগবৎ প্রীণনত্ব, শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ে আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্‌ভট্টপাদ শ্রুতি, স্মৃতি ও সমগ্র পুরাণ-সংহিতাদি হইতে ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণাদি সংগ্রহপূর্বক শ্রীভগবন্নামই যে জীবের প্রধানতম শরণীয়, তদ্বিষয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

স্মর্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।

(পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৪২ অধ্যায়, বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্র-৯৭)

অর্থাৎ সর্বদা শ্রীভগবানকে স্মরণ করা কর্তব্য, কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। যাবতীয় বিধি নিষেধ, সে সকলই এই দুই বিধি নিষেধের অধীন।

চিকিৎসক কোন রোগীকে তাহার ব্যাধি নিবারণের উপায়স্বরূপ কোন ভেষজ সেবনের ব্যবস্থা প্রদান করিলে, আতুর রোগী চিকিৎসক বর্ণিত লক্ষণাদির সহিত না মিলাইয়া যেমন সেই ভেষজ সেবন করিতে পারে না এবং সেবন করিলেও কোন

কার্যকারী হয় না ; সেইরূপ ভবব্যাধি নিবারণের পক্ষে 'নামামৃত'ই পরম মহৌষধ বলিয়া বুঝিলেও আমরা সচরাচর যে নামকীর্তনাদি করিয়া থাকি, আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণ-বর্ণিত লক্ষণাদির সহিত মিলাইয়া এখন দেখিতে হইবে—উহা বাস্তবিকই সেই ভেষজই কিনা ? এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে একটি অবশ্য উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় লক্ষণাদি মিলাইতে গিয়া যদি আমরা পরস্পরের মধ্যে বিপুল ব্যবধান দেখিতে পাই, তাহা হইলে বরং মনে করিতে পারি, আমরা সচরাচর যে নাম কীর্তন করি, তাহা হয়ত শাস্ত্র-বর্ণিত, অনির্বচনীয়, সর্বশক্তি-সম্পন্ন সে নাম নহে। কেন না, আমাদিগের এরূপ ভ্রমেরও সহজেই প্রতিকার করা যাইতে পারিবে, কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্দৈববশতঃ যেন এরূপ মনে না করি, নামের মাহাত্ম্য ও লক্ষণাদির বিষয় শাস্ত্র যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অর্থবাদ অর্থাৎ অতিরঞ্জিত কবি কল্পনা মাত্র। যেহেতু শ্রীভগবন্নাম-মহিমায় এতাদৃশ অর্থবাদ চিন্তনে যে দূরপণেয় অপরাধ ঘটিবে, তাহা হইতে উদ্ধার লাভ নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেইজন্য নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া, নামাপরাধ বিষয়ে উল্লেখ করিবার পূর্বেই শাস্ত্রকারগণ সকলকে সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

ঈদৃশে নাম মাহাত্ম্যে শ্রুতিস্মৃতি-বিনিশ্চিতে।
কল্পয়ন্ত্যর্থবাদং যে তে যান্তি ঘোরযাতনাম্।। (হরিভক্তিবিলাস—১১.১৭৭)

অর্থাৎ যাহার ঈদৃশ শ্রুতিস্মৃতি-বিনির্দ্ধারিত নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ে অর্থবাদ কল্পনা করে, তাহারা নরকাদি নিদারুণ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যাহা হউক অতঃপর আমরা নামের অর্থবাদ কল্পনা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, আমরা সাধারণতঃ যে নাম-কীর্তনাদি করিয়া থাকি, তাহা বাস্তবিকই ভ্রমপ্রমাদাদি শূন্য, ত্রিকালদর্শী, শাস্ত্রকারগণ বর্ণিত ভবরোগ মহৌষধ, সেই নামমৃতই কিনা ? শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয়ে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।

(বিদগ্ধমাধবে (১-১২) দেবী পৌর্ণমাসীর উক্তি)

অর্থাৎ "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় যে কি পরিমিত অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা অবগত নহি। এই অমৃতময় বাণী যখন জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন রসনা-শ্রেণী প্রাপ্তির অভিলাষ হয়। শ্রবণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে, অর্বুদ কর্ণ লাভের স্পৃহা জন্মে এবং

মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপারই এতৎ সকাশে পরাভূত হইয়া যায়।

ইহাকেই কৃষ্ণনামের সাক্ষাৎ লক্ষণরূপে যদি আমরা ধরিয়া লই, তাহা হইলে কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, উক্ত লক্ষণযুক্ত নামামৃতের সহিত, আমরা সচরাচর যে নাম কীর্তন করি, তাহা মিলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাই, লক্ষণে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে কৃষ্ণনাম জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতে থাকিলে রসনাশ্রেণী প্রাপ্তির অভিলাষ হওয়া উচিৎ, সেই নাম কীর্তনকালে রসনাশ্রেণী লাভের স্পৃহা তো দূরের কথা আমরা সাধারণতঃ উহা হইতে অবসর পাইলেই সুস্থ বোধ করি। যে কৃষ্ণনাম একবার মাত্র শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিলে অর্বুদ কর্ণ লাভের বাসনা হওয়া উচিৎ, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় যে, যখন কোথাও কীর্তন শুনিতে পাই, তখন অর্বুদ কর্ণ লাভস্পৃহা ত দূরের কথা, আমরা সাধারণতঃ হস্ত দ্বারা শ্রবণ বিবরদ্বয় আচ্ছাদন করিয়াই থাকি। যে কৃষ্ণনাম একবার মাত্র চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার এতৎসকাশে পরাভূত হইয়া যাওয়াই উচিৎ ; কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, কোনও প্রকারে সেই নাম চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবেশলাভ করিলেও আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপারে স্তব্ধতা-প্রাপ্তি ত দূরের কথা, আমরা সাধারণতঃ ক্ষণকাল পরে দ্বিগুণ উৎসাহে বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইয়াই থাকি। অধিক কি যে, কৃষ্ণনাম কি পরিমাণ অমৃতদ্বারা নির্মিত—তাহা লৌকিক ভাষায় বর্ণনা করিতে না পারিয়া, প্রেমিকভক্ত-চূড়ামণি, পরামৃতের অধিকারী, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদ আক্ষেপ করিয়াছেন,—সেই কৃষ্ণনাম যখন আমরা আস্বাদন করিয়া দেখি, সত্যকথা বলিতে হইলে বলিব, অমৃত ত দূরের কথা—শর্করার মিষ্টতাও তাহার তুলনায় বহুগুণ অধিক করিয়াই আমরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকি।

ইহা বাস্তবিকই আমাদের দুর্দৈব ! ইহা বাস্তবিকই ঘোর পরিতাপের বিষয় ! পরস্পর লক্ষণের এতাদৃশ অনৈক্য যেখানে, সেখানে কি করিয়া স্বীকার করিতে পারি, শাস্ত্রবর্ণিত সেই ভবরোগ মহৌষধ কৃষ্ণনাম, সেই প্রেমিক কবি শ্রীরূপ আস্বাদিত, অমৃত বিনিন্দিত কৃষ্ণনাম, আর আমরা সচরাচর যে নাম লইয়া থাকি, তাহা একই বস্তু। যদি এক বস্তুই না হয়, তবে এ নামের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণের সম্ভাবনা কোথায় ?

নাম একই বস্তু। তাঁহার বিকার নাই, তারতম্য নাই,—নিতান্ত অব্যক্ত, অচিন্ত্য পরমানন্দস্বরূপ। বিকার নামের নহে, বিকার আধারের—আমাদের চিত্ত বিকৃত, রসনা বিকৃত, শ্রবণ বিকৃত, তাই নাম মিলাইয়া দেখিতে যাই, তাই মিলাইতে গিয়া লক্ষণের ভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। একই সূর্যরশ্মি বিভিন্ন বর্ণযুক্ত স্ফটিকাধারে প্রতিফলিত হইলে, যেমন আধারের অনুরূপ বর্ণের উপলব্ধি এবং স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ বর্ণহীন স্ফটিকাধারে

পতিত হইলে, যেমন কোন প্রকার বিকৃত না হইয়াই যথার্থ স্বরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সম্পূর্ণ বিকারশূন্য হইলেও আধারের তারতম্য যেমন সূর্যরশ্মির এই প্রকার ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইবার একমাত্র কারণ, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণনাম সম্পূর্ণ নির্বিকার হইলেও, নিরপরাধ ও অপরাধযুক্ত আধারভেদে দ্বিবিধ প্রকারে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং বিশুদ্ধ, নির্মল, মায়া-বিনির্মুক্ত, প্রেমিক ভক্ত শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ যে ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন ; মায়াধীন, নামাপরাধী, সংসারাসক্ত জীব তাহা যে সেভাবে প্রত্যক্ষ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, ইহা অতিশয় স্বাভাবিক ঘটনা।

পিত্তগ্রস্থ ব্যক্তি যেমন মিছরি খণ্ড মুখে ধারণ করিয়া, উহার মিষ্টতা সত্ত্বেও তিক্ত বলিয়াই অনুভব করে, ইহা যেমন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ; সেইরূপ অনাদিকাল হইতে মহা-অপরাধ-পিত্তগ্রস্থ আমরা, অমৃত বিনিন্দিত নামসুধা আস্বাদ করিয়াও তাহার মিষ্টতার পরিবর্তে তিক্ততাই অনুভব করিয়া থাকি। ইহা মিছরির দোষ নহে। মিছরিকে যাহারা মিষ্ট বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহাদেরও দোষ নহে। ইহা আমাদিগের পিত্তগ্রস্থ জিহ্বারই সম্পূর্ণ অপরাধ।

মিছরিই পিত্তনাশের মহৌষধ বলিয়া বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং পিত্তগ্রস্থ ব্যক্তি নিজ দুর্দ্দৈববশতঃ যদি সেই সুমিষ্ট মিছরি অশ্রদ্ধায় ফেলিয়া না দিয়া, তিক্ত রস অনুভব সত্ত্বেও উহা আস্বাসন করিতে বিরত না হয়, তবে সেই মিছরিরূপ মহৌষধই যেমন তাহার পিত্তনাশ করিয়া, যথা সময়ে নিজ মিষ্টতা অনুভব করাইয়া থাকে ; সেইরূপ নামামৃত আপাততঃ আস্বাদনে আমাদিগের জিহ্বায় তিক্ত বলিয়া অনুভূত হইলেও, যদি আমরা নির্বোধের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ও বৈদ্যের অতিরঞ্জিত বর্ণনা ভাবিয়া, তাহার অর্থবাদ কল্পনা না করিয়া, ইহাই আমাদিগের ভবব্যাধি নিবারণোপায় স্মরণ-পূর্বক অবিরত সেবন করিতে থাকি, তবে রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিশ্চয় অনুভব করিব,—

"নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।" (বিদগ্ধমাধব—১.১২)

নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে যাঁহারা অতিস্তুতি বা ইহাতে অর্থবাদ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে নিশ্চয়ই সদ্বিবেচক নহেন, ইহা প্রমাণ সিদ্ধ। আমরা বহু জন্মাবধি লৌকিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া, তদ্বিষয়ে এতই অধিক অভ্যস্ত হইয়াছি যে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া, অপ্রাকৃত—অচিন্ত্য বস্তু নির্ণয়েও সেই নিয়মই প্রয়োগ করিতে যাই এবং তাহার পরিণামে মহা অপরাধের সঞ্চয় করিয়া থাকি। যাহার যাদৃশ গুণ, তদপেক্ষা অধিক করিয়া বর্ণনা করার নাম অতিস্তুতি। আমাদের বিবেচনা করা কর্তব্য যে, ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন, প্রাকৃতধর্মী মানবগণকে, অধিক কি দেবতাদিগকেও প্রাকৃত ভাব ও ভাষার সাহায্যে সহজেই অতিস্তুতি করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু যিনি অনন্ত,—যাঁহার শক্তি

অচিন্ত্য অনির্বচনীয় অবাঙ্মনসগোচর , যাঁহার অসীম গুণাবলীর কণামাত্র লইয়া সমুদয় বিশ্বের সমস্ত গুণ-সম্পদের উদ্ভব, সেই শ্রীভগবান্ ও তদীয় নামের মহিমা বা গুণাবলী সম্বন্ধে অতিস্তুতি করিবার সামর্থ্য লৌকিক ভাষা ও ভাবের পক্ষে কোন প্রকারেও কি সম্ভব হয় ? যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৬.১৪)

সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি যাঁহাকে প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অধিকন্তু যাঁহার দীপ্তিতেই ইহারা প্রদীপ্ত হইতেছে, যাঁহার শক্তিতে সমুদয় জগৎ শক্তিমান্ হইয়াছে, সেই স্বয়ং প্রকাশ, সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে, পরিচ্ছিন্ন ভাব ও ভাষার সংযোগে তাঁহার অসীম গুণরাশির সীমা অতিক্রম পূর্বক অতিস্তুতি করা কখনও কি কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে ? সুতরাং বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রকারগণ নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতিস্তুতি নহে, স্তুতিও নহে—সে অসীম মহিমার কণামাত্র তাঁহারা বলিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা, তাহাই সন্দেহ। নামের যে সকল অচিন্ত্য শক্তির বিষয় শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তও জগতে বিরল নহে। মহাপাতকী অজামিল পুত্রনামচ্ছলেও একবার মাত্র অন্তিমকালে "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিয়া সেই ভগবন্নাম-মহিমা-বলে অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোকে প্রয়াণ করিয়াছিল। অখিল পাপ ধ্বংস করিতে একটি নামেরও প্রয়োজন হয় নাই, নামাভাসেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

যখন ব্রহ্মশাপানলে নিধনাশঙ্কায় ব্যাকুলা পাঞ্চালী 'হা কৃষ্ণ', 'হা মথুরানাথ' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, ভগবন্নামের অসীম মহিমাবলে বহু দূরস্থিত শ্রীভগবান্ আকৃষ্ট হইয়া কয়েক মুহুর্ত্তের মধ্যেই দ্রৌপদীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণনাম গ্রহণের পর দ্রৌপদীর সম্মুখে আবির্ভূত হইতে কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্বের জন্য শ্রীভগবান্ অপরাধীর ন্যায় বলিয়াছেন,—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্‌গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্।।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৪৭.৩৮)

অর্থাৎ দ্রৌপদী বিপদে পড়িয়া দূরদেশস্থিত আমাকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ আমার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা কোনক্রমেই হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। শ্রীভগবন্নামের ভগবদ্বশীকারিত্বের দৃষ্টান্ত ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে ?

যখন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, বৃক্ষ-প্রস্তরাদি সংগ্রহপূর্বক বিপুল আয়োজনে সমুদ্রবন্ধনে নিযুক্ত, সেই সময়েই হনুমান্ রামনাম-মাত্র সার করিয়া সেই অপার সমুদ্র অনায়াসে পার হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ অপেক্ষা তদীয় নামের প্রাধান্য বিষয়ে ইহাই উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

শ্রীভগবানের নাম সর্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও কি অপরাধে আমরা তাঁহার শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, সুধাবিনিন্দিত পরমামৃত হইতেও অধিক মিষ্ট নামামৃত আস্বাদন করিতে গিয়া কি কারণে আমাদিগের জিহ্বা উহাকে তিক্ত বলিয়াই অনুভব করিতেছে, অতঃপর তাহারই কারণ নির্ণয় করা আমাদিগের কর্তব্য।

সংসারে যত প্রকার অপরাধের অনুষ্ঠান হইতে পারে বা যতপ্রকার অপরাধ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) নামাপরাধ ও (২) নামাপরাধ ব্যতীত অন্য অপরাধসমূহ বা তাহাকে এক কথায় লৌকিক অপরাধ বলিয়াও আমরা উল্লেখ করিতে পারি। এখন যদি আমরা প্রথমতঃ নামাপরাধ কি, তাহা স্থির করিয়া লই, তবে তৎসহ লৌকিক অপরাধেরও নির্ণয় হইয়া যাইবে। শাস্ত্র, দশটি নামাপরাধ উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

(১) সাধুনিন্দা (মহদপরাধ)।
(২) শ্রীহরিনাম হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্যরূপে মনন।
(৩) শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ।
(৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা।
(৫) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে 'ইহা অর্থবাদ' অর্থাৎ 'অতিস্তুতিমাত্রই' এইরূপ মনন।
(৬) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি।
(৭) প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন।
(৮) অন্য শুভক্রিয়া কর্মাদির সহিত নামের তুল্যত্ব বা সমতা চিন্তন।
(৯) শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ।
(১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অপ্রীতি।

এই দশবিধ অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য যতকিছু অপরাধ কল্পনা করা যাইতে পারে, সে সমুদয়ই লৌকিক অপরাধ শ্রেণীভুক্ত। কেবলমাত্র নামাপরাধকে স্পর্শ না করিয়া কোন ব্যক্তি যদি লৌকিক সমুদয় অপরাধেরও অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও সে একবার মাত্র কৃষ্ণনামে বা নামাভাসেও সমুদয় পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে।।

এই মহাজন বাক্যে যে 'পাপ' শব্দ উক্ত হইয়াছে, সেই পাপ অর্থে বুঝিতে হইবে,

নামাপরাধবর্জিত অন্য সমুদয় পাপরাশি। এই বিষয়ে "অজামিল উদ্ধার' যথার্থ প্রমাণ।

বিবিধ প্রকার অহিত আহার বিহারাদি দ্বারা ভীষণ পীড়াগ্রস্থ হইলে, কোনও অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন মহৌষধ সেবনে যেমন সেই ব্যাধি নিঃশেষিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু ঔষধ সেবনকালে নিয়মাদি লঙ্ঘনপূর্বক সেই ঔষধের শক্তিকে বিকৃত করিয়া দিলে, যেমন সে ঔষধ দ্বারা তাদৃশ ফললাভের আর সম্ভাবনা থাকে না। সেইরূপ কৃষ্ণনাম মহৌষধি সেবনে নিখিল অপরাধোত্থিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যায় সত্য, কিন্তু যে ঔষধ সেবনে জীবন লাভ করিব, সেই ভবরোগ-মহৌষধি নামের নিকট অপরাধী হইলে, এই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার আর কী উপায় অবশিষ্ট থাকিবে ?

পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমার নারদকে বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি সর্ববিধ অপরাধ বা পাপাচার করিয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, আবার যে মহাপাপী শ্রীহরির প্রতিও অপরাধী, যদি সে কখন নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে, সেই নাম প্রভাবে ভগবদপরাধ হইতেও উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং নাম সকলের বন্ধু। অতএব সেই নামের নিকট অপরাধী হইলে, নিশ্চয়ই যে নিরয়গামী হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিশংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ।।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.২৮২)

হয়তো অনেকেই মনে করিতে পারেন,—এরূপ মত জনসমাজে প্রচারিত হইলে, নামাপরাধ ব্যতীত অন্যান্য সর্ববিধ পাপস্রোত জগতে খরধারে প্রবাহিত হইতে পারে, কারণ, একটিবার মাত্র ভগবন্নাম কীর্তনে যখন নিখিল পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়, তখন পাপকার্যে প্রবৃত্ত হইবার আর অন্তরায় কি ? কিন্তু ইহাও অবশ্যই বিবেচ্য, —যেমন সলিলস্পর্শ ব্যতীত স্নানক্রিয়া নির্বাহ হইতে পারে না, সেইরূপ 'নামাপরাধ স্পর্শ না করিয়া, কেহ পুনরায় অপর লৌকিকাপরাধের অনুষ্ঠান করিতেই সক্ষম নহে। যদি কেহ নামাপরাধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া অন্য কোনও একটি লৌকিক অপরাধের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়,—অনুষ্ঠান দূরের কথা, তাহার সঙ্কল্পমাত্রেই সে ব্যক্তিকে নামাপরাধে অপরাধী হইতে হইবে,—যেহেতু "নামবলে পাপে প্রবৃত্তি" ইহাও একটি মহান্ নামাপরাধরূপে গণনীয়। অতীত অপরাধসমূহের জন্য পরিতাপানলে দগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি চিরশান্তি লাভের নিমিত্ত একবার মাত্র কায়মনোবাক্যে নামের শরণাপন্ন হইয়াছেন,

ভবিষ্যতে তাঁহার পক্ষে আর কোনও পাপানুষ্ঠান করিবার যো নাই। অনির্বচনীয় কোন ভাগ্যোদয়ে সেই মহাজন, সেই শুভ মুহূর্ত হইতে এই মরজগতের বস্তু হইয়াও মুক্ত ! সেই পুণ্য-মুহূর্ত হইতেই তিনি ভগবদ্ভক্ত শ্রেণীরূপে গণ্য। আশ্রিতবৎসল শ্রীহরি সেই দিন হইতেই নিজ ভক্ত-জ্ঞানে সেই মহাজনের উদ্ধারের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং অনিত্য সংসার-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত লৌকিক কোন প্রকার পাপের অনুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে আর কখনও কি সম্ভব হইতে পারে ? পরমামৃত লালসে উদ্‌ভ্রান্ত যে জন, সে কি কখন আর নিম্বফলাস্বাদনে প্রবৃত্ত হয় ? মলয়ানিলসেবীর কি কখনও তালবৃন্ত ব্যজনে আসক্তি দেখা যায় ? সুতরাং পূর্বপক্ষের এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

অতঃপর আমাদিগের বক্তব্য এই যে, একটিবার মাত্র কৃষ্ণনাম স্মরণেও আমাদিগের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারিত,—যদি আমরা নামের নিকট অপরাধী না হইতাম। যখন সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবন্নামের অনির্বচনীয় শক্তি, নিজ দুর্দৈববশতঃ অনুভব করিতে পারিতেছি না, তখন নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে হইবে, আমরা যে কোন প্রকারেই হউক নামাপরাধী। অতীতের অনন্ত লৌকিকাপরাধরূপ মহারোগ একটিবার মাত্র অব্যর্থ কৃষ্ণনাম মহৌষধি সেবনেই সমূলে ধ্বংস হইতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের,—আমরা অহিত সেবনাদির দ্বারা কেবল যে এই মহারোগের সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা নহে, আমরা আবার সেই ব্যাধি আরোগ্যের একমাত্র মহৌষধি, যাহা স্ব ইচ্ছায় অনুপানাদি ব্যতিক্রম দ্বারা তাহাকেও বিকৃত করিয়াছি। ভীষণ সংসার পাথারে যিনি একমাত্র পরম বন্ধু, যিনি একমাত্র পারের উপায়, যদি আমরা অকৃতজ্ঞের ন্যায় তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হই, তবে এই ভবসমুদ্র পারের উপায়ান্তর আর কিই বা অবশিষ্ট থাকিবে ? সুতরাং অনন্ত মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়া যে আমাদিগের জন্ম জন্ম ধরিয়া অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, সে বিষয়ে আর সংশয় কি আছে ?

নামারাধরূপ দারুণ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়,—নামেরই শরণাপন্ন হইয়া অবিশ্রান্তভাবে নাম-কীর্তন। একবারের স্থলে অবিরাম নামকীর্তনের ব্যবস্থা,—ইহাই একমাত্র কারণ, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।। (পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড—৪৮ অঃ)

অর্থাৎ যাহারা নামাপরাধে অপরাধী, নাম সকলই তাহাদের পাপ হরণে সমর্থ। বাস্তবিক অবিচ্ছিন্নভাবে নামকীর্তন করিলে, যে সকল নাম দ্বারা নামাপরাধ ক্ষয় হয়, অপরাধ ক্ষয়ান্তে সেই সকল নামই প্রেমলাভরূপ প্রয়োজন সাধকও হইয়া থাকেন।

সুতরাং এখন আমাদের তর্কবিতর্কে বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া নামাপরাধ

বর্জনপূর্বক অবিশ্রান্তভাবে নামকীর্ত্তন করাই একান্ত কর্তব্য ; ইহা ব্যতীত আমাদিগের অপর উদ্দেশ্য নাই,—অপর করণীয় নাই—কেবল নামযজ্ঞের অনুষ্ঠানই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শয়নে, স্বপনে, গৃহে, বাহিরে, স্বদেশে, বিদেশে, নগরে কিম্বা গ্রামেতে, পর্বতে, প্রান্তরে, মরু বা সাগর মাঝে অথবা গহণ কানন মধ্যে—যখন যেখানে যে ভাবেই থাকি না কেন, নামযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেন আমরা বিরত না হই। আমাদের প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত কৃষ্ণনামের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ।।

অর্থাৎ জীবের পক্ষে তাহাই হানি, তাহাই মায়াপ্রবেশের মহৎ ছিদ্র, তাহাই মোহ ও বিভ্রম, যে মুহূর্ত বা ক্ষণ মাত্রও বাসুদেবের নাম পরিকীর্তিত না হন।

সংসার-মায়ায় মুগ্ধ আমরা—সাংসারিক সমুদয় কার্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক নিরন্তর নামকীর্তনে কখনও সক্ষম নহি। অভ্যাস ব্যতীত কখনও কোন কার্য সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। এইজন্য কৃষ্ণনাম গানে অনভ্যস্ত আমরা—আমাদিগের নিরন্তর কৃষ্ণনামে অভ্যস্ত করিবার জন্য, সংসারকে গৌণভাবে রাখিয়াও মুখ্যভাবে নামযজ্ঞের সাধনা শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্র আমাদিগকে ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্।।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিপত্তৌ মধুসূদনম্।।
মায়াসু বামনং দেবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং। —ইত্যাদি

(হরিভক্তিবিলাস ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—১১.১৩৭)

ইহার ভাবার্থ এই যে, কর্মত্যাগের যতক্ষণ অধিকারী না হইতেছ ততক্ষণ কর্মের অনুষ্ঠান কর। কিন্তু মনে রাখিও, কর্ম গৌণ, আর প্রতি কর্মের মধ্যকেন্দ্রে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া যাও—তাহাই তোমার মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ; তাহাই তোমার অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণনাম স্মরণ করিবার প্রথম সাধনা। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেইজন্য নামকীর্তনকারী সাধকগণের মধ্যে তারতম্য শিক্ষা দিবার জন্য বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার।।

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে।।
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।।

(চৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫, ১৬.১০৭-১০৯)

তাই বলিতেছি এই কলিযুগে অবিরাম নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য জপ, তপ, সাধনা যে কি হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। শ্রীভগবদাবেশ অবতার, জ্ঞান ও প্রেমের বিশাল জলধি, ভগবান্ নারদও তাই কৃষ্ণ আরাধনা ব্যতীত অন্য তপস্যা হইতে পারে, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।। (নারদ পঞ্চরাত্র—১.৬)

অর্থাৎ যদি শ্রীহরিই আরাধিত হইলেন তবে আর অন্য তপস্যার প্রয়োজন কি ? আর যদি হরিই আরাধিত না হইলেন, তবে সে তপস্যারই বা প্রয়োজন কি ? যদি অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরি বিহার করেন, তবেই বা আর তপস্যার প্রয়োজন কি ? আর যদি শ্রীহরি অন্তরে বাহিরেই বিহার না করিলেন, তবেই বা সে তপস্যার কি প্রয়োজন ?

শ্রীহরি ও তদীয় নামের শরণ ব্যতীত আর কোন উপায়েই যে জন্মমৃত্যুরূপ ভীষণ আবর্তের কবল হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই, তদ্বিষয়ে পূজনীয় শ্রীধর স্বামিপাদ একটি শ্লোক দ্বারা সকল নিগমবল্লীর সারমর্ম ব্যক্ত করিয়াছেন,—

তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈঃ
হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি।।

অর্থাৎ তপস্যা তাপেই তপ্ত হও, পর্বত হইতেই পতিত হও, তীর্থাদিই পর্যটন কর, আগমাদিই পাঠ কর, কিম্বা যাগ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, অথবা তর্কাশ্রয়েই বিবাদ কর, শ্রীহরির শরণ লাভ ব্যতীত মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ান্তর নাই।

তাই পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ শাস্ত্র মুখে ভীষণ সংসার-সাগরে নিমজ্জিত প্রায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য যেন অহর্নিশ বলিতেছেন,—ধর ! ধর ! সংসার সাগর বক্ষে অসংখ্য নামের ভেলা—'মা ভৈঃ' নিশান তুলিয়া, জীব উদ্ধারে নিযুক্ত। ধর ! ধর ! বুক দিয়া ধর ! মৃত্যুর মহাসমুদ্রে বিলীন হইবার পূর্বে প্রাণপণে নামের ভেলা আশ্রয়

কর। জীব ! তোমার ভয় কি ? যত বাঞ্ছা, তত নাম যেখানে। তখন বিষাদিত হইবার কারণ নাই। তখন কেহই বঞ্চিত হইবে না। বিপদে পতিত তুমি—'বিপদভঞ্জন' নাম তোমার জন্য। কাঙ্গাল তুমি—'কাঙ্গালের সখা' নাম তোমার জন্য। তুমি লজ্জায় পতিত, ঐ দেখ 'লজ্জা নিবারণ' নামের ভেলা তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। ধর ! ধর ! নামের ভেলা বুক দিয়া ধর ! অধমের জন্য 'অধমতারণ', পতিতের জন্য 'পতিতপাবন', নিরাশ্রয়ের জন্য 'আশ্রিতবৎসল'—অহো ! যত বাঞ্ছা, তত নাম। ইহাতেই যদি তুমি বঞ্চিত হও—দুর্ভাগ্য তোমার বুঝিতে হইবে, তুমি স্বখাত সলিলে স্ব-ইচ্ছায় ডুবিয়া মরিলে ! তাই বলি ধর ! ধর ! বুক দিয়া নামের ভেলা আশ্রয় কর। একমাত্র কৃষ্ণনামই সংসার-সাগরের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

যিনি ভক্তরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে পরমমঙ্গলময়, মধুরাদপি মধুর শ্রীকৃষ্ণনামামৃত মরজগতে প্রদান করিয়াছেন, যিনি ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দরূপে পাতকীর আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হইয়াও তাহাদিগকে বক্ষে আলিঙ্গনপূর্বক নাম মহারত্ন বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতরূপে ব্রহ্মাদির-দুর্লভ এই নাম-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হাতে ধরিয়া বদ্ধ-জীবকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন, যিনি ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদিরূপে সর্বাভীষ্টপ্রদ, সর্বশক্তিসম্পন্ন, শমনভয়হারী, কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ স্বয়ং আচরণ করিয়া কলিহতপ্রায় অজ্ঞ জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যিনি ভক্তশক্তি শ্রীগদাধরাদিরূপে কৃষ্ণনামের ফলস্বরূপ প্রেমামৃতের সংবাদ জগতে বিদিত করাইয়া, সংসারাশক্ত জীবকেও আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, সেই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীরাধামাধবকে নমস্কার করিয়া বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারের পূর্বে পুনরায় নামের অচিন্ত্যশক্তির কথা স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত আদিপুরাণোদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদোক্ত শ্লোকটি মাত্র উচ্চারণ করিতেছি,—

ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতম্।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্।।
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশং শমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ।।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.৪৬৫)



প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক' পত্রিকায় নাম-মাহাত্ম্য নামে প্রভুপাদের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহাই বর্তমান গ্রন্থের 'অবতরণিকা' রূপে সংযোজিত হইল।—সম্পাদক।

শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি

তৃতীয় কিরণ

[পূর্বার্দ্ধ]

শ্রীনাম ও প্রেমধর্ম্মের দিক্-নির্ণয়

অর্থাৎ

শ্রীনাম-মাহাত্ম্যের উপক্রমণিকা

বা

উপোদ্ঘাত প্রকরণ

শ্রীভগবন্নাম-মহিমা কথনের পথে প্রধান অন্তরায় ও তাহার অপসারণ।

পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তগণের অহৈতুকী ও অচিন্ত্য কৃপামাত্র ভরসা করিয়া, অনন্তর আমাদিগকে শ্রীভগবন্নামের শক্তি বা শ্রীনামমাহাত্ম্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তৎপূর্বে সেই শ্রীনাম-মহিমাদি কথনের পথে আবর্জনা স্বরূপ যে সকল অন্তরায় বা অনর্থকারিতার সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রথমেই তৎসমুদয় অপসারণ করিতে হইবে। তদুদ্দেশে শ্রীনাম-মাহাত্ম্যের উপক্রমণিকা স্বরূপ, জীবের পরম সাধন ও সাধ্য যাহা, সেই বেদগোপ্য শ্রীনাম ও তৎফল প্রেমধর্মের কথঞ্চিৎ দিক্‌নির্ণয় আবশ্যক, —যাহা বর্তমান গ্রন্থের (পূর্বার্দ্ধের) আলোচ্য বিষয় হইতেছে। অতঃপর আমরা উক্ত ক্রমরীতিতেই আমাদের উদ্দেশ্যপথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিব।

কোন বস্তু প্রকৃষ্টরূপে জানিতে হইলে, তাহার 'স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ'—এই দুই লক্ষণে জানা আবশ্যক, নচেৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায় না। সাক্ষাৎ বস্তুর আকার প্রকারাদি লক্ষণ যাহা, তাহাই হইতেছে উহার 'স্বরূপ-লক্ষণ', আর বস্তুর শক্তি বা শক্তিকার্য হইতে তদ্বিষয়ে যে জ্ঞান হয়,—তাহাই হইতেছে উহার তটস্থ লক্ষণ।[১]

বস্তুর স্বরূপ বা তত্ত্ব নির্ণয়ই স্বরূপ-লক্ষণের বিষয় এবং বস্তুর শক্তি বা মাহাত্ম্য-নির্ণয়ই উহার তটস্থলক্ষণ। এইজন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যেমন যথাক্রমে তদীয় স্বরূপ ও শক্তির বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বিদিত হওয়া আবশ্যক। যথা,—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান।। (চৈতন্যচরিতামৃত—১.২.৭৯)

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণনামের—ভগবান্ হইতে ভগবন্নামের অভিন্নতাবশতঃ শ্রীভগবন্নামের সম্বন্ধেও প্রকৃষ্ট জ্ঞানার্জন করিবার পক্ষে, প্রথমে স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীনামের স্বরূপ বা নামতত্ত্ব এবং পরে তটস্থ-লক্ষণে শ্রীনামের শক্তি বা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হওয়া প্রয়োজন।

উক্ত অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থের প্রথম কিরণে "শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ বা শ্রীনামতত্ত্ব" বর্ণনায়, ভগবান্ হইতে ভগবন্নামের সম্পূর্ণ অভিন্নতা অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ই যে, ভগবন্নামের স্বরূপ—ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতঃপর বর্তমান গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধে "শ্রীভগবন্নামের

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২০.২৯৫-২৯৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শক্তি বা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য" বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, ভগবান্ ও ভগবন্নাম যখন অভিন্ন বস্তু বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তখন ভগবন্নামের মহিমার কথা সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইহাই বলা চলে যে,—ভগবানের যে মহিমা, যে প্রভাব, যে শক্তি,—তাঁহার নামের মহিমাদিও ঠিক তাহাই জানিতে হইবে ; অতএব ভগবানের মহিমা জানা থাকিলে আর পৃথকভাবে তাঁহার নামের মহিমা সম্বন্ধে জানিবার আবশ্যকতা থাকে না। যাহা নামীর মহিমা, তাহাই নামের মহিমা, যাহা নামের মহিমা তাহাই নামীর মহিমা,—এক কথায় ইহা বলিলেই যখন শ্রীনামের মহিমা বলা হইয়া যায়, তখন সেই নাম-মাহাত্ম্য বা নামের শক্তি সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার আবশ্যকতা কি থাকিতে পারে ?—প্রথমে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে।

শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নাম ও নামীর অভিন্নতা বিষয়ে উক্ত প্রকার নির্ভুল অভিজ্ঞতা অতি ভাগ্যবলে যাঁহারা অর্জন করিয়াছেন, সে দিক দিয়া তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা না থাকিলেও, অপর দিকে শ্রীভগবন্নামের অচিন্ত্য, অনন্ত ও অব্যর্থ শক্তি বা মহিমা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, অনেক স্থলেই বাহ্যদৃষ্টিতে যথাযথভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগের পক্ষেও যখন অনেক সময়ে 'নাম-মাহাত্ম্য' বিষয়ে সংশয়াকুল হইবার সম্ভাবনা ঘটে, তখন শ্রীভগবন্নামের স্বরূপাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে যে, সে'রূপ ক্ষেত্রে নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অধিকতর সংশয়াপন্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব আপাতদৃষ্টিতে সাধু-শাস্ত্রোক্ত শ্রীনাম-মাহাত্ম্যের যথার্থতা হয়ত' যথাযথভাবে সকলক্ষেত্রে উপলব্ধির বিষয় না হইতেও পারে, তথাপি শ্রীনামের মহিমা 'অচিন্ত্য' লক্ষণ বলিয়া, উহা যে অক্ষরে অক্ষরে সুসত্য এবং অব্যর্থ, এ'কথা বিশ্বাস করিয়া লইতে পারাই সর্বাধিক সহজ, সরল ও শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং সমধিক সৌভাগ্যের পরিচায়ক। কিন্তু উহার অভাবস্থলে, তদ্বিষয়ে জনসাধারণের অন্তর্নিহিত সেই অমূলক সংশয়-সকল ছেদনপূর্বক, শ্রীনামের সর্বজন সেব্য, সুগম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পথ, যথাসম্ভব বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া, সকলের পক্ষে উহা চির উন্মুক্ত রাখিতে হইলে, শাস্ত্রবর্ণিত শ্রীনাম-মহিমার যথাযথভাবে আলোচনা করা ভিন্ন অপর কোন উপায় দেখা যায় না।

আরও কথা হইতেছে এই যে, আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্রাদি বর্ণিত শ্রীনামের মহিমা বা শক্তির যথার্থতা অনেকস্থলেই উপলব্ধি করিতে না পারায়, নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জনসাধারণের চিত্তে যে সংশয় সমুৎপন্ন হয়, উহাও তৎকালে সে'রূপ অনর্থকর হয় না,—যাহাতে শ্রীনামের অচিন্ত্য ও অমোঘ শক্তি প্রকাশের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত দুর্দৈববশতঃ সেই অমুলক সংশয় হইতে উহার

বিষময় ফল প্রসূত হইয়া, সাধু-শাস্ত্র-বর্ণিত ভগবন্নামের ভগবানের মতই সীমাহীন মুক্ত মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া সংশয়াপন্ন ব্যক্তির চিত্তে যখন উহাকে (১) অযথা স্তুতিমাত্র বলিয়া বোধ কিম্বা (২) তদ্রূপ বোধের ফলে নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উল্লাসের পরিবর্তে অন্তরে অপ্রীতির উদ্রেক হয়, অথবা সামর্থ্য থাকিলে, (৩) স্বকল্পিত কুব্যাখ্যা বা কষ্ট কল্পনাদি দ্বারা শ্রীনামের সেই সীমাহীন মুক্ত মহিমাকে আচ্ছন্ন করিয়া অর্থাৎ উহার খর্বতা বা সঙ্কোচ সাধনপূর্বক জনসমাজকে বিভ্রান্ত করিবার অপচেষ্টা করা হয়, তখন ভগবন্নামের অপ্রসন্নতা অর্থাৎ 'নামাপরাধ' ঘটিয়া, তাহা হইতে শ্রীনামের অবাধ সাধন পথে প্রবল অনর্থ বা অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবন্নামের সহজ ও সুগম সাধন-পথে একমাত্র 'নামাপরাধ' অর্থাৎ শ্রীনামের অপ্রসন্নতা উৎপাদন ভিন্ন আর কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, যাহাতে নামের অব্যর্থ শক্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া 'নামাপরাধ' বিষয়ে প্রথম হইতেই সকলের সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।[১]

শ্রীভগবন্নামের অবাধ সাধন-পথে নামাপরাধরূপ অনর্থের সৃষ্টি হইলে, কেবল তদ্দ্বারাই অপরাধকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে নামের মঙ্গলময় সাধনপথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং ভগবান্ হইতে অভিন্ন ও সহজলভ্য ভগবন্নামকে আশ্রয় করিতে যাইয়া এইরূপে নিজ আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধাচরণে বা প্রতিকূলতায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অপ্রসন্নতা সৃজন করিলে, উহা যে অশেষ অমঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে, একথা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য মধ্যে উচ্চতরুশাখায় আরোহণপূর্বক যে ব্যক্তি নির্ভয় হইয়াছে, সে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ নিজ হস্তে সেই বৃক্ষ-শাখার মূলদেশ ছেদন করে, কিম্বা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মহানদীতে নিমজ্জমান ব্যক্তি দৈববশতঃ সহসা কোন নৌকা প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে আশ্রয় লাভ করিয়া সে যদি সহস্তে তাহার তলদেশ ভগ্ন করে,—তাহা হইলে যে'রূপ গুরুতর অকল্যাণ সাধিত হয়, সেইরূপ ঘোর সংসার-অরণ্যে অথবা ভীষণ ভবসমুদ্রে বিপন্ন ব্যক্তি, শ্রীভগবন্নামরূপ পরমাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রকারে নামের অপ্রসন্নতা বা 'নামাপরাধ' ঘটাইলে তদ্দ্বারা নিজের সেইরূপই অনিষ্ট সাধন করা হয়।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, উপস্থিত যখন আমরা শ্রীনামের শক্তি বা মহিমা বিষয়েই নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পূর্বোক্তক্রমে নাম-মাহাত্ম্যের আলোচনা-পথে অগ্রসর হইতে যাইতেছি, তখন সেক্ষেত্রে প্রথমেই 'নামাপরাধ'প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার কি আবশ্যকতা থাকিতে পারে ?

১। এই নামাপরাধ বিষয়ে গ্রন্থকার কৃত 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি'—দ্বিতীয় কিরণ বা 'নামাপরাধ দর্পণ' গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীনামের সাধনকালে যেমন 'নামাপরাধ'-সকল হইতে সাবধানতা আবশ্যক, সেইরূপ শ্রীনাম-মহিমা শ্রবণ (কিম্বা গ্রন্থ পঠন) কালেও এমন কতিপয় নামাপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, যে বিষয়ে প্রথমেই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এইজন্য নাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রমেই সম্ভাবিত সেই অপরাধ কয়েকটি সংঘটিত হইয়া, যাহাতে নাম-মহিমা কথনের পক্ষেও কাহারও পক্ষে কোন অপরাধরূপ অনর্থ স্পর্শ না করে, তদ্বিষয়ে প্রথমেই সাবধানতা অবলম্বনের আবশ্যকতায় এস্থলে প্রধানতঃ কেবল সেই সম্ভাব্য অপরাধ কয়েকটির কথাই উল্লেখ করা হইবে ; যাহার বিস্তারিত আলোচনা এই শ্রীশ্রী নামচিন্তামণি গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরণে যাহা নামাপরাধ দর্পণরূপে পরিচিত, তাহাতেই করা হইয়াছে। গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে উহাদের পুনরুল্লেখে বিরত হইলাম। উহার আনুষঙ্গিকরূপে অপর নামাপরাধ-সকলের অভিপ্রায় সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করিবার প্রয়োজন থাকিলেও,—সমগ্রভাবে নামাপরাধের বিষয় দ্বিতীয় কিরণেই ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

নাম-মহিমা কথনের পথে পাঠক বা শ্রোতৃবর্গের পক্ষে উক্ত সম্ভাব্য অপরাধ কয়েকটির মধ্যে প্রথম ও প্রধান অপরাধ হইতেছে,—নামে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ স্তুতিমাত্র মনন। যাহার আনুষঙ্গিক ফলে "নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে অপ্রীতি" এবং 'কল্পনা' বা কুব্যাখ্যা প্রভৃতি অপরাধেরও সঞ্চার হইতে পারে।

উক্ত বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাইতেছে এই যে,—শ্রীনামের সাধু ও শাস্ত্রোক্ত অচিন্ত্য, অপরিসীম ও অনন্ত মহিমার কথা মুক্ত কণ্ঠে বর্ণন কালে, তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে তৎশ্রবণে বা পঠনে সে শ্রুত বা পঠিত, নাম-মাহাত্ম্য সকলকে অযথা স্তুতি বা প্রশংসামাত্র কিম্বা অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি মনে করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে, নাম মাহাত্ম্যে (১) 'অর্থবাদ' মননরূপ সেই সম্ভাব্য নামাপরাধ। অর্থবাদ মননরূপ অপরাধ সঞ্চারিত হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক ফলে (২) নাম-মহিমা শ্রবণে চিত্তে অপ্রীতির উদ্রেক হওয়াও অসম্ভব নহে, ইহাও একটি নামাপরাধ।

আবার সেই শ্রুত বা পঠিত নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ে 'অর্থবাদ' বা অতিশয়োক্তি মননের ফলে, কিম্বা নামের সেই মুক্ত-মহিমা বিষয়ে সমাধান করিতে না পারিয়া, হয়ত কাহারও পক্ষে স্বকল্পিত কুব্যাখ্যাদি দ্বারা নামের সেই সীমাহীন উন্মুক্ত মহিমার সঙ্কোচ সাধন পূর্বক, বৃথা অর্থান্তর কল্পনা দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য খর্ব করিবার চেষ্টাও অস্বাভাবিক নহে, ইহাই হইতেছে উক্ত 'অর্থবাদ' হইতে সম্ভাব্য (৩) 'কল্পনা' বা কুব্যাখ্যা নামক অপর একটি নামাপরাধ।

উক্ত অপরাধত্রয়ের মধ্যে নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ বা স্তুতিমাত্র মননরূপ এই অপরাধটি হইতে অপর দুইটি কিম্বা আরও অন্য নামাপরাধ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকায়, উক্ত অর্থবাদকেই প্রথমতঃ নাম-মহিমা কথনের পথে প্রধান অনর্থ বা অন্তরায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য নাম-মাহাত্ম্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভেই পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে যাহাতে উক্ত সম্ভাব্য অপরাধরূপে অনর্থত্রয়ের ও তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান যাহা, বিশেষভাবে সেই নামে 'অর্থবাদ' মননরূপ নামাপরাধ সংঘটিত হইয়া যাহাতে মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ লাভ হইতে এইরূপে বঞ্চিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের ও জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত সেই অনর্থের অপসারণের জন্য যে, সর্বপ্রথম চেষ্টাশীল হওয়া কর্তব্য, ইহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

এস্থলে আরও সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক এই যে, শ্রীনামের স্বরূপ অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় নাম ও নামীর অভিন্নতা বিষয়ে সুবিদিত যাঁহারা, সেই অত্যল্প ব্যক্তিদিগের পক্ষে, শাস্ত্রাদি-বর্ণিত নাম-মাহাত্ম্যের সংশয়স্থলে উহার সুসমাধান বিষয়ে চিন্তান্বিত হওয়া স্বাভাবিক হইলেও,—সেই সংশয় হইতে সহসা এমন কোন অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, যাহাতে তাঁহারা সেই শাস্ত্র-বর্ণিত নামের অচিন্ত্য মহিমা সম্বন্ধে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ অতিস্তুতি বা অতিশয়োক্তি মনে করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইতে পারেন ; কিন্তু বিপুল জনসাধারণের পক্ষে,—বিশেষতঃ যাঁহারা নামের স্বরূপ অবগত না থাকায়, জাগতিক সাধারণ নামের নামী হইতে ভিন্নতার মতই শ্রীভগবন্নামকেও কেবল তদ্বাচক শব্দ-সঙ্কেত মাত্র বলিয়া জানেন,—সাধু-শাস্ত্রোক্ত নামা-মাহাত্ম্যে যথার্থতা বাহ্যদৃষ্টিতে হয়ত' অনেকস্থলে যথাযথ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগের অন্তরে যে সংশয় সঞ্চারিত রহিয়াছে,—সেই জনসাধারণের সমীপে সহসা পুনরায় অসীম, অচিন্ত্য নাম-মাহাত্ম্য-সকলের উল্লেখ করিতে যাইলে,—তদ্বারা ইন্ধনপ্রাপ্ত তাঁহাদিগের সেই প্রচ্ছন্ন সংশয়েই বিবর্দ্ধিত হইয়া, নাম-মহিমায় 'অর্থবাদ' মননাদি নামাপরাধে পরিণত হইবার যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে,—একথার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহার কুফলে শ্রীনাম অপ্রসন্ন হইয়া নিজ অচিন্ত্য ও অব্যর্থ শক্তি প্রকাশে স্বেচ্ছায় বিরত থাকেন। উক্ত 'অর্থবাদ' রূপ অপরাধ ঘটিলে, তাহার আনুষঙ্গিকরূপে অন্য অপরাধেরও সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। একমাত্র 'নামাপরাধ' অর্থাৎ শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বিধান ব্যতীত নামের সাধন পথে উহার অব্যর্থ ফল লাভের পক্ষে অপর কোনও অন্তরায় নাই।—

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, যখন শাস্ত্রোক্ত নাম-মহিমার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রায় সর্বসাধারণের অন্তরে অন্ততঃ একটা প্রচ্ছন্ন সংশয় রহিয়াছেই,—সেই অমূলক সংশয়

দূরীভূত করিতে হইলে প্রয়োজন—সেই নাম-মাহাত্ম্যেরই আবার যথাক্রমে ও যথাযথ ভাবে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক পরিশেষে সেই শাস্ত্রোক্তি-সকলের শাস্ত্রানুকূল যুক্তি দ্বারাই সুসমাধান করা, কিন্তু সে পথে অধিকতর অন্তরায় হইতেছে এই যে,—শ্রীনামের স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও শক্তি বিষয়ে স্বভাবতঃ সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে পুনরায় সেই নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ কালে, সহজেই উহাকে অতিশয়োক্তি মনে করিয়া নামাপরাধরূপ ঘোরতর অনর্থ সাগরে নিমগ্ন হইবার আশঙ্কা। অতএব উক্ত কারণবশতঃ শ্রীভগবন্নাম-মহিমা বর্ণনের উপক্রমেই উক্ত সম্ভাব্য অপরাধরূপ অনর্থ বা আবর্জনা দ্বারা জগন্মঙ্গল শ্রীনামমহিমার সমুজ্জ্বল পথ যাহাতে অবরুদ্ধ হইতে না পারে, প্রথমেই তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এস্থলে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, শ্রীভগবানের ন্যায়[১] তদীয় অভিন্ন স্বরূপ শ্রীনামেরও অধিক বা সমান যে অপর কিছুই নাই, সুতরাং কোন মহিমা বর্ণন দ্বারা অসীম নাম-মাহাত্ম্যের সীমা অতিক্রম করা যায় না, এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তখন যেমন আর শ্রীনাম-সম্বন্ধে 'অর্থবাদ' বা অতিশয়োক্তি মনন করা সম্ভব হয় না, তেমনি সাধন-জগতে শ্রীনামের সর্বোৎকর্ষতার কথা বুঝিতে পারিলে, তখন উহার সুফলে শ্রীনামকীর্তনাদির সহিত অন্য কোন শুভকর্মাদির তুল্যত্ব অর্থাৎ সমতা চিন্তা করিবার পক্ষেও আর অবকাশ থাকে না। শ্রীনামকীর্তনাদি মহিমার সহিত অপর শুভক্রিয়াদির তুল্যত্ব অর্থাৎ সমতা চিন্তা করা—ইহাও একটি 'নামাপরাধ'[২]। সমতা চিন্তা করাই যখন অপরাধ, তখন 'নাম' অপেক্ষা অন্য শুভক্রিয়াদির আধিক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা যে অধিকতর অপরাধ, এ'কথার আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে অপরাধটি প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রায়শঃ জনসমাজের অন্তরে নিহিত থাকিবার সম্ভাবনা করা যায়। সাধারণতঃ নামের অব্যর্থ শক্তির উপলব্ধি না হইবার পক্ষে ইহাও একটি ব্যাপক অন্তরায় বা আবর্জনারূপে নামের সাধন পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। উক্ত ব্যাপক নামাপরাধের পাড়ন, জগতের পৃষ্ঠ হইতে অপসারণ করিতে হইলে, সাধন-রাজ্যে শ্রীভগবন্নামের সর্বোৎকর্ষতা বা সর্বশ্রেষ্ঠতার সংবাদ জনসমাজের অন্তরে উপলব্ধির বিষয় হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে অন্য কোন শুভকর্মাদি বা সাধনাদিকে নামের সমান বা নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অধিক ফলপ্রদ মনে করিবার অবকাশ না থাকায় উক্ত প্রকার নামাপরাধগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

বিশেষতঃ কলিযুগের যুগধর্মরূপে শাস্ত্রে শ্রীভগবন্নাম নির্দিষ্ট হওয়ায়,[৩] যুগধর্মকেই প্রধান বা অঙ্গীরূপে গ্রহণপূর্বক, উহারই অঙ্গরূপে অপর সাধন ও শুভক্রিয়াদি বর্তমান

১। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৬.৮) ২। ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ। (পদ্মপুরাণ) ৩। "কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।" (শ্রীভাগবত—১২.৩.৪৪)

যুগে অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাই যথোপযুক্ত সুফলপ্রদ হইবার কথা, নচেৎ শ্রীনাম বর্জনপূর্বক, অথবা অপর সাধন ও শুভকর্মাদিকেই প্রধান বা অঙ্গীরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহারই অঙ্গরূপে শ্রীভগবন্নাম গৃহীত হইলে, তদ্‌দ্বারা প্রকারান্তরে উক্ত নামাপরাধেরই অনুষ্ঠান হয় বলিয়া, সে সকল স্থলে নামেরই অপ্রসন্নতাবশতঃ উহার মুখ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উক্ত নামাপরাধটি অধিক ব্যাপকরূপে জনসমাজে সঞ্চারিত থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহা বিদূরিত করিতে হইলে, শ্রীভগবানের ন্যায় তন্নামেরও সর্বোৎকর্ষ বা সর্বপ্রাধান্যবোধ এবং 'যুগধর্ম' বলিয়া বিশেষতঃ বর্তমান যুগে শ্রীনামেরই মুখ্য সাধনত্ব বোধ জনসমাজে জাগ্রত হওয়ার আবশ্যকতায়, তদ্বিষয়েও এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

এস্থলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নামাপরাধ স্থলভিন্ন, নামের অব্যর্থ শক্তি প্রকাশের পক্ষে, তদ্বিষয়ক অপর কোন জ্ঞানাজ্ঞানের অপেক্ষা নাই। কেবল, যে জ্ঞান বা যে বোধ বিবেচনা সাক্ষাৎভাবে নামাপরাধ আকারে প্রকাশ হয়, সেই অনর্থকর জ্ঞানেরই সংস্কার সাধন জন্য তদ্বিষয়েই আলোচনার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

উপস্থিত কেবল প্রথমোক্ত বিষয়ের প্রয়োজনানুরোধে এস্থলে দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে আপাততঃ তিনটি অপরাধের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, আমাদের বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উক্তিতে যে দশবিধ নামাপরাধ[১] নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি অপরাধেরও উল্লেখ দেখা যায়। সেই তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি হইতেছে,— (১) তদার্থবাদো হরিনাম্নি (২) কল্পনম্।

(১) 'অর্থবাদ' অর্থাৎ শাস্ত্রাদি বর্ণিত নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, ইহা স্তুতিমাত্র—অর্থাৎ এত অধিক শক্তি নামে নিহিত নাই, লোকসকলের নাম-গ্রহণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য, নামসম্বন্ধে এইরূপ অতিরিক্ত প্রশংসা বা অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে,—এই প্রকার মনে করা ইহা একটি নামাপরাধ।

১। পদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ, যথা,—
সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ সহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।।
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং, তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপ বুদ্ধি, র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।।
ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্ব, শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি, যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।।
শ্রুতেঽপি নাম মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।। (হরিভক্তিবিলাসে, ১১ বিঃ, ২৮৩-২৮৫ দ্রষ্টব্য)

(২) 'কল্পনা' অর্থাৎ দুর্বুদ্ধিপূর্বক শাস্ত্রাদি বর্ণিত শ্রীনাম-মহিমার যথার্থ অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক গৌণার্থকরণ, অর্থাৎ স্বকল্পিত বৃথা অর্থান্তর বা কুব্যাখ্যাদি দ্বারা মুক্ত নাম-মহিমার সংকোচ সাধন করিবার উদ্দেশ্যে উপায়ান্তার চিন্তা করা,—ইহাও একটি নামাপরাধ।

আর একটি নামাপরাধ হইতেছে,—

(৩) "শ্রুতেঽপি নাম মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।"

অর্থাৎ যে অধম ব্যক্তির, নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও চিত্তে অপ্রসন্নতা জন্মে উহাকেও একটি নামাপরাধ বলিয়া জানিতে হইবে।

তাহা হইলে শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা এখানে সেই তিনটি নামাপরাধের সন্ধান পাওয়া গেল, যে বিষয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

উক্ত দশবিধ নামাপরাধের সংক্ষিপ্ত অর্থমাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। বিস্তারিত আলোচনা,—এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরণের বিষয়। (১) সাধুনিন্দাদি ; (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি ; (৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা ; (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র নিন্দা ; (৫) শ্রীনামে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ স্তুতিমাত্র মনন ; (৬) নাম-মাহাত্ম্যে কষ্টকল্পনা বা কুব্যাখ্যা ; (৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি ; (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত শ্রীনামের তুল্যত্ব বা সমতা চিন্তন ; (৯) শ্রদ্ধাহীন জনকে নামোপদেশ করা ; (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে তাহাতে অপ্রীতি।

অতঃপর যথাশাস্ত্র শ্রীনাম-মাহাত্ম্য বর্ণনকালে ও তৎ সমাধান বিষয়ে যে পর্যন্ত আমাদের বক্তব্যের শেষ না হয়, অন্ততঃ সেইকাল পর্যন্ত উক্ত সম্ভাব্য অপরাধত্রয় হইতে ও বিশেষভাবে তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান যাহা,—সেই অর্থবাদরূপ অপরাধ দ্বারা গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্রে নাম-মহিমা সম্বন্ধে যতদূর ও যাহা কিছু উক্ত হউক না কেন, অন্ততঃপক্ষে তদ্বিষয়ে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে সকল বাক্যকে 'অযথা স্তুতি মাত্র' বা 'অতিশয়োক্তি' প্রভৃতি বলিয়া যেন কোন প্রকারেই মনে করা না হয়। নাম-মহিমায় (১) 'অর্থবাদ' মনে করা না হইলে, সেই অসীম উন্মুক্ত মহিমার খর্বতা বা সঙ্কোচ সাধন করিবার জন্য আর কোন (২) স্বকল্পিত কুব্যাখ্যাদির আশ্রয় লইবারও আবশ্যক হইবে না, কিম্বা (৩) নামের অপরিসীম—অচিন্ত্য মহিমাদির কথা শ্রবণ করিয়া চিত্তে অপ্রীতির উদ্রেক হইবারও আশঙ্কা থাকিবে না। অতএব শ্রীনামের শক্তি বা মহিমা সম্বন্ধে আলোচনার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তদ্বিষয়ে অর্থবাদ মননরূপ অন্ততঃ এই সম্ভাবিত অপরাধ হইতে নাম-মহিমায় প্রায়শঃ সংশয়াপন্ন ব্যক্তিগণের সাবধান থাকিয়া, শ্রীনাম-মাহাত্ম্যের যথার্থতা পরিজ্ঞাত হইবার পথে যথাক্রমে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ কিম্বা মহিমাদি সম্বন্ধে সন্ধান-শূন্যতাবশতঃ যাঁহারা তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ অর্থাৎ যাঁহারা ভগবৎ সম্বন্ধীয় নাম ও নামী ভেদ কি অভেদ,—কিছুই সন্ধান রাখেন না, শাস্ত্রাদি বর্ণিত নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, উহা যথার্থ উক্তি কিম্বা অতিশয়োক্তি—সে সম্বন্ধে কোন কথাই চিন্তা করেন না ; কিম্বা শ্রীনাম-মহিমাদি শ্রবণে প্রীতিযুক্তও নহেন, অপ্রীতিও নহেন ; অথবা সেই নাম-মাহাত্ম্য যথার্থভাবে প্রচার কিম্বা স্বকল্পিত কুব্যাখ্যাদি দ্বারা সঙ্কোচ সাধনের জন্য কখনও চেষ্টাশীল হয়েন নাই,—শ্রীনাম-সম্বন্ধে এই প্রকার নিরপেক্ষতা কোন অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং এরূপস্থলে শ্রীনাম গ্রহণাদি দ্বারা নামের অব্যর্থ ফল তাঁহারা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। একমাত্র নামাপরাধ ভিন্ন, নামের সাধন পথে অপর কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই।

শ্রীভগবন্নামের নিত্যতাবশতঃ যদিও কল্পান্তর্গত সত্যাদি অপর যুগে ধ্যানাদি যুগধর্মের সহিত "তারকব্রহ্ম নাম"রূপে এবং অপর কলিযুগে একমাত্র যুগধর্মরূপে শ্রীভগবন্নাম জগতে উৎকর্ষতার সহিত সর্বকাল বিদ্যমান রহিয়াছেন, তথাপি স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্যের অপ্রকাশ্য সেই ভগবন্নামের তত্ত্ব ও মহিমাদি প্রকৃষ্টরূপে জগতে প্রকাশ না থাকায়, উহাকে কেবল ভগবৎ-নির্দেশক শব্দ-সঙ্কেতমাত্র মননপূর্বক, নাম গ্রহণাদি বিষয়ে আগ্রহান্বিত না হইয়া তৎকালীন অধিকাংশ ব্যক্তিই সমধিক প্রচারিত ধ্যান যজ্ঞাদি সেই সেই যুগধর্ম বিষয়েই অধিক আস্থাবান হইয়া থাকেন। অন্যান্য কলিযুগেও কলিপ্রভাবকৃত স্বভাবতঃ অধর্মরত এবং পরমার্থ বিষয়ে অলস ও উৎসাহহীন জীবসাধারণের পক্ষে অপর কোন ধর্ম গ্রহণীয় হইবেন না বলিয়া, এইজন্য যাহা সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য, সর্বশক্তিযুক্ত ও সর্বোত্তম সাধনা,—সেই নামসঙ্কীর্তনই উক্ত যুগের একমাত্র যুগধর্মরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। কিন্তু মহৎকৃপার দুর্লভতাবশতঃ সেই নামাশ্রয়ের সৌভাগ্যও অল্প লোকের পক্ষেই সংঘটিত হইয়া থাকে ; অধিকন্তু যথার্থরূপে নামতত্ত্ব ও মাহাত্ম্যাদির প্রকাশ না থাকায়, তৎকালীন জনসমাজের মধ্যে নামসম্বন্ধে অর্থবাদ মননাদিরূপ বিবিধ নামাপরাধ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সুতরাং তৎকালে শ্রীনামও অপ্রসন্নতাবশতঃ সেই সকল জীবের পক্ষে যে প্রায়শঃ গ্রহণীয় হয়েন না, শাস্ত্রোক্তি হইতেই তাহা জানিতে পারা যায় ; যথা,—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ, পতন স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং, প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।

(শ্রীভাগবত—১২.৩.৪৪)

অর্থাৎ যাঁহার নাম মুমূর্ষু, আতুর, পতিত, স্খলিত অবস্থায় অবশ চিত্তেও কীর্ত্তন করিতে করিতে সকল কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া লোকে উত্তমাগতি প্রাপ্ত হইয়া

থাকে, কলিযুগের জনগণ তাঁহার আরাধনা করিবে না। [কলিযুগে নাম দ্বারাই ভগবদ্ আরাধনা, সুতরাং সর্বসাধারণ কলিযুগে জনসাধারণ প্রায়শঃ নাম গ্রহণ করে না—ইহাই বুঝিতে হইবে।]

এইরূপে শ্রীনাম সর্বযুগেই বিদ্যমান থাকিলেও উক্ত কারণে গ্রাহকের অভাব বশতঃ শ্রীনাম থাকিয়াও না থাকার মতন অবস্থান করেন। তবে অনির্বচনীয় সৌভাগ্যোদয়বশতঃ সকল যুগেই নিরপরাধ ব্যক্তিগণের মধ্যে সুদুর্লভ মহৎ কৃপাদি যোগে ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে নামাশ্রয় ঘটিলে, সেই ব্যক্তির পক্ষে শ্রীভগবচ্চরণে 'প্রেমভক্তিরূপ' সর্বোত্তম পরমার্থ লাভ করা অবশ্যই সম্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু সে'রূপ সৌভাগ্যবান্ জীবের সংখ্যা অপর সকল যুগে খুবই বিরল জানিতে হইবে।

যে আবির্ভাব বিশেষে—পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক জগতে যথার্থরূপে তত্ত্ব ও মহিমাদির সহিত শ্রীনাম ও প্রেমধর্মের পরিপূর্ণ প্রচার ও তৎকালীন জীবসাধারণের পক্ষে উহা গ্রহণের অবাধ অধিকার প্রদান করা হইয়া থাকে,—কল্পান্তর্গত নিখিল কলিযুগের মধ্যে বর্তমান যুগই সেই বিশেষ সৌভাগ্যান্বিত কলিযুগ। সাধারণ নিয়মে দ্বাপরানন্তর-যুগ বলিয়া ইহা 'কলিযুগ' নামে কথিত হইলেও, ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ এক কল্প বা সহস্র চতুর্যুগ পরিমিত কালের মধ্যে কেবল এই বিশেষ কলিযুগেই বেদগোপ্য ও অন্যের অদেয় সেই প্রেমধর্ম ও সমহিমা শ্রীনামতত্ত্বের জগতে পরিপূর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে বলিয়াই একমাত্র বর্তমান কলিযুগই 'প্রেমযুগ' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়েন। এই বিশেষ কলিযুগের বিশেষ যুগাবতারের কথাই শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত কর্তৃক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—" (১১.৫.৩১) ইত্যাদি ও তৎপরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে, স্পষ্টতঃই নামোল্লেখ না করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, ইনি সাধারণ যুগাবতার নহেন, সর্ব অবতারের অবতারী—স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্ যিনি,—তিনিই এই অবতারে সর্বভক্ত শিরোমণি শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া অর্থাৎ পরম ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া[১], জীবজগৎকে অন্যের অদেয় ব্রজপ্রেম ও তৎপ্রাপ্তির পরমোপায় শ্রীনামসঙ্কীর্তন যজ্ঞের অবাধ অধিকার দান করিতে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হয়েন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতও তদীয় সেই ছন্ন লক্ষণের হানি না করিয়া, কেবল বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ? অন্যান্য কলিযুগ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের বৈশিষ্ট্য এই যে,—

(১) অপর কলিযুগে শ্রীনামগ্রহণের ফলে ভগবদবতার সম্বন্ধীয় প্রেম সাধারণ বা ভগবদ্ভক্তি পর্যন্ত উদয় হইয়া থাকে, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকটিত এই কলিযুগে বা প্রেমযুগে

১। "ছন্ন কলৌ যদভবঃ" (শ্রীভাগবত—৭.৯.৩৮)

তদানুগত্যে শ্রীনামগ্রহণের ফলে, অবতারী বা স্বয়ং ভগবান্ সম্বন্ধীয় প্রেমবিশেষ অর্থাৎ ভক্তি বা ভাগবত ধর্মের পরমাবস্থা যাহা,—সেই ব্রজপ্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২) অপর কলিযুগের যুগাবতার প্রবর্তিত শ্রীনামকীর্তনের গ্রাহক অতি অল্পই হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকাল হইতে শ্রীনাম, সর্বসাধারণের পক্ষে একান্তই সহজলভ্য হইয়া তত্ত্ব ও মহিমাদির সহিত পরিপূর্ণরূপে বা পূর্ণাঙ্গে জগতে প্রকাশ হয়েন ; এইযুগে জনসাধারণ ইচ্ছা মাত্রেই—এমন কি অবহেলায়, পরিহাসে, আভাসে ও উপহাসাদিতেও উহা গ্রহণে সমর্থ হয়।

শ্রীগৌর-প্রকটিত প্রেমযুগাখ্য এই বর্তমান কলিযুগেরই উক্ত প্রকার পরম সৌভাগ্যরূপ মহাবৈশিষ্ট্য, শ্রীমদ্ভাগবতে "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা—" ইত্যাদি (১১.৫.৩৫) এবং "নহ্যতঃ পরমো লাভো—" (১১.৫.৩৬) ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকার্থে "যে কলিতে সংকীর্তন দ্বারা সকল স্বার্থই লাভ হয়,—সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ আর্যগণ সেই কলিযুগকে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন"—এইরূপ উক্তি দ্বারা নাম-সংকীর্তনে পরম উৎকর্ষতার সহিত এই বিশেষ কলিযুগের অসাধারণ মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। পরবর্তী শ্লোকার্থে "সংসারে ভ্রাম্যমান দেহীদিগের ইহা হইতে পরম লাভ আর কিছুই নাই,—যে কীর্তন হইতে পরম শান্তির উদয় ও জীবের সংসার-বন্ধন প্রকৃষ্টরূপে নিবৃত্ত হইয়া থাকে"—এই উক্তি দ্বারা, এই কলিযুগে শ্রীনাম-কীর্তনের অসাধারণ মহিমা যে 'ব্রজপ্রেম লাভ'—'ইহাই যাহা হইতে পরমলাভ আর কিছুই নাই'—ইত্যাদি বাক্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকটিত কলিযুগের শ্রীনাম-কীর্তন হইতে লভ্য উক্ত প্রকার পরম সৌভাগ্যরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই সত্যাদি যুগের সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ যাহারা, তাহারাও যে এই বিশেষ কলিযুগে জন্মলাভ প্রার্থনা করেন, স্পষ্টতঃ একথাও ঘোষণাপূর্বক[১] শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগৌর প্রকটিত কলিযুগের ও তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম-সংকীর্তনের অসাধারণ মহামহিমাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাই দেখিতে পাই, যাহা কোন যুগে কোন সাধন দ্বারা লাভ করা যায় নাই,—সেই বেদগুহ্য 'ব্রজপ্রেম' শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত কেবল শ্রীনামকীর্তন হইতেই প্রাদুর্ভূত হইবার পরম রহস্য যখন মহাজ্ঞানী শিরোমণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহানুভবের অন্তরে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তখন তিনি জীবজগতের সেই শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য ও আনন্দের বার্তা মহোৎসাহভরে নিঃসঙ্কোচে জগতে প্রচার করিলেন,—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপো ধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।

১। কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।" (১১.৫.৩৭)

গোবিন্দ-প্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্‌রহস্যং স্বয়ং তৎ-
নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরং।।

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত—৩)

অর্থ,—যাহা কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয়েন না, যাহা তপস্যা, ধ্যান এবং অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা লাভ করা যায় না, যাহা ভগবৎ বিষয়ক বৈরাগ্য, ত্যাগ ও স্তুতি দ্বারাও লভ্য নহে, অধিক কথা কি,—যাহা শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব হয় নাই—সেই পরম নিগুঢ় ব্রজপ্রেম যাঁহার অবতার কালে কেবল শ্রীনামমাত্র হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই গৌরবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্তও যে প্রপঞ্চে প্রেমভক্তির অপ্রকাশের ন্যায় শ্রীনামগ্রহণ সমর্থ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকারের বর্ণনা হইতেও ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা আমরা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি,—

"কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসারে।।"

* * * * *

অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।।

* * * * *

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত—১.২.৬২-৭৫)

ইহাই ছিল মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেকার দেশের পারমার্থিক অবস্থা। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে অচৈতন্য ও দুর্দশাগ্রস্থ জগতকে তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণ চৈতন্য ও তৎপ্রাপ্তির অবাধ অধিকার প্রদান করিবার জন্য সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন,—

"কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ।।
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্বপরিকরে।।
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকর।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ ভিতর।। (চৈতন্যভাগবত—১.২.২৬-২৮)

শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে—চন্দ্রগ্রহণ সময়ে ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনামকে অগ্রবর্তী করিয়া, সংকীর্তনবিহারী শ্রীশ্রীগৌরহরি জগতে জন্মগ্রহণ করিলেন। চন্দ্রগ্রহণে, তদীয় জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন কি এক অচিন্ত্য প্রভাবে জীবজগতে নামগ্রহণের

মহাসৌভাগ্যও আরম্ভ হইয়া গেল। সেই দিনের গ্রহণ শব্দের এই ছড়াছড়িই যেন জীবের আজ যথার্থ নাম-গ্রহণের দিন,—ইহাই ঘোষণা করিয়া দিল। তাই আজ নামী হইতে অভিন্ন স্বপ্রকাশ নাম, যেন কি এক মহাকৃপায় সর্বজনের গ্রহণীয় হইয়া উঠিলেন। যে কখনও 'হরি' বলেন নাই, আজ তাহার রসনাও যেন শ্রীনামগ্রহণে সচঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রহণের ছলে আজ চতুর্দিক—আকাশ পবন উচ্চ হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া শ্রীগৌর প্রকটিত কলিযুগের সর্বোপরি বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে এই অসাধারণ ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা আমরা অবগত হইতে পারি,—

"আদি খণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভ দিনে।
অবতীর্ণ কৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে।।
হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিকে।
জন্মিলা ঠাকুর সংকীর্ত্তন করি আগে।। (১.১.৯৫-৯৬)
হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার।।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া।।
যার মুখে এজন্মেও নাহিক হরিনাম।
সেহো হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান।।
দশদিক পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হই' শুনি হাসে দ্বিজমণি।।" (১.৩.২-৫)

জগতে গৌরচন্দ্রোদয়ের পূর্বাবস্থার সহিত তদীয় উদয়কালীন অবস্থার তুলনামূলক ব্যতিক্রম শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত নিম্নোক্ত শ্লোকার্থ হইতেও বুঝিতে পারা যায়—নাম ও ভক্তিশূন্য প্রায় নীরস সংসারে—সহসা নাম-প্রেমের বিপুল বন্যা নামিয়া আসিয়াছিল—শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব কাল হইতেই,—

উম্‌গৃহ্ণন্তি সমস্ত শাস্ত্র মথিতো দুর্ব্বারগর্ব্বায়িত,
ধন্যম্মন্য ধিয়শ্চ কর্ম্ম তপসাদ্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ।
দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচন হরের্নামানি বামাশয়াঃ,
পূর্ব্বং সম্প্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ।।
(চৈতন্যচন্দ্রামৃত—১১৬)

অর্থ,—অধিত শাস্ত্র-বিষয়ে দুর্নিবার গর্বান্বিত, ধার্মিক বলিয়া নিজেকে বিবেচিত স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদিতেই পরিনিষ্ঠ এবং তপস্যা অর্থাৎ স্বর্গাদি বিষয়েই ক্লেশ সহনশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে পূর্বে কেহ কেহ অসরল অন্তরে হয়ত দুই তিনবার মাত্র

হরেকৃষ্ণাদি নাম জপ করিতেন ; অধুনা শ্রীগৌরচন্দ্র উদয় হওয়ায়, 'প্রেম' সাধারণ হইয়া পড়িল। অর্থাৎ আপামর সকলেই প্রেমানন্দে দিবারাত্র হরেকৃষ্ণ নাম কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবেরও অনেক পূর্বে দাক্ষিণাত্য নিবাসী রাজর্ষি কুলশেখর বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ 'মুকুন্দমালা' স্তোত্রেও দেখা যায়,—ভগবন্নাম গ্রহণের যোগ্য হইয়াও শ্রীনামকীর্তনাদি বিষয়ে তৎকালীন জনসমাজের অক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া, উক্ত স্তবকর্তা খেদযুক্ত বিস্ময়ে বলিতেছেন,—

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম—
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চি—
দহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্।।

অর্থ,—আনন্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনন্ত প্রভৃতি ভগবন্নাম সকল বলিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াও লোকে যে তাহা বলে না,—অহো ! জনগণের ইহা প্রবল দুর্দ্দৈবই বলিতে হইবে।

কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার স্নিগ্ধ সৌরভে দশদিক ভরিয়া উঠিলে তখনই যেমন লোকে কুসুমের সত্তা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারে, কিন্তু কলিকারূপে অবস্থিতি কালে তাহার বিদ্যমানতা যেমন থাকিয়াও অবিদিত থাকে, সেইরূপ শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিত্য পরিবারগণের আবির্ভাবের পূর্বে জগতে শ্রীনাম এবং বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে নাম-মহিমাদি বিদ্যমান থাকিলেও, উহা অস্ফুট কুসুম-কলিকার মতই অজ্ঞাত প্রায় অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীগৌরহরির উদয়ারম্ভ হইতেই জগতে অবজ্ঞাত ও অর্থবাদাদি অপরাধ-রূপ কীটদষ্ট—অপ্রসন্ন শ্রীনামশতদল আবার বিকাশোন্মুখ ও প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীনাম-মহিমা শাস্ত্রে অব্যক্ত কুমুদ কোরকের ন্যায় বিদ্যমান ছিলেন ; শ্রীগৌরচন্দ্র উহাকে প্রস্ফুটিত করাইয়া, উহার অপূর্ব মাধুর্য ও সুষমার প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিস্মৃত জগতে এক নবভাব—নবচেতনা জাগিয়া উঠিল। অসংখ্য সাধক ভৃঙ্গের গুঞ্জনে ও সেবনে শ্রীনামশতদল আবার আত্মমহিমায় বিশ্বে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ—৩৮.১২৬)

এই শ্লোকে কলিযুগে ভগবন্নামই জীবের একমাত্র গতিরূপে নিরূপিত থাকিলেও, নামতত্ত্ব ও মহিমাদি বিষয়ে বিভ্রান্ত মানব-সমাজের নিকট উক্ত শ্লোকের যথার্থ অভিপ্রায় অনুভূত না হওয়ায়, উহা উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়াই আসিতেছিলেন, লোকে নিজ

অভিরুচিমত অন্যান্য সাধন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত। কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণনাম সম্বন্ধে অচৈতন্য জীবজগৎকে পূর্ণ চৈতন্য প্রদাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই, অবজ্ঞাত—ধূলিবিলুণ্ঠিত সেই নাম-মাহাত্ম্যকে সযত্নে উঠাইয়া,—ধূলামাটি ঝাড়িয়া, সাধন-জগতের সর্বোচ্চ—সমুজ্জ্বল গৌরবমণ্ডিত—তাঁহার নিজ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, উক্ত শ্লোকের নিম্নোক্ত অভিনব সত্যার্থ নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে জগতে ঘোষণা করিলেন ; প্রেমভক্তি ও ভগবন্নাম-মহিমা প্রচারে এ'রূপ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর জগতের ইতিহাসে আর কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন,—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার।।
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এব-কার।।
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম-তপ আদি নিবারণ।।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি'—তিন তিনে এবকার।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১৭.১৯-২২)

সেইরূপ উদাত্ত স্বরেই তিনি, ভগবান্ হইতে ভগবন্নামের অভিন্নতা, "(কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুইত' সমান)"[১] ; ভগবানের ন্যায় ভগবন্নামের স্বপ্রকাশতা, "(অতএব কৃষ্ণ নাম, দেহ বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ)"[২]। শ্রীনামের দেশ-কালাদি, নিয়মানপেক্ষিতা, "(খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়)"৩—ঘোষণা পুর্বক, শ্রীনামের সর্ব-সাধন-শ্রেষ্ঠতা ও যে কোন শুভানুষ্ঠানের সহিত নামের তুল্যতা চিন্তনেও ঘোর অনিষ্টকারিতা "(কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম। যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম")[৪]।—ইত্যাদি ভগবন্নামের তত্ত্ব ও মহিমাদি সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়,—কেবল প্রচারই নহে, আচার দ্বারা, অথচ শাস্ত্রের অবিরোধীরূপেই জগতকে বিদিত করাইলেন। সর্ব প্রায়শ্চিত্ত হইতে শ্রীভগবন্নামের শ্রেষ্ঠত্বের মহামহিমা তিনি কেবল প্রচার করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই,—সুবুদ্ধিরায় যখন নিজ জাতিত্ব নাশের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া বারাণসীর পণ্ডিত সমাজের দ্বারে দ্বারে পাগল পারা—দিশাহারা হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিলেন,—পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা তপ্তকৃচ্ছ্র, কেহ বা তুষানল, কেহ বা দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া

১। চৈঃ চঃ, ২.১৭.১২৬ ২। চৈঃ চঃ ২.১৭.১২৯ ৩। চৈঃ চঃ ৩.২০.১৪ ৪। চৈঃ চঃ ১.৩.৬৪

তাঁহাকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময় কলিপাবনাবতার,—দীন-হীন-অগতি পতিতের পরম বন্ধু—কাঙ্গালের ঠাকুর—শ্রীগৌরসুন্দর সহসা তাঁহার সম্মুখে উদয় হইলেন। তাঁহার দুর্দশার কথা শ্রবণপূর্বক নিজ সর্ব-তাপহর সুশীতল করকমলে, তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। পরে বারাণসীর পণ্ডিত সমাজের মধ্যেই দণ্ডায়মান হইয়া নিঃসঙ্কোচে সুবুদ্ধিরায়কে সম্বোধন পূর্বক তাঁহার পাপ স্খালনের যাহা শাস্ত্রসম্মত—সর্বোত্তম ব্যবস্থা তাহাই জানাইয়া, অকুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন,—

"প্রভু কহে,—ইঁহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।।
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২৫.১৯১-১৯২)

সুবুদ্ধিরায় প্রেমানন্দময় নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই ব্যবস্থার কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

সেই দীনবৎসল—পরম উদার—সাক্ষাৎ বেদময় পুরুষ, বেদগুহ্য পরমধর্ম জগতে স্বয়ং প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাই ঐকান্তিক দৃঢ়তার সহিত তিনি নিজ অভিন্নাত্ম শ্রীনামের আভিজাত্যাদি অধিকারী নিরপেক্ষতা এবং কৃষ্ণভজনের সার্বজনীনতার বিজয়বার্তা সর্বদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন, যথা —

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন।।
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর—বড় অভিমান।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৪.৬১-৬৪)

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, তদীয় প্রদত্ত 'কৃষ্ণ নাম' গ্রহণ বা শ্রবণ মাত্রেই, সেই ব্যক্তির সদ্যই ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত প্রেমভক্তির উদয়ের কথা,—

বাহু তুলি, হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
কল্মষ তমো নাশ করি প্রেমেতে ভাসায়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৩.৪৯)

এবং তৎসঙ্গ লাভে অপরাপর ব্যক্তিরও তদনুরূপ ভক্তি সঞ্চারিত হইবার অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য বিবরণ,[১] যাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপ্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা বলিতে পারি,—এ'রূপ আশুফলপ্রদ — প্রত্যক্ষসিদ্ধ—ব্রহ্মা মহেশাদি দেবতা বাঞ্ছিত ধর্ম প্রচারের অভিনব সংবাদ জগতের ইতিহাসে কুত্রাপি পরিকীর্তিত হয় নাই। যাহা হউক তৎসম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনা করিবার থাকিলেও, আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজন অনুরোধে কেবল তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, অতঃপর মূল বক্তব্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, শ্রীচৈতন্য ও তদীয় নিত্য পরিকরগণের আবির্ভাবের পূর্বে জগতে শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ ও শক্তি বা তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয়ে যথার্থ অভিজ্ঞতা না থাকায়, তৎকালে প্রায় সর্বসাধারণের পক্ষে ভগবন্নামকে ভগবানের নির্দেশক শব্দ সামান্যমাত্র মনে করাই স্বাভাবিক ছিল এবং তন্নিবন্ধন শ্রীনামের সীমাহীন শাস্ত্রোক্ত অচিন্ত্য মহিমা সম্বন্ধে স্বভাবতঃ সংশয়াপন্ন জনসমাজ কর্তৃক সেই সকল শাস্ত্রোক্তিকে 'অর্থবাদ' বা অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিবার পক্ষে কোন প্রকারেই অসম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং তদবস্থায় ক্বচিৎ কোন প্রকৃষ্ট ভক্তের মুখে নামের যথার্থ মহিমা শ্রবণে জনসাধারণের চিত্তে প্রীতির পরিবর্তে অপ্রীতি বা অপ্রসন্নতার উদ্রেক হইত। আবার যাঁহারা শাস্ত্রদর্শী ও সমর্থবান ছিলেন, তাঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যাকালে ভগবন্নামের শাস্ত্রোক্ত সীমাহীন যথার্থ মহিমাবিষয়ে অনবধানবশতঃ অর্থবাদ বা অতিরঞ্জিত উক্তি বোধে মহিমার সেই 'অতিরিক্ত' অংশের সঙ্কোচ সাধনপূর্বক নিজ কল্পিত অর্থ দ্বারা হয়ত কিয়দংশ মহিমা অবশিষ্ট রাখিয়া, জনসমাজে তাহারই প্রচার করিতেন, অর্থাৎ যেমন, নামের মুখ্যফলে প্রেমভক্তির উদয় ও গৌণফলে বা নামাভাসেই পাপক্ষয় ও মুক্তি এবং শ্রদ্ধায় হেলায় কিম্বা শুচি ও অশুচি, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ—যে ভাবেই হউক, যথা কথঞ্চিৎ নাম গ্রহণেই নামের ফলোদয়ের কথা শাস্ত্রে পরিগীত হইলেও, তাঁহারা নামের যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নাম ও নামীর অভিন্নতা বিষয়ে সুবিদিত না থাকায় নামের তাদৃশ মহামহিমা তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হইত না, সুতরাং নামের প্রতি অপকর্ষতাবুদ্ধিবশতঃ উহা 'অতিস্তুতি' বিবেচনায় অপ্রসন্ন চিত্ত হইয়া, শ্রীনামের সেই মুক্ত-মহিমার খর্বতা সাধনপূর্বক,—নাম গ্রহণের ফলে জীবের পাপক্ষয় পর্যন্ত

১। যেই যেই জন প্রভুর পাইলা দরশন। সেই সেই গ্রামে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।।
তার সঙ্গে অন্যন্য, তার সঙ্গে আন। এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম।।
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। সেই মত পশ্চিম দেশ প্রেমেতে ভাসাইলা।।
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৮.২০৯-২১১)

হইতে পারে "কিম্বা" সাত্ত্বিক ভাবে থাকিয়া ব্রহ্মচর্যাদি অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্ম-চিন্তনের সহিত নাম গ্রহণ করিতে পারিলে তৎকালে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ পর্যন্ত হইতে পারে অথবা পুরশ্চরণ না করিয়া, দীক্ষা না লইয়া বা তৃণাদপি সুনীচ না হইয়া, কিম্বা অশুদ্ধ ও অশুচিভাবে নাম গ্রহণে ফলোদয় হয় না"—ইত্যাদি প্রকারে বিবিধ স্বকল্পিত কুব্যাখ্যাদি দ্বারা অবারিত বা উন্মুক্ত নাম-মহিমাকে আচ্ছাদিত করায়, তাঁহারা স্বয়ং নামাপরাধী হইয়া ও তন্মতাবলম্বী জনসাধারণকেও অপরাধগ্রস্ত করিয়া রাখিয়া এইরূপ নামের অব্যর্থ ফল লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতেন, যেহেতু কেবল নামাপরাধ ভিন্ন, নামের অব্যর্থ শক্তি প্রকাশের পক্ষে অপর কোনও বাধা নাই।

এস্থলে আর একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, এই যে, শ্রীনামতত্ত্ব ও মাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা দোষাবহ নহে, অর্থাৎ সে জন্য নামের ফল প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কোনও বাধা হয় না, কিন্তু তদ্বিষয়ে যে ভ্রমাত্মক বা বিপরীত জ্ঞানের ফলে নামাপরাধ সৃজিত হয়—সেই দোষ দুষ্ট বা অনর্থকর জ্ঞানের সংশোধনের জন্য শ্রীনাম সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট বা শুদ্ধ অভিজ্ঞতার আবশ্যক হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকারে ব্যাপকভাবে নামাপরাধ দ্বারা আক্রান্ত জনসমাজে তৎকালে সহজসাধ্য নামগ্রহণাদি বিষয়ে আগ্রহের পরিবর্তে দান, ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, তপ ও তীর্থ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য আড়ম্বরপূর্ণ শুভক্রিয়াকেই নাম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ বিবেচিত হইয়া, তদ্দ্বারা নিরন্তর নামাপরাধেরই আধিক্য বিস্তার করিতেছিল।

তাহার কারণ এই যে,—অপর যে কোন শুভক্রিয়াকে শ্রীভগবন্নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মননের অপরাধের কথা আর কি বলিব—নামের সমান বলিয়া মনে করিলে উহাকেই দশবিধ নামাপরাধের অন্যতমরূপে যখন শাস্ত্রে গণ্য করা হইয়াছে, তখন সেই শুভক্রিয়াদিকে নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অধিক মনে করায় যে নাম অপরাধ ঘটিবে, এ'কথার আর উল্লেখ করিবারই বা কি প্রয়োজন ? পদ্মপুরাণে নামাপরাধ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

"ধর্ম্মব্রত ত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।

অর্থাৎ,—ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি সর্বশুভক্রিয়াকে নামের সমান মনে করা অপরাধ।

উক্ত প্রকারে শ্রীনামকে ন্যূনতার দৃষ্টিতে দেখিয়া, (১) অপর ধর্মাদি বা শুভক্রিয়াদিকে নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা করিবার ফলে, নাম সম্বন্ধে উক্ত অপরাধের আনুষঙ্গিক, (২) অর্থবাদ মনন, (৩) কল্পনা বা কুব্যাখ্যাদি, (৪) নাম-মহিমা শ্রবণে অপ্রীতি প্রভৃতি পরস্পর সাপেক্ষ নামাপরাধ সকল—শ্রীগৌরহরি ও তৎপরিকরগণের প্রাদুর্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত শ্রীভগবন্নামের সুগম ও সর্বোত্তম সাধন

পথের প্রধান অনর্থস্বরূপ হইয়া নামের অব্যর্থ ফললাভ বিষয়ে জীবজগৎকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল—ইহা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইতে পারে।

অতএব এইরূপে উক্ত নামাপরাধের কঠিন 'পাড়ন পাতা' জগতের উপর ক্বচিৎ শ্রীনামরূপ বীজ পতিত হইলেও উহা সহজে অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না ; যেহেতু নামের সাধনপথে একমাত্র নামাপরাধই প্রতিবন্ধকরূপে নির্দ্ধারিত হওয়ায়, তৎকালে নামাপরাধ-বহুল বিশ্বে, কীটজীর্ণ কুসুম কলিকার ন্যায় শ্রীনাম প্রায়শঃ স্বীয় মহিমাদির প্রকাশ না করিয়া, অপ্রসন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

বর্ষার মহাপ্লাবন আসিয়া যেমন দামবদ্ধা পঙ্কিলা ও বিচ্ছিন্না গঙ্গাধারাকে তদবস্থা হইতে বিমুক্ত করিয়া নবরূপ প্রদান পূর্ব্বক প্রসন্ন সলিলা করিয়া থাকে, সেইরূপ নামাপেক্ষা "অপর শুভক্রিয়াদিকে অধিক বা শ্রেষ্ঠ-মনন", 'অর্থবাদ' ও 'কল্পনাদি' বিবিধ নামাপরাধ দ্বারা অবরুদ্ধ শ্রীনামের সুগম—সমুজ্জ্বল সাধন-পথ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে আবার নবভাবে—নবরূপে বিশ্বে বিমুক্ত হইলেন। বেদগোপ্য শ্রীনাম-মহিমা আবার জগতে যথার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। জনসমাজের বিভ্রান্ত দৃষ্টি শ্রীনামের প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট হইল। নামাপরাধজনক পুরাতন—জরাজীর্ণ-সঙ্কীর্ণ মতবাদ-সকল—যাহা বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া শ্রীনামের সর্বোত্তম সাধন পথ অবরোধ করিয়া স্তূপীকৃত আবর্জনার ন্যায় অবস্থান করিতেছিল—স্বয়ং ভগবান্—প্রেমময় গৌরহরি তৎপ্রবর্তিত ও তৎপরিকরগণের প্রচারিত পরম সত্যের আলোকে উদ্ভাষিত—সেই বেদগুহ্য নবোদিত মতবাদের সহিত সংঘর্ষণে, সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়া শ্রীনামতত্ত্ব সাধন-জগতের সর্বোচ্চ আসনে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকরগণ মধ্যে তৎকৃপাবিশেষ লাভ করিয়া ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম হরিদাসই জগতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্যের উক্ত নবোদিত মতবাদ প্রচারের অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেনাপোলের নিভৃত বনভূমের সেই নামসিদ্ধ নির্ভীক তাপস, নিজ আচরণ দ্বারা নামের অচিন্ত্য মাহাত্ম্য জনসাধরণকে প্রত্যক্ষ করাইয়া, সেই নামের অসীম উন্মুক্ত মহিমার বিষয় যখন মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন, সেই সময় হইতেই অপরাধদুষ্ট পুরাতন সংকীর্ণ মতবাদের সহিত প্রকাশ্য সংঘর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। ফুলিয়ায় আসিয়া ঠাকুর হরিদাস নামানন্দে বিভোর থাকিয়া প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম জপ করেন। তদীয় সাধু চরিত্রের পরম উদারতাবশতঃ তিনি সর্বজীব হিতের নিমিত্ত তন্মধ্যে একলক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়া ভ্রমণ করেন, উদ্দেশ্য—যাহারা ভুবনমঙ্গল নাম গ্রহণে অশক্ত, তাহারাও উহা শ্রবণে পরম ধন্য হইয়া যাইবে। নাম-মহিমায় সঙ্কীর্ণচেতা প্রাচীন পন্থীগণ—যাঁহারা মহামন্ত্রের মুক্ত-মহিমা না জানিয়া শ্রীনামকেও অপর মন্ত্র-সাধারণের ন্যায় কেবল নীরব জপেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এই

আচরণ তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সত্যের নবীন মেঘ-গর্জনে অপরাধজীর্ণ দুর্গসকল কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও বিপ্র সক্রোধ বচনে বলিলেন,—

"অয়ে হরিদাস একি ব্যবহার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার।।
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত—১.১৬.২৬৮-২৬৯)

তদুত্তরে ঠাকুর শ্রীহরিদাস নির্ভীকভাবে-নিঃসঙ্কোচে বলিলেন,—

উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়।।
শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু-পক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।।
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে।।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত—১.১৬.২৭৩, ২৭৮, ২৮০, ২৮১)

এই উদার মতবাদ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া, তিনি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শন করাইলেন, যথা,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শত গুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ।।

(নারদীয়ে—)

অর্থ,—নীরবে হরিনাম জপপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপকারী যে শতগুণ শ্রেষ্ঠ—ইহা যুক্তিযুক্ত, কারণ জপকারী কেবল আপনাকেই পবিত্র করেন, আর উচ্চৈঃস্বরে জপকারী আপনাকে ও শ্রোতৃবর্গ—সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

এইরূপে নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অপরাধ-দুষ্ট সঙ্কীর্ণ মতবাদের সহিত সত্যের আলোকোজ্জ্বল নবীন মতের সংঘর্ষণে শ্রীনামের সাধন-পথে পুঞ্জীকৃত অপরাধাদিরূপ আবর্জনা-সকল একে একে বিলুপ্ত হইয়া, জনসাধারণের নিকট উহা আবার সুগম ও সরল হইয়া উঠিতে লাগিল। নামসিদ্ধ ঠাকুর ব্রহ্মহরিদাসের মুখে নামের মুক্ত-মহিমা শ্রবণে বহুলোক তৎপ্রচারিত শ্রীনামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়, হরিদাস ঠাকুরের যশঃ-

সৌরভ তদীয় অজ্ঞাতসারেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অপরাধদুষ্ট সঙ্কীর্ণ মতবাদের উপর নবোদিত মতের বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস—আমরা তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের জমিদার ভবনের সভাগৃহের সহিত বিজড়িত দেখিতে পাই। বিশ্বে এই নবোদিত নাম-মহিমার আত্মবিকাশের ইতিহাসে ইহা একটি পুণ্যতীর্থস্বরূপ চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্যস্থল।

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম তৎকালে একটি বিশেষ সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য-প্রধান স্থলরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় নানা দিগ্ দেশ হইতে বহু জনসমাগম হইত। বাৎসরিক বিংশলক্ষ মুদ্রা আয়ের জমিদার কায়স্থ-কুলপ্রদীপ মহাসম্ভ্রান্ত শ্রীমৎ হিরণ্য দাস ও শ্রীমৎ গোবর্দ্ধন দাস নামক সহোদর ভ্রাতৃযুগল তথায় বাস করিতেন। উক্ত গোবর্দ্ধন দাসের পুত্ররূপে বৈষ্ণব জগদ্বরেণ্য মহাভাগবত শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের আবির্ভাব দ্বারা সে ভবন পরম পবিত্র ও বৈষ্ণবগণের তীর্থস্বরূপ হইয়াছিল। এই জমিদার-বাটির সভাগৃহ বহু বিদ্বন্মণ্ডলী ও সম্মানিত ব্যক্তিদ্বারা সর্বদা পূর্ণ থাকিত। জনসমাজে নবোদিত নাম-মহিমা ব্যাপকভাবে প্রচারের উপযুক্ত এইরূপ একটি জনবহুল প্রসিদ্ধ স্থান, যেন শ্রীনামেরই মঙ্গলময়ী ইচ্ছাতেই নির্বাচিত হইয়াছিল,—যেখানে নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনর্থকর সঙ্কীর্ণ পুরাতন মতবাদের পরাজয়ের ধ্বংসস্তুপের উপর নবীন মতবাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়া, নাম-মহিমার এক গৌরবোজ্জ্বল প্রত্যক্ষ ইতিহাস রচনা করিয়া রাখিবে।

গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ভক্তিমান্ বলরাম আচার্য কোনও সময়ে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া ঠাকুর হরিদাসকে সপ্তগ্রামের সন্নিহিত চাঁদপুর গ্রামে নিজগৃহে লইয়া আসেন। সেখানে কিছুদিন এক নির্জন পর্ণশালায় থাকিয়া হরিদাস ঠাকুর নিজমনে নামকীর্তন এবং আচার্যের ভক্তিতে পরম প্রীত হইয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। এই সময় বালক রঘুনাথ দাস আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে যাইয়া হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ ও কৃপা লাভে পরম কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই মহতের কৃপাই পরবর্তীকালে তাঁহার পক্ষে শ্রীগৌরপাদপদ্ম প্রাপ্তির কারণ হইয়াছিল। হরিদাস ঠাকুরের খ্যাতি তখন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বলরাম আচার্যের গৃহে তাঁহার শুভাগমন কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার লালসায়, তাঁহাকে সপ্তগ্রামের জমিদার বাটীতে একবার লইয়া আসিবার জন্য আচার্যকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। বলরাম আচার্যও তাঁহাকে অনেক মিনতি করিয়া একদিন পরম ভাগ্যবান্ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের ভবনে—তাঁহাদিগের সভাগৃহে লইয়া আসিলেন। ঠাকুর হরিদাসের আগমন-সংবাদে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় বহু জনসমাগম

হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বহু সম্মানিত ব্যক্তি দ্বারা সভাগৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে স্বগৃহে পাইয়া বদান্য ব্রহ্মণ্য শ্রীমান্ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস ভ্রাতৃযুগল অভ্যুত্থান-পূর্বক দুইজনে মিলিত হইয়া ঠাকুরের চরণে পতিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও সমাদর-পূর্বক তাঁহাকে যোগ্য আসনে উপবেশন করাইয়া সভামধ্যে পরম উল্লাসে ঠাকুরের অত্যদ্ভুত গুণাবলীর কীর্তন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। অতঃপর সভায় শ্রীনাম-মহিমা প্রসঙ্গ উঠিলে। হরিদাস ঠাকুর বিনয় পূর্বক প্রথমে সমবেত পণ্ডিতগণকেই উহা বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

শ্রীনামতত্ত্ব ও মাহাত্ম্যাদি তৎকাল পর্যন্তও জগতে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ না থাকায় তখনকার পণ্ডিতসমাজ ও তৎপরিচালিত জনসাধারণের মধ্যে নাম-মহিমা সম্বন্ধে যে, কি প্রকার সঙ্কীর্ণ ধারণা ছিল, তাহাদিগের উক্তি হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং সীমাহীন মুক্ত নাম-মহিমার সঙ্কোচ করণ ও তদ্বিষয়ে 'অর্থবাদ' মননাদিরূপ অপরাধজনক মতবাদ দ্বারা তখন পর্যন্ত যে, নামের সর্বজন সেব্য সুগম সাধন পথ প্রায়শঃ সর্বসাধারণের পক্ষে ব্যাপকভাবে আবরুদ্ধ প্রায় হইয়াই ছিল, ইহাও কতটা অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপে নামাপরাধের কঠিন 'পাড়ন পাতা' জগতের উপর নামবীজ পতিত হইলেও তাহা অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না—যদি এই বেদগোপ্য নবীন মতবাদের অভ্যুদয় দ্বারা শাস্ত্রের সত্যার্থ প্রকাশ-পূর্বক তদ্বিষয়ে জনসমাজকে নূতন আলোক—নব চেতনা প্রদান করা না হইত।

তখন যেমন মুক্তি বা মোক্ষের উপর প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থের সন্ধান পর্যন্ত জগৎ যথার্থরূপে অবগত হয় নাই, সেইরূপ শ্রীনামের প্রেমলভ্য মুক্ত-মহিমা না জানিয়া, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ পাদপদ্মে প্রেমলাভই ভগবন্নামের মুখ্যফল—ইহা অবিদিত থাকায় তৎকালে নামের গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র যাহা,—সেই পাপক্ষয়, সংসার নাশ বা মুক্তি পর্যন্তকেই নামের মুখ্যফল বা পূর্ণপ্রভাব বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য তখনকার পণ্ডিতগণ পর্যন্তও প্রায়শঃ নামের মুক্ত-মহিমাকে উক্ত প্রকার গৌণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া ও অপর বিবিধ প্রকার কল্পিত ব্যাখ্যাদি দ্বারা উহার সঙ্কোচ সাধন-পূর্বক, নামের সর্বোত্তম ও অবাধ সাধন পথে যে নামাপরাধজাল সৃজন করিতেন, তদ্বারা স্বয়ং ও তন্মতাবলম্বী জনসাধারণ উভয়পক্ষই অবরুদ্ধ হইয়া নামের অব্যর্থ ফল লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিতেন।

বহুকাল সঞ্চিত সেই সকল অপরাধজাল অপসারণ করিয়া শ্রীনামের প্রশস্ত সাধন পথ জগতের সমক্ষে বিমুক্ত করিয়া দিবার জন্যই,—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত কৃষ্ণনাম প্রচারের অগ্রদূত ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম হরিদাস, যেন সেই শ্রীভগবানেরই প্রেরণায় আজ এই

জনসভায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীনাম সম্বন্ধে জরাজীর্ণ পুরাতন মতবাদের ধ্বংসস্তুপের উপর বিশ্বে নবোদিত মতবাদের বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আজ এই সপ্তগ্রাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

হরিদাস ঠাকুরের অনুরোধে প্রথমে পণ্ডিতগণের মধ্য হইতেই কেহ কেহ নাম-মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন।

"নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৭৫)

নাম-মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে কেহ বলিলেন, নামের ফলে কেবল পাপক্ষয় পর্যন্ত হইয়া থাকে। তদপেক্ষাও নামের প্রতি আস্থাশীল কোন পণ্ডিত বলিলেন,—কেবল পাঁপক্ষয়ই নয়, নামের ফলে মোক্ষ পর্যন্ত হইতে পারে।—

কেহ বোলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বোলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত--৩.৩.১৭৬)

নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কীর্ণ মতবাদের পরিচায়ক ও কল্পনা প্রসূত নানাপ্রকার কুব্যাখ্যাই চলিতে লাগিল।

(শ্রীভগবন্নামের ফলে 'পাপক্ষয় হয়', 'সংসার মোচন হয়', 'মুক্তি হয়' অথবা 'দুঃখ, বিপদ, নিরয়, রোগ, ভয় তাপ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়'—এইরূপ বলিলেই বা বুঝিলেই যে নাম-মহিমা খর্বকর কুব্যাখ্যা বা কল্পনারূপ নামাপরাধ ঘটিবে, তাহা নহে—যদি এই সকল ফল নামের গৌণ ফল মাত্র—এই উদ্দেশ্য লইয়া বলা বা বুঝা হয়। শাস্ত্রে নামমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই—নামের অখিল পাপোন্মুলত্ব, প্রারব্ধ বিনাশিত্ব, মুক্তিপ্রদত্ত, সর্বদুঃখোপশমত্ব, সর্বব্যাধিবিনাশিত্ব প্রভৃতি ফলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা নামের গৌণফলের কথাই বুঝিতে হইবে, যেহেতু সেই শাস্ত্রেই নামের প্রেমভক্তি প্রাপকত্বরূপ মুখ্য বা প্রধান ফলের কথাও যখন কীর্তিত হইয়াছে, তখন পূর্বোক্ত ফল সকল যে উক্ত মুখ্য ফলেরই অধীন, অর্থাৎ উহার আনুষঙ্গিক বা গৌণফলমাত্র, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অতএব যাঁহারা পাপক্ষয়, মুক্তি প্রভৃতি গৌণফল সকলকেই নামের মুখ্য বা প্রধান ফল মনে করিয়া তদনুরূপ ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ 'নামের ফলে, কেবল পাপক্ষয় মাত্রই হইয়া থাকে 'কিম্বা' মুক্তি পর্যন্ত হইতে পারে'—ইহার অধিক আর কিছুই হয় না'—ইত্যাদি প্রকার যদি স্বকল্পিত কুব্যাখ্যাদি দ্বারা নামের মুক্ত-মহিমার সঙ্কোচ সাধন করা হয় তবে তাহাই 'কল্পনা' নামক 'নামাপরাধ'রূপে গণ্য হইবার যোগ্য হয়।)

তৎশ্রবণে হরিদাস বিশেষ দুঃখ পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—শ্রীনাম সম্বন্ধে এই সকল অপরাধ-দুষ্ট—সঙ্কীর্ণ মতবাদ বিদূরিত করিয়া তৎস্থলে নামের

অসীম মুক্ত-মহিমা সুস্পষ্টরূপে জগতে প্রচারিত না হইলে এই সর্বজন সেব্য—সর্বোত্তম সাধন-উপায়, প্রায়শঃ সকলের নিকট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। যে পরম কারুণিক প্রেমাবতার বেদগোপ্য নাম ও প্রেমধর্ম প্রকাশ ও প্রদান করিয়া, জগতে এক অচিন্ত্য প্রেমযুগের প্রবর্তন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তদীয় কার্যের অনুকূলতার জন্য, তাঁহারই প্রেরণায়, এই সকল অনর্থকর মতবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীক সৈনিকের ন্যায় সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে। তাই তিনি নাম-মহিমা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার সঙ্কীর্ণ মতবাদ শ্রবণ-পূর্বক অবিচলিত ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—পাপনাশ, মুক্তি প্রভৃতি শ্রীনামের অতি তুচ্ছ-গৌণফল মাত্র ইহা নামের যথার্থ মহিমা নহে,—শ্রীভগবন্নামের মুখ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থের উদয় হয়। নামের আনুষঙ্গিক ফলে, অথবা কেবল নামাভাসের ফলেই মুক্তি ও পাপনাশ প্রভৃতি সাধিত হইতে পারে।

হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।।
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৭৭, ১৭৯)

এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীনাম কৌমুদীধৃত "অহং সংহর-দখিলং—" ইত্যাদি শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া সভাস্থিত পণ্ডিতগণকে উহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন,—

'এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।'—

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৮১)

তদুত্তরে তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন, আপনিই উহার ব্যাখ্যা করুন,—

"সভে কহে তুমি কহ অর্থ-বিবরণ।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৮১)

তখন ঠাকুর হরিদাস বলিতে লাগিলেন,—সূর্যোদয় নাম-মাহাত্ম্যের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যেমন সূর্যের উদয়ারম্ভে ও উদয়ে দ্বিবিধ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়,—প্রথমটি উহার গৌণ প্রভাব বা আনুষঙ্গিক ফল এবং দ্বিতীয়টি উহার মুখ্য প্রভাব বা প্রধান ফল, সেই প্রকার শ্রীনাম-সূর্যেরও উদয়ারম্ভে—উহার গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল এবং উদয়ে—মুখ্যফল লাভ হইয়া থাকে। সূর্য সম্পূর্ণ উদয় না হইতেই, উদয়ের আরম্ভে বা উদয়াভাসেই অন্ধকার অপগত হইয়া চোর, প্রেত ও রাক্ষসাদি নিশাচরগণ হইতে ভয় বিদূরিত হইয়া যায়, ইহা যেমন সূর্যোদয়ের আনুষঙ্গিক বা গৌণফল, এবং সম্যক্ উদয়ে

জগৎ আলোকিত হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি বিবিধ মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ হইয়া থাকে, —ইহাই যেমন সূর্য্যোদয়ের মুখ্য বা প্রধান ফল ; অর্থাৎ মুখ্যফল উৎপন্ন হইলে গৌণফল সকল যেমন তাহার আনুষঙ্গিকরূপেই তদন্তর্ভূক্ত বা তদাধীন থাকে, সেইরূপ নামোদয় আরম্ভেই পাপাদির ক্ষয় ও মুক্তি প্রভৃতি উহার আনুষঙ্গিক বা গৌণফলের এবং নামোদয়ে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রেমভক্তির উদয়ঃ ' মুখ্যফলের প্রকাশ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ শ্রীনামোদয়ের প্রধান ফল প্রেমভক্তি লাভ হইলে—'মুক্তি', 'পাপনাশ' প্রভৃতি গৌণফল-সকল পূর্ব্বেই আনুষঙ্গিকরূপে উহার অন্তর্ভূক্ত বা অধীন হইয়াই অবস্থান করে অধিক কথা কি ? মুক্তিও নামের অতিতুচ্ছ—গৌণফল মাত্র। উহার জন্য নামেরও প্রয়োজন হয় না,—নামাভাসের ফলেই সেই মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য ভক্তিসুখের নিকট মুক্তি-সুখ এতই তুচ্ছ যে, শ্রীভগবান্ 'মুক্তি' দিতে চাহিলেও, প্রেমভক্তির অধিকারী—ভক্তগণ উহা লইতে চাহেন না। অতএব যে নামের মুখ্যফলে প্রেমোদয় ও অতিতুচ্ছ গৌণফলে মুক্তি ও পাপনাশ প্রভৃতি হইয়া থাকে, এতাদৃশ নামের মহামহিমাকে যদি তাহার তুচ্ছ—গৌণফলেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, অর্থাৎ নামের ফলে 'কেবল পাপক্ষয় মাত্রই হয়' কিম্বা 'মুক্তি' পর্যন্তই হইয়া থাকে'—যদি এই প্রকার কুব্যাখ্যাদি করা হয়, তাহা হইলে নামের যাহা যথার্থ মহিমা, তাহার খর্বতা সাধন করা হয় নাকি ?

হরিদাস কহেন—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়।।
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ।।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।।
'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৮২-১৮৫)

সভা সমক্ষে তিনি এইরূপ নির্ভীকতার সহিত পূর্ব্বোক্ত অপরাধদুষ্ট—সঙ্কীর্ণ কুব্যাখ্যাদি খণ্ডনপূর্বক, স্পষ্টরূপে শ্রীনামের যথার্থ মহিমা বর্ণন করিয়া, পরিশেষে কেবল নামাভাস হইতেই 'মুক্তি' হয় এবং 'ভগবৎ সেবাপ্রাপ্ত ভক্তগণের নিকট যে, মুক্তি সুখও পরিত্যাজ্য বিষয়'—তদীয় এই উক্তিদ্বয়ের প্রমাণস্বরূপ, তিনি যথাক্রমে নিম্নোদ্ধৃত ভাগবতীয় শ্লোক দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন ;—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।। (শ্রীমদ্ভাগবত—৬.২.৪৯)

অর্থ,—মুমূর্ষকালে অবশচিত্তে পুত্রের নামে ভগবন্নাম গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ নামাভাসেই যখন অজামিল মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্বক হরিনাম গ্রহণের ফল তদপেক্ষা অধিক,—ইহা আর বলিবারই বা কি প্রয়োজন ?

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত—৩.২৯.১১)

অর্থ,—কপিলদেব কহিলেন মাতঃ ! আমার সেবাভিলাষ ভিন্ন শুদ্ধভক্তগণ, সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য), সারূপ্য (আমার সমান রূপ), সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান) এবং একত্ব (আমার সহিত মিলিত) এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না ।

হরিদাস ঠাকুরের শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সুসত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া বহু লোক শ্রীনাম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অপরাধজনক ভ্রান্তিময় সঙ্কীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগপূর্বক তন্মতাবলম্বী হইতে আরম্ভ করিলেও, তখন পর্যন্ত নাম-মাহাত্ম্যে সঙ্কীর্ণচেতা অর্থবাদাদি মননকারী নামাপরাধী ব্যক্তির অভাব ছিল না, যাহারা নামের যথার্থ মহিমা শ্রবণ করিলেই উহাকে অতিস্তুতি বা অতিশয়োক্তি মননপূর্বক এই অপরাধ হইতে উৎপন্ন অপরাপর অপরাধ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া,—এইরূপে নামের অব্যর্থ ফলাফল হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিত। হরিদাস ঠাকুর বর্ণিত নামের মুক্ত-মহিমা শ্রবণে উহা অসহ্য হওয়ায়, সেই বিরুদ্ধবাদিগণের পক্ষ হইতে গোপাল চক্রবর্তী নামক কোন ব্রাহ্মণ হরিদাস ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া সরোষ বচনে বলিয়া উঠিলেন, হে পণ্ডিতগণ ! এই ভাবুকের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। কোটি জন্ম ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করিয়াও যে মুক্তিকে লাভ করা যায় না,—এই ব্যক্তি বলে কিনা,—কেবল নামাভাসের ফলেই সেই মুক্তি লভ্য হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ।।
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৮১-১৮২)

তৎশ্রবণে হরিদাস ঠাকুর ব্যথিত হইলেও, তিনি নম্রস্বরে বলিলেন, 'ইহাতে সংশয় করিতেছ কেন ? ভক্তিসুখের তুলনায় মুক্তিসুখ যে অতিশয় নগণ্য, ইহার প্রমাণ শাস্ত্রেই রহিয়াছে,—

"হরিদাস কহে কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে—নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়।।

ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না স্পর্শয়"।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৮৩-১৮৪)

এই কথা বলিয়া তিনি ব্রহ্মানন্দ হইতেও ভক্তিসুখের আধিক্যের বিষয়ে নিম্নোক্ত শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিলেন, যথা—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্দিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো।।

(হরিভক্তিসুধোদয়—১৪.৩৬)

অর্থাৎ,—প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিয়াছিলেন, হে জগদ্‌গুরো ! আমি আপনার সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমার সম্বন্ধে অন্য সুখের কথা দূরে থাকুক,—ব্রহ্মানন্দও এখন গোষ্পদের ন্যায় অনুমিত হইতেছে।

তৎশ্রবণেও সেই বিপ্র নিরস্ত হইলেন না, বরং অধিকতর ক্রোধে জ্ঞান-শূন্য হইয়া, হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়া উঠিলেন,—যদি নামাভাসে মুক্তি,—ইহা সত্য না হয়, তবে তুমি প্রতিজ্ঞা কর,—তোমার নাক কাটা যাইবে।"

"বিপ্র কহে—নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৮৩)

পূর্ববৎ ধীরতা ও নম্রতার সহিতই বিপ্রের এই আহ্বান গ্রহণ করিয়া—হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়,—তবে আমি এই সত্য করিতেছি যে, যেন আমার নাক কাটা যায়।"

"হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি—এই সুনিশ্চয়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৮৪)

তিনি বিপ্রের অভিপ্রায় অনুসারে, নিজ বাক্য অসত্য হইলে, তাহার ফল ভোগ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ; কিন্তু বিপ্রের কথা অসত্য হইলে, তাঁহাকে তদ্রূপ কোন শাস্তি গ্রহণ করিবার জন্য সত্য করিতে বলিলেন না,—এইরূপ ক্ষমাশীলতাই সাধু-চরিত্রের মহত্ব। ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞজনের দোষ গ্রহণ করেন না। আবার ভগবানের স্বভাব—ভক্তের অপমান সহ্য করেন না।

উক্ত ঘটনায় সভাস্থিত বহুলোক হাহাকার করিয়া উঠিলেন ও গোপাল চক্রবর্তীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বলরাম পুরোহিত তাঁহাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, —"তুমি পণ্ডিতাভিমানী মুর্খ।" ভক্তির মহিমা কি বুঝিবে ! তুমি মহাভক্ত হরিদাস

ঠাকুরকে অপমান করিয়াছ,—তোমার আর মঙ্গল নাই। অচিরেই তোমার সর্বনাশ ঘটিবে !

এই গোপাল চক্রবর্তী জমিদার-গৃহে প্রধান আরিন্দার কার্য করিতেন। গৌড়ের বাদশাসের নিকট বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা খাজনা আদায় দিবার দায়িত্ব পূর্ণভাবে তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। গৃহস্বামী হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস উক্ত ঘটনায় মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়া গোপাল চক্রবর্তীকে বহু ধিক্কার প্রদানপূর্বক সেই কার্য হইতে বরখাস্ত করিয়া দিয়া, তাঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং উভয় ভ্রাতা হরিদাস ঠাকুরের চরণে পতিত হইয়া নানাপ্রকার দৈন্যোক্তি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'ইহাতে তোমাদের কাহারো দোষ নাই। দৈন্য পরিত্যাগ কর। ইহা দৈবের ঘটনা। এই ব্রাহ্মণ অজ্ঞ সুতরাং ইহারও দোষ নাই। তবে ইহার মতি তর্কনিষ্ঠ। নামের মহিমা তর্কের গোচর নহে ; অতএব এই সমস্ত তত্ত্ব তাহার পক্ষে না জানাই সম্ভব। তোমরা গৃহে গমন কর। কৃষ্ণ সকলের মঙ্গল করুন। আমার সম্বন্ধে যেন কাহারও কোন দুঃখ না হয়।

"যাহ ঘর কৃষ্ণ করুন কুশল সভার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউ কাহার।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.১৯৪)

এইরূপ সকলকে সান্ত্বনা দান করিয়া তিনি বলরাম আচার্যের গৃহে চলিয়া আসিলেন।

হরিদাস ঠাকুর যদিও এই বিপ্রের দোষ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ভগবান্ ভক্তের অবমাননা সহ্য করিলেন না। তিনি উক্ত অপরাধের ফল এবং শ্রীহরিদাস বর্ণিত নামমাহাত্ম্যের সত্যতা, জনসাধারণকে অনতিবিলম্বে প্রত্যক্ষ করাইলেন। তিন দিনের মধ্যে সেই রূপবান্ গোপাল চক্রবর্তী দারুণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সমুন্নত সুন্দর নাসিকা ক্ষত হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বলোক চমৎকৃত হইল এবং শ্রীনামমাহাত্ম্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া ও তৎসহ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা জানিয়া, তাঁহার বহু প্রশংসা করিতে লাগিল।

"তিন দিন ভিতরে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল।।
"দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— ৩.৩.১৯৬, ১৯৮)

বিপ্রের এই দুঃখের কথা শুনিয়া ঠাকুর শ্রীহরিদাস দুঃখিত অন্তরে বলরাম আচার্যের গৃহ হইতে শান্তিপুরে আগমন করিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের চরণে প্রণত

হইয়া তৎসন্নিধানে—গঙ্গাতীরে নির্জন গোফায় থাকিয়া ভজন করিতে ও অবসরকালে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

অপরাধদুষ্ট জরাজীর্ণ মতবাদের উপর এইরূপে নবরূপে প্রবর্তিত নাম-মাহাত্ম্যের বিজয়কেতন বিপুল জনসঙ্ঘের সমক্ষে আবার বিশ্বে উড্ডীন হইল। শ্রীনামের সাধন পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক স্বরূপ যাহা,—সেই নামাপরাধ বিষয়ে অচৈতন্য জীবজগৎ আবার সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রীনাম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ব্যক্তিগণের পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা অপর ধর্মাদি ও শুভক্রিয়াদিকে নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, নামকে 'তদপেক্ষা' হীন বুদ্ধি করিয়া থাকেন,—তাঁহাদিগের পক্ষে নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে 'অর্থবাদ' বা 'স্তুতিমাত্র' মননরূপ—এই সম্ভাব্য অপরাধ ঘটিলে, উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, তাহা হইতে কেবল যে, 'অপ্রীতি' ও 'কল্পনা' প্রভৃতি পূর্বোক্ত নামাপরাধ কয়টিই উৎপন্ন হইতে পারে তাহা নহে,—স্থল-বিশেষে উহা আরও বিবর্দ্ধিত হইয়া, এমন কি সাধুনিন্দারূপ মহদপরাধ বা সর্বপ্রধান নামাপরাধ যাহা,—সেই প্রধানতম নামাপরাধে পর্যন্ত পর্যবসিত হইতে পারে,—পূর্বোক্ত ঘটনাই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

অতঃপর সেই বেদগোপ্য পরতত্ত্বসীমা—স্বর্ণকান্তি[১] স্বয়ং মহাপ্রভু[২] শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক বেদগুহ্য পরমধর্মের সীমা যাহা—সেই নাম ও প্রেম-ধর্মের জগতে মহাপ্রকাশ, মহাপ্রচার ও মহাপ্রদান আরম্ভ হইল। তিনিই বিশ্বে পূর্ণাঙ্গ প্রেমধর্মের আবিষ্কারের ন্যায়, শ্রীনামতত্ত্বাদিরও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ করিলেন। তদীয় মহান্ চরিত্র আলোচনা করিলে ইহাও সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, শ্রীনামের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ করিয়াই তিনি জীবের পরম কল্যাণ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই,—নামের সর্বজন্ সেব্য—পরম মঙ্গলময় সাধনপথের একমাত্র মহাবিঘ্ন স্বরূপ যাহা,—সেই 'নামাপরাধ' সম্বন্ধেও অচেতন জীবজগৎকে বিশেষভাবে সচেতন করাইলেন।

নাম-মহিমা বিষয়ে 'অর্থবাদ' রূপ সম্ভাব্য অপরাধ হইতে জনসমাজকে বিশেষভাবে বিরত থাকিবার জন্য, তিনি নিজ আচরণ দ্বারাও এ'বিষয়ে শিক্ষা দিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। তৎকর্তৃক একদা নাম-মহিমা বর্ণনকালে কোন এক তর্কনিষ্ঠ উদ্ধত ছাত্র কর্তৃক 'উহা স্তুতিমাত্র' এইরূপ উক্ত হওয়ায়, তৎশ্রবণে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও কুপিত হইয়া, সেই নামাপরাধীর মুখ-দর্শন পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলেন এবং সঙ্গীগণ সহ যাইয়া গঙ্গাস্নান পূর্বক তথায় পুনর্বার সসম্ভ্রমে শ্রীনাম-মহিমা বর্ণন করিয়া,—সেই অপরাধজনক বাক্য শ্রবণের ও অপরাধের যাহা প্রায়শ্চিত্ত,-তাহাই স্বীয় আচরণ দ্বারা, এইরূপে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

১। "—রুক্মবর্ণং"। (মুণ্ডক-৩.১.৩) ২। "মহান্‌প্রভু—" (শ্বেতাশ্বঃ-৩.১২)

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' কৈল।।
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সভে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ।।
সগনে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১৭.৬৮-৭০)

পূর্বে যে নামাপরাধের কথা শাস্ত্রে দুই একটি অজ্ঞাত প্রায় শ্লোক মাত্রেই নিবদ্ধ ছিল,—যাহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায়, যে নামাপরাধরূপ মহানাগ, সর্বসাধারণের অজ্ঞাতসারে—সংসার কারাগারের মহাপাশরূপে পরিণত হইয়া জীবের মহানর্থ বিস্তার করিতেছিল,—প্রখর আলোকপাতে জীবের পরমার্থ পথের সেই প্রধান শত্রুকে প্রদর্শন করাইয়া, তিনি জীবজগতের মহোপকার সাধন করিলেন। যদিও তাঁহার প্রকটকালে—সর্বজীব উদ্ধারের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনের দিনে,—সেই সমষ্টির মহা অভিযানে, নামাপরাধেরও বিচার থাকে নাই, তথাপি তাঁহার অপ্রকটকালে অপরাধের বিচার থাকিবে বলিয়া, তিনি তদীয় লীলাকালেও তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য জীবকে নানাভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। অন্যের কথা কি ? কেবল জীব শিক্ষার নিমিত্তই,—সর্বজগৎবন্দিতা নিজ জননীদেবীকেও অপরাধের অভিনয় করাইয়া, তৎপ্রতিকার সাধনে বাধ্য করাইয়াছেন।[1]

তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিষয়সকলের আলোচনা হইতে বুঝিলাম—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদীয় নিত্যপরিকরগণ, প্রেমধর্মের ন্যায়, সেই প্রেমসম্পদ লাভের পরমোপায় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধেও এক অভিনব আলোক সম্পাতে কলিঘোর তিমিরাবৃত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া, তদ্বিষয়ে অচৈতন্য জীবসকলকে সর্ববিধ উপায়ে সচৈতন্য হইবার পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। পরতত্ত্বের সেই সীমাপ্রাপ্ত অবস্থায় স্বয়ম্ভগবান্ জগতে আবির্ভূত হইয়া, শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম উদ্ঘাটনপূর্বক স্বয়ং আচরণ দ্বারা, সাধন জগতে শ্রীনামকীর্তন—নামাশ্রয়েরই সর্বোপরি বিজয়বার্তা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন শ্রীভগবন্নামের তুল্য যে, অপর কোন ধর্ম বা শুভকর্মাদি নাই—অপর কোন সাধন ভজন নাই, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই নিম্নোক্ত সহজ পন্থা দ্বারাই তাহা নির্ধারিত হইতে পারে।

অন্যান্য শুভক্রিয়াদির স্পষ্টতঃ নামোল্লেখ করিয়া সে সকল যে, ভগবন্নামের তুল্য হইবার যোগ্য নহে,—এই প্রকারে সর্বশুভক্রিয়াদি হইতে শ্রীনামের সর্বোৎকর্ষতার কথা

১। "আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১৭)

শতমুখে শাস্ত্রসকল বহুস্থলেই কীর্তন করিয়াছেন।[১] বাহুল্যবোধে তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে,—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য, প্রয়াগে গঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং, গোবিন্দকীর্ত্তেন সমং শতাংশৈঃ।।

(হরিভক্তিবিলাস ধৃত—১১.৩৮৫)

অর্থ,—সূর্যগ্রহণে কোটি গাভীদান, প্রয়াগ-গঙ্গাজলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ কিম্বা পর্বত পরিমিত সুবর্ণ দান—এ' সকল কিছুই গোবিন্দ-নাম কীর্তনের শতাংশের এক অংশেরও সমান নহে।

বাজপেয়সহস্রাণাং নিত্যং ফলমভীপ্সতি।
প্রাতরুত্থায় ভুপাল কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্।।

[হরিভক্তিবিলাস ধৃত (১১-৩৮৭) গারুড়ে শ্রীশৌনকাম্বরীষ-সংবাদে]

অর্থ,—হে রাজন ! যদি প্রত্যহ সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফলাভিলাষ কর, তাহা হইলে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গোবিন্দ-নাম কীর্তন কর।

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্।।

[হরিভক্তিবিলাস ধৃত (১১-৪১৬) গারুড়ে]

অর্থ,—হে নরাধিপ ! আত্মানাত্ম বিবেকাদি জ্ঞান, কিম্বা অষ্টাঙ্গাদি যোগে কি করিবে ? রাজেন্দ্র ! যদি মুক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে গোবিন্দ-নাম কীর্তন কর।

তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সর্ব-ধর্ম-কর্মাদির বিধায়ক শাস্ত্রসকলই দান, ব্রত, তপ, তীর্থ, ত্যাগ ও যজ্ঞাদি সর্ব শুভকর্মের ও জ্ঞান, যোগাদি ধর্মের উল্লেখ করিয়া, তৎসমুদয়র কিছুই যে শ্রেষ্ঠতায় ভগবন্নামের সহিত কোন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না,—এ'কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।[২] হয়ত' বা কোন স্থলে উক্ত ধর্ম বা শুভকর্মাদির কোন একটি বিষয়ের উল্লেখপূর্বক, তদনুরূপ অধিকারীকে সেই সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য, "ইহার সমান বা ইহা হইতে উত্তম আর কিছু নাই"—ইত্যাদি প্রকার বাক্যও শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু স্পষ্টতঃ ভগবন্নামের উল্লেখ করিয়া, সেই নাম হইতে অপর কোন শুভক্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ কিম্বা নামের সমান,—এ'রূপ বিপরীত উক্তি যে, শাস্ত্রের কোন স্থলেই পরিদৃষ্ট হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা

১। এ'বিষয়ে অবতরণিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

২। যত যোগ যাগের সাধন। যত ভজন পূজন আরাধন।।
নাম সাগরের অগাধ জলে বুদবুদ যেমন।
যে জন নাম সাগরে মগ্ন তার কি সাধন আরো চাই ? —মহাজন পদ।

নিখিল ধর্ম ও শুভকর্মাদি অপেক্ষা শ্রীনামেরই সর্বশ্রেষ্ঠতার সহজ ও শাস্ত্রসম্মত সুস্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে ?

বিশেষত কলিযুগের যুগধর্মরূপে নিরূপিত হওয়ায়, বর্তমান যুগে সাধন-বিষয়ে শ্রীনামকীর্তনেরই মুখ্যত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইবার যোগ্য। সুতরাং হরিনামবর্জিত কোন শুভক্রিয়াদি বা কোন সাধন ভজন, শাস্ত্রকর্তৃক এই যুগে যে ব্যবস্থাপিত হয় নাই,—'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'—এই ত্রিসত্য নিষেধোক্তিই তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ।

যদি কাহারও পক্ষে শাস্ত্র বিহিত দান, ব্রত, তপ, ত্যাগ ও তীর্থাদি শুভক্রিয়া কিম্বা অপর কোন ধর্মাদির অনুষ্ঠান করিতেও হয়, তবে শ্রীনামকেই অগ্রবর্তী করিয়া,—নামেরই অনুবর্তী হইয়া, গৌণভাবে সেই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা যথোপযুক্ত ফল লভ্য হইতে পারে, কিন্তু নামের সম্পর্ক শূন্য হইয়া, অপর কোন শুভক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের এই যুগে সার্থকতা নাই,—"নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"—এই শাস্ত্রোক্তির ইহাই প্রকৃষ্ট তাৎপর্য। কলির প্রভাববশতঃ—মন্ত্র, তন্ত্র, কাল, পাত্রাদি সকল বিষয়েই দোষ সংস্পৃষ্ট হওয়ায়, বিশুদ্ধির অভাববশতঃ কোন শুভক্রিয়াদি সুফলপ্রসু হইতে পারে না,—যদি শ্রীহরিনাম উহাদিগকে নিজ অমৃতময় স্পর্শ দ্বারা সঞ্জীবিত বা নিশ্ছিদ্র না করেন,—এ'কথা শাস্ত্রেরই সুস্পষ্ট নির্দেশ।

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সঙ্কীর্ত্তনং তব।।

(শ্রীমদ্ভাগবত—৮.২৩.১৬)

অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদিদ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্য্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্যাদিতে অশৌচ ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র না ন্যূনতা ঘটে, (হে হরে !) তোমার নামকীর্তন তৎসমুদয়ের ন্যূনতা পূরণ করিয়া দিয়া, তদপেক্ষাও অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

[টীকাঃ—মন্ত্রতঃ স্বরাদি ভ্রংশেন, তন্ত্রতঃ ব্যুৎক্রমাদিনা। দেশতঃ কালতশ্চ অর্হতঃ পাত্রতঃ অশৌচাদিনা। বস্তুত দক্ষিণাদিনা। যচ্ছিদ্রং ন্যূনং তৎ সর্ব্বং তব নামসংকীর্ত্তনমেব নিশ্ছিদ্রং করোতি, রিক্তং পুরয়তি। অধিক ফলঞ্চ জনয়তীত্যর্থ।—শ্রীসনাতন]

অতএব যাঁহার সম্পর্ক ব্যতীত সকল শুভক্রিয়াদি কলিপ্রভাবে পঙ্গুবৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে,—সেই শ্রীহরিনামকে মুখ্যভাবে আশ্রয় না করিয়া, কলিযুগে অপর শুভক্রিয়াদি দ্বারা কোন ব্যক্তি সুফল লাভের আশা করিতে পারেন ? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—হরিপরায়ণ ব্যক্তিই কেবল হরিনাম আশ্রয় করিয়া, কলির বাধা অতিক্রম পূর্বক কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন,—অপরে নহে।

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্‌।।

[হরিভক্তিবিলাস ধৃত (১১-৩৬৬) বৃহন্নারদীয়ে কলিধর্ম্ম-প্রসঙ্গে]

অর্থ,—যে সকল ব্যক্তি ঘোর কলিযুগে হরিনামপরায়ণ, তাঁহাদিগের সকল কার্য সফলতা লাভ করিয়া থাকে এবং কলি তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বাধা দানে সমর্থ হয় না।

প্রেমভক্তিই ভগবন্নামের মুখ্যফল হইলেও, অপর সকল ধর্ম—সকল শুভক্রিয়াদির পূর্ণফল যাহা—সেই সমস্ত ফলই গৌণফলরূপে যে নামে নিহিত রহিয়াছে—সেই শ্রীহরিনামের আশ্রয় লাভ করা ভিন্ন কলিযুগে পরমার্থ-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের পক্ষে অপর কিই বা অবলম্বনীয় থাকিতে পারে ? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

দানব্রত-তপস্তীর্থ-ক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্ম বস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু।।

[হরিভক্তিবিলাস ধৃত (১১-৩৯৮,৩৯৯) স্কান্দে]

অর্থ,—দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থাদিতে, কিম্বা দেবতা ও সাধুসেবায়, অথবা রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং আধ্যাত্মবস্তু বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানে যে সকল সর্বপাপহারিণী ও সর্বশুভদায়িনী-শক্তি নিহিত রহিয়াছে, সেই প্রত্যেক শুভক্রিয়াদির সমস্ত শক্তি আকর্ষণপূর্বক, শ্রীহরি নিজ নামে স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীহরিনামের আনুষঙ্গিক ফলেই তৎসমুদয়ের পূর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধিক কথা কি,—নামী ও নামরূপ অভিন্ন ভগবদ্বস্তুর সর্বাশ্রয়তা ও সর্বোৎকর্ষতা অপর প্রমাণান্তরের অপেক্ষা না করিয়াও স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত যে কোন শুভক্রিয়াদির প্রথমে,—আচমনে শ্রীবিষ্ণুনাম গ্রহণ, যে কোন দেবতার অর্চনে—শালগ্রামরূপী শ্রীবিষ্ণুর আরাধন এবং পরিশেষে—কার্যাবসানে ও জীবনাবসানে—শ্রীহরিনাম-কীর্তন প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীনামের মুখ্যফল সম্বন্ধেও আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেবল নাম-সঙ্কীর্তনের আনুষঙ্গিক ফলেই পাপাদি সর্বানর্থের নিবৃত্তি হইয়া মুখ্যফলে প্রেমভক্তি ও তৎকারণ সাধনভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে,—

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৮.২২)

যদিও সাধারণ নিয়মে মহৎকৃপাকেই প্রেমভক্তি লাভের মূল কারণ করিয়া নববিধ ভক্ত্যঙ্গের যে কোন অঙ্গের আশ্রয় করিলেই যথাক্রমে সাধনভক্তির পর ভাবভক্তি ও

তৎপরে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের বৈশিষ্ট্য নিবন্ধন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক বিশ্বব্যাপি সঞ্চারিত মহামহৎকৃপাই প্রায়শঃ ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছামাত্রেই শ্রীনামগ্রহণের হেতু হইয়া, এইরূপে কেবল সেই সর্বাপেক্ষা সুলভ ও সহজ সাধন নামকীর্তন হইতেই এই যুগে সাধনভক্তির বিকাশ হইয়া, শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় হইবার রীতি ; সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর প্রকটিত বর্তমান কলিযুগে তৎপ্রদত্ত শ্রীনামই প্রেমলাভের একমাত্র উপায় হইতেছেন। সেই নামই প্রেমের কারণস্বরূপ অপরাপর প্রয়োজনীয় ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গের উদ্গম করাইয়া থাকেন বলিয়া, নামই হইতেছেন ভজনাঙ্গ সকলের 'অঙ্গী' বা সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ এবং সাধনভক্তি সেই নামেরই অঙ্গ বা কার্য। অতএব বর্তমান যুগে শ্রীনামই সমস্ত ভজনাঙ্গের কারণ বা অঙ্গীস্বরূপ হওয়ায় শ্রীনামকীর্তনই তৎসমুদয়ের মধ্যেও উৎকর্ষতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন"—এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি দ্বারাও সে কথা পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে। এইজন্য কেবল অন্য শুভক্রিয়াদি বিষয়েই নহে—অপর ভক্ত্যঙ্গ বা সাধনাঙ্গকেও নামকীর্তনের সমান বলিয়া মনে করায় অনর্থের সম্ভাবনা রহিয়াছে ; তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্বভাবে—সর্বোৎকর্ষতার সহিত বিরাজিত—এতাদৃশ ভগবন্নামের সহিত উক্ত শুভক্রিয়াদিকে সমান মনে করাই যখন নামাপরাধ, তখন সেই নামাপেক্ষা অপর শুভক্রিয়াদিকে অধিক মনে করা যে, অধিকতর অপরাধজনক, একথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তাই দেখা যায়, শ্রীগৌর-পদারবিন্দের নিত্যভৃঙ্গগণের গুঞ্জনে এবং অপর মহানুভব ভক্তগণের বর্ণনেও সেই শ্রীনামের সর্বোৎকর্ষতার সর্বোপরি বিজয়বার্তা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ তদীয় বৃহৎভাগবতামৃতের বহুস্থলে অপর ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে শ্রীনামকীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষতা বা প্রাধান্য-সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত নিজধর্ম ধ্যান পূজাদি যত্নম্ (দুঃখম্)।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।। (বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—১.১.৯)

অর্থ,—যিনি বর্ণাশ্রমীদিগের আচরণীয় ধর্মকর্মাদির, কিম্বা ভক্তি-পথাশ্রিতগণের স্মরণাদিরূপ মনোনিগ্রহের ও অর্চনাদি নিমিত্ত বিশুদ্ধ পূজোপকরণাদি সংগ্রহের ক্লেশ নিবারণ করিয়াছেন, যিনি কোনরূপে একবার মাত্র গৃহীত হইলে প্রাণীমাত্রের মুক্তিপ্রদ হয়েন, যিনি আমার পক্ষে একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, জীবাতু ও পরমভূষণ-স্বরূপ,— সেই পরমানন্দময় কৃষ্ণনাম সর্বোৎকর্ষতার সহিত জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করুন।

কেবল স্মরণ বা অর্চনাঙ্গ হইতেই নহে—ভক্তি-শাস্ত্রাদি ও ভগবানের গুণলীলাদি অপর নানাবিধ কীর্তন হইতেও শ্রীভগবন্নামকীর্তনের পরমোৎকর্ষতা উল্লেখ করিয়া পরিশেষে উহা যে, সমস্ত ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম,—এ'কথাও পরম উল্লাসভরে কীর্তন করিয়াছেন ;—

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু
তন্নাম-সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ।। (বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—২.৩.১৫৮)

অর্থ,—বেদপুরাণাদি পাঠ, কথা, গান, স্তুতি ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার কীর্তন মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তনই প্রধান, কারণ নামকীর্তন ত্বরায় প্রেমসম্পদ উৎপাদনে সমর্থ। অতএব উহাকে ভক্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতমরূপে পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন।

এমন কি নামী বা শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতেও সহজলভ্যতায় ও করুণায় শ্রীনামের শ্রেষ্ঠত্ব যে, স্বয়ং শ্রীনামীরই অনুমোদিত, ইহা উক্ত গ্রন্থে গোপকুমারের প্রতি বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণের উক্তিতেও অভিব্যক্ত হইয়াছে,—

শ্রীমন্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ং।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং ন হি।।

(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—২.৩.১৮৫)

অর্থ,—শ্রীমৎ নাম প্রভু নারায়ণের শ্রীমূর্তি (অর্থাৎ স্বরূপ) অপেক্ষাও অতি প্রিয় ; জগতের হিতকর, সুখে উপাস্য ও সরস ; অতএব সেই নামের সমান আর কিছুই নাই।

টীকা—"অতঃ শ্রীভগবন্নাম সংকীর্ত্তনমেবাস্মাভির্নিতরাং প্রশস্যত ইত্যাহুঃ—শ্রীমদিতি। সর্ব্বশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তং সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বেষ্বেব নিজমহিমভরেণ প্রকাশমানত্বাৎ, অতঃ শ্রীমুর্ত্তের্নিজ বিগ্রহাদপি সকাশাদস্য প্রভোঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য ভগবতোঽত্যন্ত প্রিয়ং "ন তথা মে প্রিয়তম—" (শ্রীভাগবত ১১.১৪.১৪) ইত্যাদৌ নিজ শ্রীমূর্ত্তেঃ সকাশাদপ্যন্যেষাং শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনাৎ, ন তু কুত্রাপি নাম্নঃ সকাশাৎ শ্রীমত্ত্বমেব বিবৃণ্বন্তোঽতি প্রিয়ত্বে হেতুমাহুঃ,—জগতো হিতমধিকার্য্যনপেক্ষয়া কথঞ্চিৎ কেনাপীন্দ্রিয়েন সেবনত্ব এব, সর্ব্বলোকোপকারিত্বাৎ, যতঃ সুখেনোপাস্যং সেব্যং, জিহ্বাগ্রমাত্রেণৈব সেবনাৎ। যতঃ সরসং কোমলং মধুরাক্ষরময়ত্বাৎ, সচ্চিদানন্দ রসময়ত্বাদ্বা। যদ্বা রসৈরশেষৈরেব সহ বর্ত্তমানঃ শৃঙ্গারাদি নবরসেষু ভক্তিরসে প্রেমরসে চ, তথা বিরহ-সঙ্গময়োশ্চ পরিস্ফুরণাৎ। যদ্বা রসো রাগস্তৎ সহিতং অব্যভি-চারিত্বেনাবশ্যমেবাশু-শ্রীভগবৎপ্রেম সম্পাদনাৎ, যদ্বা যস্মিন্ স্বসেবকানাং সর্ব্বেষাং বা জনানামনুরাগ জনকত্বাৎ। যদ্বা, রসো বীর্য্যবিশেষঃ পরমশক্তিমত্ত্বাৎ, যদ্বা গুণবিশেষঃ

অখিল দীনজন নিস্তারকত্বাৎ। যদ্বা সুখবিশেষঃ ঘনসুখময়ত্বাৎ, মাধুর্য বিশেষঃ পরম মধুরত্বাদিতি দিক্। যথোক্তং—'মধুর মধুর' ইত্যাদি। অতস্তস্য নাম্ন এব সমং তত্তুল্যমন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিরুপমমিত্যর্থঃ। ১৮৪

অর্থঃ—বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ বলিতেছেন,—শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্তনকেই আমরা সর্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকি। শ্রীনামের এই প্রশংসা বিশেষের হেতু বলিতেছেন,—শ্রীমৎ অর্থাৎ অতিশয় শোভা সম্পত্তিশালী, সদা সর্বত্র সকলের নিকট নিজ মহিমায় প্রকাশমান ; এইজন্য ভগবানের নাম, প্রভু বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীমূর্তি অর্থাৎ নিজ বিগ্রহ (স্বরূপ) হইতেও অত্যধিক প্রিয়। "ন তথা মে প্রিয়তমঃ"—(শ্রীভাগবত—১১.১৪.১১) ইত্যাদি উক্তি দ্বারা নিজ শ্রীমূর্তি হইতেও অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব (অর্থাৎ ভক্তের প্রিয়ত্ব) প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও নিজ নামের অপেক্ষা কাহারও শ্রেষ্ঠতা বলা হয় নাই। নিজ শ্রীমূর্তি অপেক্ষা নিজ নামের অতি প্রিয়ত্বের হেতু বলা হইতেছে এই যে,—শ্রীনাম অধিকারীর অপেক্ষা না করিয়া, যে কোনরূপে কথঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবিত হইয়াই সর্বলোকের উপকারক হয়েন বলিয়াই, শ্রীনাম জগতের হিতকারী। শ্রীনাম, সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্র স্পন্দন দ্বারাই সেব্য হয়েন। আরও বলি, শ্রীনাম সরস অর্থাৎ কোমল মধুরাক্ষরময়, কিম্বা সচ্চিদানন্দময় অথবা অশেষ রসের সহিতই বর্তমান,—শৃঙ্গারাদি নবরস মধ্যে, ভক্তিরসের ও প্রেমরসের বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন বলিয়াও 'সরস', অথবা রসের অর্থাৎ রাগের সহিত অব্যভিচারীভাবে বর্তমান থাকিয়া আশু ও অব্যর্থরূপে শ্রীভগবৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন, কিম্বা নিজ সেবকসকলের, সর্বজনের অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন। অথবা রস অর্থে বীর্য-বিশেষ—অর্থাৎ পরম শক্তিমান। কিম্বা রস অর্থে গুণ-বিশেষ, অর্থাৎ অখিল দীনজনের নিস্তারক। কিম্বা রস অর্থে সুখ-বিশেষ,—অর্থাৎ পরম ঘন সুখময়, অথবা রস অর্থে মাধুর্য-বিশেষ অর্থাৎ পরম মধুরতাময় ! —"মধুর মধুরম্—" (স্কান্দে) ইত্যাদি শ্লোক তাহার প্রমাণ। এইজন্যই বলি, শ্রীভগবানের নামের সমান অর্থাৎ তত্তুল্য আর কিছুই না থাকায়, শ্রীনাম—নিরুপম হইতেছেন।

নামের সর্বোৎকর্ষতা সম্বন্ধে আর অধিক বলিবারই বা আবশ্যকতা কি ? নামে যে কেবল প্রেমভক্তির সাধন, তাহাই নহে,—সাধনরূপে নামকে সাধ্যই জানিতে হইবে ; শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ সেই কথারই উল্লেখ করিয়া শ্রীনামের মহামহিমা খ্যাপন করিয়াছেন।

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলনং তদ্‌রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎ প্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ।।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত্—২.৩.১৬৫)

অর্থ,—নামসঙ্কীর্তনের মহিমা অধিক আর কি বলিব ? নাম-রসিক ভক্তগণ নামসঙ্কীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন ; যেহেতু নাম-কীর্তন অব্যর্থ প্রেমসম্পদরূপে প্রকাশ হয়েন বলিয়া, নাম-সঙ্কীর্তনকে তাঁহারা সাধ্যরূপেই নিশ্চয় করিয়াছেন।

শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির অভিধেয়ত্বই প্রতিপাদিত্ব হইলেও, তন্মধ্যে আবার শ্রীনাম-প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাই প্রথমস্কন্ধের প্রারম্ভেই ঋষিগণের প্রশ্নে, ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে যেমন সর্বপ্রথম শ্রীনাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে,[১] তেমনি আবার সেই প্রথমস্কন্ধোক্ত জীবের শ্রেয়ঃলাভ বিষয়ক প্রশ্নসকলের উত্তরে, দ্বিতীয়-স্কন্ধের প্রারম্ভেই শ্রীশুক কর্তৃক নিম্নোক্ত শ্লোকে, ভক্তিসাধনের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীনামকীর্তনেরই সার্বজনীনতা ও মহামহিমা উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতেরও যে, ভগবন্নাম-প্রধানতা প্রতিপন্ন হইতেছে,—এই অভিপ্রায় শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণও ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

"শ্রীভাগবতস্য পরমমহিমানমুক্ত্বা, তদনন্তরং শ্রীভাগবতমুপক্রমমাণ এব তস্য নানাঙ্গবতঃ শ্রীভগবদুন্মুখতয়া তন্নামকীর্তনমেবোপদিশতি। তত্রাপি সর্ব্বেষামেব পরম-সাধনত্বেন পরম-সাধ্যত্বেন চোপদিশতি। এতন্নির্ব্বিদ্যমানামিতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ/২৬৫)

তাৎপর্য,—প্রথমস্কন্ধান্তর্গত জীবের শ্রেয়োলাভ বিষয়ে পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয়স্কন্ধের প্রারম্ভেই শ্রীশুকমুনি তাহার সর্বোত্তম সমাধান করিবার জন্য শ্রীভাগবতের পরম মহিমা বর্ণনপূর্বক শ্রীভাগবত কথার প্রারম্ভেই ভক্তিসাধনের বিভিন্ন অঙ্গ থাকিলেও, শ্রীভগবদুন্মুখতার জন্য তন্মধ্যে শ্রীনামকেই সর্বাগ্রে উপদেশ করিয়াছেন। তাই শ্রীভাগবতেও সর্বসাধারণের পক্ষে পরমসাধনরূপে ও পরম সাধ্যরূপে শ্রীনামকীর্তনেরই উপদেশ দেখা যায়, যথা,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।। (শ্রীভাগবত—২.১.১১)

অর্থ,—হে রাজন ! মুক্তিকামীই হউন, ভুক্তিকামীই হউন, কিম্বা জ্ঞানীই হউন,—সকলেরই পক্ষে অভয় অর্থাৎ শ্রেয়োলাভের জন্য শ্রীনামসঙ্কীর্তনই মুখ্য সাধনরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে সংশয়ের অবকাশ মাত্র নাই। উক্ত শ্লোকের টীকায় মহানুভব শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ এতদিতি।"

অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধগণের পক্ষে এই শ্রীহরিনাম কীর্তন অপেক্ষা অপর শ্রেয়স্কর বিষয় আর কিছুই নাই।

১। "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।"—ইত্যাদি (শ্রীভাগবত—১.১.১৪)

প্রেমভক্তিই শ্রীনামের মুখ্যফল। সাধন-জগতে ভক্তিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী হইলেও, আবার সেই ভক্ত্যঙ্গ সকলের অঙ্গীস্বরূপে—পরমোৎকর্ষতার সহিত বিরাজমান বলিয়া, তাই শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ সেই শ্রীনামকীর্তনকে ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যেও 'মহারাজ-চক্রবর্তী'রূপে নির্দেশ করিয়াছেন,—"ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তীবৎ"— (শ্রীভাগবত—২.১.১১ টীকা)।

শ্রীনামকৌমুদীকারও জগতে জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনামেরই সর্বোপরি জয় ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন,—

"জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।"

শ্রীনামের সর্বোৎকর্ষতা সম্বন্ধে সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, শ্রীনাম-রসিক মহানুভব শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ ভগবন্নামের এক সর্ববেদ-বন্দিত পরমোৎকর্ষতায় নিগূঢ় রহস্য জগৎকে বিদিত করাইয়া, তদীয় "শ্রীকৃষ্ণনাম স্তোত্রে" মহাপ্রেমভরে গাহিয়াছেন,—

নিখিল শ্রুতি মৌলিরত্নমালাদ্যুতি নীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্তাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।। (স্তবমালা)

অর্থ,—নিখিল শ্রুতির শীর্ষস্থিত কিরীট রত্নমালার দ্যুতি দ্বারা যে তোমার পাদপঙ্কজের প্রান্তসীমা নীরাজিত হইতেছেন—মুক্তকুলের উপাস্যমান হে হরিনাম ! তোমাকে আমি সর্বভাবে ও সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করি।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—ভগবান্ ও ভগবন্নামের অভিন্নতাবশতঃ পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবানের ন্যায় তদ্বাচক অর্থাৎ পরতত্ত্বের নামেই যে, সমস্ত বেদের অভিপ্রায় পর্যবসিত সুতরাং শ্রীনাম যে, বেদসকলের পরম অভীষ্ট বস্তু,—বেদশির শ্রুতিসকল ব্রহ্মের বাচক বা নামরূপে 'প্রণব' উপলক্ষে বেদের সেই নিগূঢ় মর্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।।

(কঠোপনিষদ্—২.২৫)

অর্থ,—ধর্মরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন,—সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন, সমুদয় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করেন, যাঁহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্থী সকল ব্রহ্মচর্যের আচরণ করেন, তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিতেছি,—'তিনি' "ওঁ"।

কেবল ইহাই নহে,—পরম মঙ্গলপ্রদ ও মুক্তস্বরূপ হইয়াও, সমূর্ত্তা ("মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ—") শ্রুতিসকল আবার স্বমঙ্গলের নিমিত্ত শিরোভূষণস্থিত রত্নমালার মনোহর স্নিগ্ধালোক দ্বারা, ভগবদভিন্ন শ্রীভগবন্নামের চরণনখর মণির নীরাজন (আরতি) করিতেছেন। এতাদৃশী সমূর্ত্তা শ্রুতি এবং নারদাদি মুক্তগণ কর্তৃক নিরন্তর উপাস্যমান হইতেছেন যে শ্রীহরিনাম,—তিনি সর্বভাবে সম্যক্‌রূপে আশ্রয়নীয় হউন।

শ্রীনামের উক্ত মহামহিমা বর্ণন যে, ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র নহে, শ্রুতিসকলের প্রারম্ভে ও পরিসমাপ্তিস্থলে অনুসন্ধান করিলেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতে পারে। সাধারণতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে, সর্বপ্রথমেই পরমেশ্বরের বা তদীয় বিভূতিস্বরূপ দেবতাদির বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণের প্রথা সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু বেদশির শ্রুতি বা উপনিষদ্‌সকলে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, উক্তপ্রকার মঙ্গলাচরণের পরিবর্তে, শ্রুতিসকলের কোথাও বা প্রারম্ভে, কোথাও বা পরিশেষে কেবল পরতত্ত্ববাচক 'প্রণব' বা 'ওঁ' কার কিম্বা তৎসহ স্পষ্টতঃ 'হরি'নাম উক্ত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা এইরূপই বোধ হয়, যেন তাঁহারা কোথাও শীর্ষদেশ দ্বারা, কোনস্থানে বা মস্তক অবনতপূর্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া পরতত্ত্বের বাচক বা শ্রীনামকে বন্দনাদি করিতেছেন। স্থূলদৃষ্টিতেও গ্রন্থরূপ শ্রুতিগণকর্তৃক উক্ত প্রকারে শ্রীনামের বন্দনাদিরূপে যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, মহানুভব শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণের ন্যায় তত্ত্বদর্শী মহাভাগবতগণের ভক্তি-বিভাবিত-দর্শনে উহাই যে, 'সমূর্তা' শ্রুতিগণ সাক্ষাৎ শ্রীনামের চরণপ্রান্তে অবনত মৌলিরত্নমালার মনোহর দ্যুতিদ্বারা নীরাজনে নিযুক্ত রহিয়াছেন'—এইরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকিবেন, উহা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। অতএব যাহা শ্রুতি ও শ্রীনারদাদির ন্যায় মুক্তগণেরও নিরন্তর উপাস্য, সেই শ্রীভগবন্নাম যে, সর্বশীর্ষস্থানীয় পরমোৎকর্ষতার সহিত বিরাজ করিতেছেন,—ইহার উপর সে কথা আর অধিক কি বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে সকল দিক দিয়াই দেখা যাইতেছে, জীবের পক্ষে ভগবন্নামের অধিক বা সমান অপর কোন মঙ্গলপ্রদ আশ্রয় নাই। এতাদৃশ শ্রীনামের সহিত অপর কোন ধর্মাদি বা শুভকর্মাদি যে, কোন প্রকারেই শ্রেষ্ঠতায় সমান হইতে পারে না, সুতরাং অধিক'ত নহেই,—একথার আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাই দেখা যায়, শাস্ত্র সে সকলকে কোনস্থলেই 'নামের সমান' বলিয়া উল্লেখ'ত করেন নাই, অধিকন্তু যদি কেহ দুর্বুদ্ধিবশতঃ নামের সহিত তুল্যত্ব চিন্তন করে, তবে এ'রূপ আচরণকে 'নামাপরাধ'রূপে গণ্য করিয়া, তদ্বিষয়ে জীবকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে নিম্নোক্ত অপরাধেরও উল্লেখ দেখা যায়,—

"ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদ।—"

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত (১১-৫২৩) পদ্মপুরাণবাক্য]

অর্থ,—ধর্ম, ব্রত, দান ও হোমাদি সর্বশুভক্রিয়ার সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন,—ইহা 'নামাপরাধ'।

নামাশ্রয়পূর্বক ভজন-পথে অগ্রসর হইবার কালে, কাহারও পক্ষে ভগবৎ গুণ লীলাদি শ্রবণে, কাহারও সাধুসঙ্গ ও সেবনে, কাহারও অর্চনে, কাহারও প্রসাদ-চরণামৃতাদি সম্মানে, অপর কাহারও বা লীলা স্মরণে,—এইরূপ বিভিন্ন ভজনাঙ্গে বিভিন্ন সাধকগণের অধিক আবেশ দেখা যায় ; ইহা ভজনপথে স্বাভাবিক হইলেও,

তথাপি সেই সেই ভজনাঙ্গের মত, নামকীর্তনকেও একটি পৃথক অঙ্গ মনে করিয়া, উক্ত ভজনাঙ্গ-সকলকে নামকীর্তনের সমান বা অধিক বলিয়া মনে করা কদাচ কর্তব্য নহে ; যেহেতু নাম হইতেই উক্ত ভজনাঙ্গ সকলের উদ্গম হওয়ায়,[১] শ্রীনামই তৎসমুদয়ের 'অঙ্গী' বা কারণ হইতেছেন। একদিকে কার্য ও কারণে ভেদ না থাকিলেও, অপরদিকে কারণকে কোনক্রমেই কার্যের সমান বা কার্যাপেক্ষা ন্যূন মনে করাও সঙ্গত হইতে পারে না। নিজ রুচিকর ভজনাঙ্গে নিষ্ঠিত থাকিয়াও, নামকেই তৎপ্রাপ্তির উপায় বা কারণরূপে অবগত হইয়া, নিজ অভিলষিত সেই সেই ভজনাঙ্গের বিকাশ জন্য নামের নিকটই সর্বোপরি সকৃতজ্ঞ থাকিয়া, সর্বতোভাবে নামেরই জয় কীর্তন করা, ভজনপথের পথিক-মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য ; নচেৎ কেবল অন্য শুভক্রিয়াদি সম্বন্ধেই নহে—নামকীর্তনের সহিত অপর ভজনাঙ্গের সমতা বা আধিক্য চিন্তনেও নামাপরাধের সম্ভাবনা।

যদিও নামের সহিত ভক্তির অঙ্গসকলের তুল্যত্ব কিম্বা আধিক্য চিন্তনকে শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ কোথাও অপরাধরূপে উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি "ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ"—এই শাস্ত্রোক্তির মধ্যে 'আদি' ও 'সর্ব্ব' শব্দের বৃত্তি যে, ভক্ত্যঙ্গ পর্যন্ত প্রধাবিত হইতে না পারে এমন যুক্তি নাই। বিশেষতঃ ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনভক্তিসকলের মধ্যেও নামকীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সাধু, শাস্ত্র এমনকি স্বয়ং ভগবান্ পর্যন্তও যখন সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন; তখন সেই নামের সহিত অপর ভজনাঙ্গের সমতা বা আধিক্য চিন্তনেও নামাপরাধের সম্ভাবনায় তাহা হইতে বিরত থাকাই সমীচীন। অন্ততঃ যাহাতে নামকীর্তনাদির সহিত অপর সাধারণ শুভক্রিয়াদির সমতা বা আধিক্য চিন্তনরূপ এই স্পষ্টোক্ত নামাপরাধ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না,—ইহাও চিন্তনীয় বিষয়।

অতএব সকল ধর্ম ও শুভক্রিয়াদির সহিত সমতা চিন্তন নামাপরাধরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, ইহা দ্বারা যে, সাধন-জগতে নামের সর্বোৎকর্ষতা বা শ্রেষ্ঠতম সম্মান-বৈশিষ্ট্যই প্রতিপন্ন হইতেছে ; একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই সে কথা বুঝিতে পারা যায়। যেহেতু কেবল ভগবন্নামের সহিত সমতা চিন্তন ব্যতীত অপরাপর নিখিল ধর্মাদির মধ্যে,—এমন কি ভক্তির অপর অঙ্গসকলের মধ্যেও পরস্পর সমতা চিন্তনে কোথাও কোন অপরাধের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকায়, এই বিশেষত্ব হইতেই সমস্ত সাধনরাজ্যের মধ্যে শ্রীনামেরই মহারাজ চক্রবর্তীরূপ মহাবৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইতেছে,—ইহাও স্থিরভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

শ্রীনাম সম্বন্ধে উক্ত বিশেষত্বের কারণ হইতেছে এই যে,—একমাত্র শ্রীভগবৎতত্ত্বই হইতেছেন জগতে সর্বোপরি সম্মাননীয় বস্তু। রাজাধীরাজের প্রাপ্য সম্মানের বা তৎসমতার দাবী করা যেমন রাজদ্রোহীতারই নামান্তরমাত্র, সেইরূপ সাক্ষাৎ

১। "নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১৭)

ভগবদ্‌বস্তুর সহিত অপর যে কোন বস্তুর সমতা চিন্তনেও তদ্রূপ অপরাধজনক। ভগবৎসম্বন্ধীয় নাম নামীর অভিন্নতাবশতঃ 'শ্রীনাম' ভগবদ্‌বস্তুরই সাক্ষাৎ প্রকাশ-বিশেষ হইতেছেন। তদীয় এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জগৎ যাহাতে বিস্মৃত হইয়া না যায়, এই জন্য, কেবল সেই ভগবৎবস্তুরই সহিত অপর যে কোন শুভবস্তুর বা মাঙ্গলিক বিষয়ের সমতা চিন্তা, কেবল নিষিদ্ধই হইয়াছে, তাহা নহে—উহাকে অপরাধরূপে গণ্য করিয়া শাস্ত্র, তদ্বিষয়ে জীবকে সতর্ক থাকিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাই দেখা যায়, মহিমায় অতুলনীয় শ্রীভগবন্নামানুশীলনের সহিত অন্য কোন শুভক্রিয়াদির তুল্যত্ব চিন্তনকে নামাপরাধরূপে ঘোষণা করিয়া শাস্ত্র যেমন শ্রীনামের সর্বোপরি সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—ভগবন্নাম ও ভগবানের অভিন্নতাবশতঃ সেইরূপ আবার অতুলনীয় মহিমা-মণ্ডিত নামী বা শ্রীভগবানের সহিত অপর কাহারো এমন কি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণেরও সমতা বা তুল্যত্ব চিন্তনেও সেইরূপ অপরাধরূপেই নির্দেশপূর্বক, জগতে জগন্নাথেরই সর্বোপরি উৎকর্ষতা বা মহিমার বিজয়বার্তা শাস্ত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।। (পাদ্মোত্তর খণ্ডে ২৩/১২)

অর্থ,—যিনি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী (অর্থাৎ অপরাধী) হয়েন।

তাই অপর নিখিল দেবোপাসনাদি হইতে সাক্ষাৎ ভগবৎতত্ত্বের উপাসনার উৎকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রে স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে ; যথা,—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূত-পতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।। (শ্রীভাগবত—১.২.২৬)

অর্থ,—মুমুক্ষুগণ দেবতান্তরে দোষদৃষ্টি না করিয়া ঘোর-স্বভাব ভূতপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি পরিত্যাগপূর্বক শান্ত-স্বভাব নারায়ণ-কলা অর্থাৎ স্বাংশবর্গসহ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন।

সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু বা পরতত্ত্বেরই সর্বোৎকর্ষতার মহামহিমা প্রচার করিয়া, তাঁহাকেই ঈশ্বরদিগেরও পরমেশ্বর এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও পরমশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বলিয়া, শ্রুতিও বন্দনা করিতেছেন,—

ত্বমিশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যম্।। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৬.৭)

অর্থ,—ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও পরমেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতাদিগেরও পরম দেবতা, দক্ষাদি প্রজাপতিদিগেরও পরম পতি, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতম—সর্বজগতের একমাত্র

পরমেশ্বর ও পরমারাধ্য সেই দেবকে জানিব। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর যে, আর কাহাকেও দেখা যায় না উক্ত শ্রুতিই সে কথা বলিয়াছেন ;—

"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৬.৮)

এ'স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ভগবান্ সম্বন্ধে উৎকর্ষতাবোধ থাকিলেও, যাঁহারা ভগবন্নাম সম্বন্ধে অপকর্ষতাবোধ পোষণ করেন,—একই ভগবদ্বস্তুর একপক্ষে আস্থা-বশতঃ ইহা দ্বারা "অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়"[১] অনুসারে দুই দিকই বিনষ্ট হইয়া নামী ও নাম,—উভয়ের নিকটই অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়,—ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

আবার নামে অপকর্ষতাবোধ-জনিত উক্ত অপরাধসকল হইতে বিরত না হইয়া, কিম্বা বিরত হইবার জন্য চেষ্টা পর্যন্ত না করিয়া, সেই ভাবেই যদি নাম গ্রহণ করা হয়, তবে সে'রূপ নামগ্রহণাদি দ্বারা 'নামাশ্রয়' না হইয়া উহা নামাপরাধেরই আধিক্য বিস্তার করিতে থাকে। এ'কথার সারমর্ম হইতেছে এই যে,—কাহাকেও 'বড়' বুঝিয়া তাহার শরণ লওয়াকেই 'আশ্রয় লওয়া' বলা হয়। কিন্তু 'ছোট' বলিয়া বুঝিলাম, অথচ তাহারই শরণ লইলাম, অধিকন্তু তৎকালেই অপরকে 'বড়' বলিয়া দেখিতে লাগিলাম,—এইভাবে যে 'আশ্রয় লওয়া' হয় ; তাহাকে আশ্রয়ের প্রতি আশ্রিতের ছলনা বা কপটতা-ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। সেইরূপ নামকে 'ছোট' বলিয়া অপর কোন সাধনা বা শুভক্রিয়াদিকে 'বড়' ভাবিয়া, সেইভাবে যে নামগ্রহণ করা হয়, তাহাকে 'নামাশ্রয়' বলা যায় না ; উহা নামের সহিত ছলনা বা কপটাচার মাত্র। এই প্রকারে নামগ্রহণ দ্বারা যে, নামের অপ্রসন্নতা বা নামাপরাধেরই আধিক্য বিস্তার করিতে থাকে, একথা বুঝিবার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়টি স্থিরভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক।

অনুষ্ঠিত পাপাদি বর্জন বা বর্জনেচ্ছা না করিয়া, "নামে যখন সর্বপাপ ক্ষয় হয়, তখন নিয়ত পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করিব"—এই প্রকার দুর্বুদ্ধিবশতঃ পাপাচরণে যে প্রবৃত্তি, তাহাকে "নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি" নামক 'নামাপরাধ' রূপে গণ্য করা হইয়াছে। নাম বলে 'পাপে' প্রবৃত্ত হইয়া থাকাই যখন নামের সহিত কপটাচাররূপ নামাপরাধ, তখন নাম বলে নামাপরাধে প্রবৃত্তি—ইহা যে অধিকতর নামাপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য, সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ; সুতরাং নামে অপকর্ষতা বুদ্ধিপ্রসূত পূর্বোক্ত অপরাধসকলে প্রবৃত্ত থাকিয়া, অর্থাৎ উহা হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা পর্যন্ত না করিয়া—এই প্রকারে যে নামগ্রহণ, ইহাও—"নামবলে পাপে (বা অপরাধে) প্রবৃত্তি"—এই নামাপরাধ সৃষ্টি করিয়া, পূর্বানুষ্ঠিত অপরাধকেই পরিপুষ্ট করিতে থাকে। এইভাবে নামগ্রহণে 'নামাশ্রয় না হইয়া উহা নামাপরাধেরই প্রশ্রয়স্বরূপ হয় ; সুতরাং

১। "একেতে বিশ্বাস, অন্যে না করে সম্মান। অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় তোমার প্রমাণ।।
কিম্বা দুই না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড। একে মানি আর না মানি,—এইমত ভণ্ড।।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৫.১৫৪-১৫৫)

উক্তপ্রকার নামগ্রহণ যে, নামের সহিত কপটাচার বা ছলনা ভিন্ন আর কিছুই নহে— ইহা বুঝিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা নাই।

এই প্রকারে অপকর্ষতাবোধের সহিত নামগ্রহণে, নামের সহিত ছলনাকারী— কুটিলাশয় ব্যক্তিগণই নামের দ্বারা নামাপরাধই অর্জন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীনামের উৎকর্ষতা জানিয়া যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, উহাকেই নামাশ্রয় বলা হয়। এইরূপ নামাশ্রিত জনের পক্ষে নামের প্রতি অপকর্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায়, নামের অপকর্ষতাবোধ-প্রসূত পূর্বোক্ত নামাপরাধসকল হইতে তাঁহারা যেমন বিমুক্ত থাকেন, তেমনি শ্রীনামের প্রসন্নতাবশতঃ নামেরই কৃপায় তাঁহাদের পক্ষে অন্যান্য অপরাধ ও অশুভাদি হইতেও মুক্ত থাকা সম্ভব হইয়া থাকে।

অতঃপর 'নামাশ্রয়' কাহাকে বলে, ইহাই আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। অনন্য শরণকেই 'আশ্রয়' বলা যায়। অর্থাৎ আশ্রয়ের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া, তাহার শরণ লওয়াই আশ্রিতের লক্ষণ। যে, যাহার শরণ লইবে বা আশ্রয়ে আসিবে, সেই শরণীয় বা আশ্রয়ের প্রতি আশ্রিতের সর্বোৎকর্ষতাবোধ না থাকিয়া যদি অন্য বস্তুতে তৎসম বা তদধিক সমাদর-বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তবে উহাকে 'আশ্রয়' বলা যায় না। যেহেতু অনন্যতাবোধই আশ্রিতের প্রধান লক্ষণ। উৎকর্ষতায় আশ্রয় বা শরণ্যের সমান বা অধিক অন্য কিছুই নাই,—এইরূপ মনোভাবকেই অনন্য বুদ্ধি কহে। বহু বস্তুতে তুল্য সমাদর-বুদ্ধি লইয়া, এক বস্তুর শরণ লওয়াকে কদাপি আশ্রয় বলা যায় না। একেতেই সকল উৎকর্ষতা অনুভবপূর্বক একেতেই আকৃষ্ট হইয়া—সেই একেরই আশ্রয় লওয়া অর্থাৎ একাশ্রিত হওয়ার নামই 'আশ্রয়' করা বা 'শরণ লওয়া'। আশ্রয়ের প্রতি অনন্যতা, একনিষ্ঠতা, একান্ততা—ইহাই হইতেছে আশ্রিতের লক্ষণ। অনন্যশরণ না হইয়া যে 'আশ্রয়'—তাহা আশ্রয়ের ভান ব্যতীত অপর কিছুই নহে, এ'কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

গীতার সর্বসার কথা হইতেছে—শ্রীভগবৎ শরণাগতি এবং তজ্জন্য আশ্রয় ও আশ্রিত লক্ষণ বিদিত করা। স্বয়ং শ্রীভগবান্ গীতার সর্বত্রই নিজ একেশ্বরত্ব ও সর্বেশ্বরত্বরূপ সর্বোৎকর্ষতা ঘোষণাপূর্বক (মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।—গীতা/৭.৭) নিজ পরম আশ্রয়ত্ব প্রদর্শন করাইয়া, সেই সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়রূপ তাঁহাকেই অনন্যতা বা ঐকান্তিকতা সহকারে,—সমাদরবুদ্ধিতে আশ্রয় করিবার জন্য সর্বজীবকে আহ্বান করিতেছেন,—ইহাই সমগ্র গীতার মুখ্য অভিপ্রায়। **অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং—", "—মৎপর", "মচ্চিত্ত—", "মামেব যে প্রপদ্যন্তে—" "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং—", "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য—" "ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন—" "—ভজতে মামনন্যভাক"—মামেকং শরণং ব্রজ"**—ইত্যাদি প্রকার বহু বহু উক্তি দ্বারা,

তাঁহাতে অনন্যতা বা একাশ্রয়তাই নির্দেশ করা হইয়াছে ; অর্থাৎ তদীয় সেই সর্বোৎকৃষ্টতা-লক্ষণ-হেতু, তিনিই যে পরমাশ্রয় এবং তাহার সেই পরমোৎকর্ষতা বা সর্বশ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি-হেতু সমাদর বুদ্ধিপূর্বক অনন্যতা সহকারে তদীয় শরণ লওয়াকেই আশ্রিত লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। ইহার সারমর্ম হইতেছে এই যে,—আশ্রয়ে থাকিবে—সর্বোৎকর্ষতা এবং আশ্রিতে থাকিবে,—আশ্রয়ের প্রতি সর্বোৎকর্ষতাবোধ-জনিত আদর বুদ্ধি ও অনন্যতা। মূলতঃ এই উভয় লক্ষণের মিলিত ভাবকেই ভিত্তি করিয়া ষড়বিধ শরণাগতি লক্ষণ[১] সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই প্রকারে সেই শ্রীভগবানের সর্বোৎকর্ষতা উপলব্ধি করিয়া, অন্য দেবতাদিতে উৎকর্ষতাবোধ পরিহারপূর্বক, অনন্যতার সহিত,—একান্তভাবে তাঁহার শরণ লইতে পারিলে,—উহার নাম যথার্থ 'আশ্রয়', নচেৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আবার যাঁহারা অন্য দেবতাদির উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, এতাদৃশ আশ্রিতের পক্ষে উহা আশ্রয়ের প্রতি কপটাচরণ-স্বরূপ হইয়া থাকে বলিয়া, তাঁহাদিগের পক্ষে এই প্রকার অন্য উপাসনা অপরাধজনক এবং তদ্দ্বারা পতিত হইবার কারণ হইয়া থাকে, যথা,—

ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনম্।
বিষ্ণুভক্তস্তু কুরুতে হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।। (রুদ্রযামল)

অর্থ,—যদি বিষ্ণুভক্ত মন দ্বারাও অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাহা হইলে অপরাধ হেতু তাঁহাকে পতিত হইতে হয়।

প্রকৃষ্ট বা অকপট অনন্যতা প্রভাবেই, সেই আশ্রয়কারীর প্রতি আশ্রিতবৎসল শ্রীভগবানেরও "এই ব্যক্তি আমারই আশ্রিত"—এইরূপ মমতা বুদ্ধির উদয় হয় বলিয়া, তৎকালে সেই আশ্রিত ব্যক্তি যদি সুদুরাচার-পরায়ণও হয়, তথাপি তাহাকে আর অসৎ বলিয়া মনে না করিয়া, সাধু বলিয়াই নির্দ্ধারণ করা কর্তব্য, যেহেতু ঐকান্তিক বা যথার্থ ভগবদাশ্রয়ের প্রভাবে, সেই ব্যক্তি নিজ দুষ্কৃতি বিষয়ে অনুতপ্ত হইয়া, তৎসমুদয়ের পরিহার করিতে, কৃতসঙ্কল্প হওয়ায়, অচিরকালমধ্যেই সর্বপাপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া, ভগবৎকৃপায় প্রকৃষ্ট সাধুত্ব লাভ করিয়া নিত্য শান্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। আশ্রিতজনের অধ্যবসায় যে কোন অবস্থায় বিনষ্ট হয় না,—তদীয় আশ্রিতপালনরূপ এই মহিমার কথা শ্রীভগবান্ নিজেই সমুৎসাহ-ভরে কীর্তন করিয়া ; নিজ প্রিয় সখা শ্রীমদর্জ্জুনকে, উহা সর্বত্র ঘোষণা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।—

১। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।।" (হরিভক্তিবিলাস—১১.৪১৭ বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত)

অর্থ,—শ্রীভগবানের ভজন-অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প, প্রতিকূল অর্থাৎ তদ্বিপরীত বিষয় বর্জন ; তিনিই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, তাঁহাকে পতিত্বে অর্থাৎ প্রতিপালকরূপে বরণ, আত্মসমর্পণ এবং সকাতর প্রার্থনা—এই ছয় প্রকার শরণাগতির লক্ষণ।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। (গীতা—৯.৩০-৩১)

অর্থ,—নিরতিশয় দুরাচারপরায়ণ ব্যক্তিও যদি অন্য দেবতাদিতে অনুরক্ত না হইয়া একান্তভাবে কেবল আমাকেই ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি সাধুরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য, যেহেতু তিনি নিশ্চয়ই শোভন অধ্যবসায়ী অর্থাৎ সাধুজনোচিত প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনকারী।

আমাকে অনন্যভাবে আশ্রয়কারী—অতি দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিও মদাশ্রয় প্রভাবে, কৃত পাপাদির জন্য অনুতপ্ত হইয়া, দুর্বাসনাদি পরিত্যাগপূর্বক অবিলম্বে ধর্মাত্মা হইয়া উঠেন এবং ভোগবাসনাদি ক্ষয়ে নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয় ! আমার আশ্রিত ভক্তের অধ্যবসায় কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না,—এ'কথা তুমি মুক্তকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা-পূর্বক প্রতিপক্ষগণের সভায় যাইয়া বলিতে পার।

তাহা হইলে বুঝিলাম, অনন্যতা বা একাশ্রয়তাই আশ্রয় করিবার প্রধান লক্ষণ এবং আশ্রয়ের প্রতি সর্বোৎকর্ষতাবোধই অনন্যতা বা একাশ্রয়তার কারণ। এইরূপ একাশ্রয়তা বা একনিষ্ঠতার সহিত ভগবদাশ্রয়কারী ব্যক্তিতে, তৎকালে যদি দুরাচারাদিও বিদ্যমান থাকে, তথাপি সেই অনন্যাশ্রয়তার প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই দুর্বাসনাদি বিদূরিত হইয়া তিনি প্রকৃষ্ট ভক্তরূপে পরিণত হয়েন এবং পরম শান্তির অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। অনন্যচেতা ভগবদাশ্রিতজনের অন্তরের পাপাদিরূপ মলিনতাও এইজন্য তদীয় সাধুত্ব লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃজন করিতে পারে না, যেহেতু তন্নিবন্ধন অনুতপ্ত থাকায় এবং অনন্যতার প্রভাবে উহা অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীনৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

ন হি শশ-কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা, ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত (১০-২২৫) নারসিংহে]

অর্থ,—মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্যচেতা হয়েন,—অতিশয় পাপ-মলিন থাকিলেও, তিনি শোভাময়রূপে বিরাজমান হইয়া থাকেন, যেহেতু শশকলঙ্কবশতঃ শশাঙ্ক কখন তিমির হইতে পরাভব প্রাপ্ত হয়েন না।

শ্রীভগবানে অনন্যশরণ বা একাশ্রয় ভক্তগণের কোনও অশুভাদির সম্ভাবনা নাই, —'ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।' ইহাই শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ।

সুতরাং শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াও যদি দুষ্কৃতি ও দুর্বাসনাদি অনর্থসকল

ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া, সমভাবেই বিদ্যমান বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, সেই আশ্রয়কারীর অন্তরে অনন্যতার অভাবে শ্রীভগবৎসহ অপর বিষয়ের তুল্যত্ব চিন্তনাদিরূপ নামাপরাধের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে—ইহা সুনিশ্চয়।

শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন ও কৃপায় অধিক শ্রীভগবন্নাম আশ্রয় করিতে হইলে, শ্রীনামসম্বন্ধেও যে তদ্রূপ অনন্যতা বা একাশ্রয়তা আবশ্যক,-একথাও এখন সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ভজনরাজ্যে শ্রীনামেরই সর্বশ্রেষ্ঠতার অনুভূতি যাঁহাদিগের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারাই অনন্যতা বা একনিষ্ঠতার সহিত 'নামাশ্রয়' করিতে সমর্থ হয়েন। শ্রীনামের কৃপায় তদাশ্রিত জনের কোন অশুভ বা অনর্থাদি উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং নামাপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায় ? বিশেষতঃ সর্বোৎকর্ষতাযুক্ত 'নামী' ও 'নাম' রূপ ভগবৎ বস্তু এবং তৎপ্রচারক ও প্রদর্শক ভাগবতগণের সম্বন্ধে অপকর্ষতা বুদ্ধি হইতেই যখন 'নামাপরাধ'সকল প্রসূত হইয়া থাকে,—ইহা আমরা বুঝিলাম, তখন যাঁহারা উক্ত বিষয়সকলের পরম উৎকর্ষতাবোধেই নামাশ্রয় করিয়াছেন,—সেই নামাশ্রিতগণের পক্ষে যে, নামাপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক,—ইহা সহজবোধ্য বিষয়। অতএব যাঁহাদের নিষ্ঠা বহু বিষয়াশ্রিত, যাঁহাদের চিত্ত নামের সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সংশয় দোলায় দোদুল্যমান—'নামাপরাধ' যে তাঁহাদেরই অর্জনীয় বিষয়—কিন্তু নামাশ্রিতদিগের জন্য নহে,—এ'কথা একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এখন যদি কাহারও এ'রূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, নাম-সম্বন্ধে এত কথা জানিবারই বা আবশ্যকতা কি ? যে নাম জ্ঞানে বা অজ্ঞানে—এমন কি পরিহাসে, উপহাসে, আভাসে অথবা হেলায় গৃহীত হইলেও নামের অব্যর্থ ফলপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে বহু প্রকারে কীর্তিত হইয়াছে, সে নামের উৎকর্ষাদি বিষয়ে না জানা থাকিলেই বা ক্ষতির সম্ভাবনা কি ? শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোক নাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ।। (শ্রীভাগবত—৬.২.১৮)

অর্থ,—যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক উত্তমঃশ্লোক ভগবানের নাম কীর্তন করে—অজ্ঞান শিশু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নিও যেমন কাষ্ঠরাশি দহন করে, তাহার ন্যায় সেই ব্যক্তির নিখিল পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।। (শ্রীভাগবত—৬.২.১৪)

অর্থ,—বৈকুণ্ঠ—সর্ববিধ কুণ্ঠারহিত ভগবন্নাম সঙ্কেতে অর্থাৎ আভাসে, গীতালাপাদি পুরণে কিম্বা অবহেলায় উচ্চারিত হইলেও অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সুতরাং এই সকল শাস্ত্রোক্তি হইতে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অব্যর্থ শ্রীনামের ফল লাভ করিবার পক্ষে, নামের তত্ত্ব বা মাহাত্ম্যাদি কিম্বা উৎকর্ষাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। যখন বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ-শক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না ("ন হি বস্তুশক্তি-বুদ্ধিমপেক্ষতে") তখন নামের সাধন শ্রেষ্ঠতাদি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকিলেই বা নামের শক্তি ব্যর্থ হইবে কেন ? অতএব যে ভাবেই হউক, নামগ্রহণ করা ব্যতীত নাম-সম্বন্ধে অধিক জানিবার প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নাম-সম্বন্ধে অপর কোনও জ্ঞানের অপেক্ষা না থাকিলেও, 'নামাপরাধ'—জ্ঞানের যথেষ্ট অপেক্ষা রহিয়াছে। এমনকি অজ্ঞানে বা অনবধানেও 'নামাপরাধ' ঘটিলে তৎপ্রতিকার ভিন্ন নামের ফল লাভের আশা নাই,—"জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন"—(পাদ্মে) ইত্যাদি শাস্ত্র-নির্দেশ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। নামের সুপ্রশস্ত সাধনপথে একমাত্র 'নামাপরাধ' ব্যতীত অপর কোন প্রতিবন্ধকতার কথা শাস্ত্রে কোথাও উক্ত হয় নাই, সুতরাং নামের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতায় তৎফলপ্রাপ্তির পক্ষে কোনও বাধা নাই—যদি সেই অজ্ঞানতা কোন প্রকারে নামাপরাধের সৃজন না করে। কিন্তু যে ভ্রমাত্মক জ্ঞানের ফল, শাস্ত্রোক্ত নামাপরাধ-লক্ষণে পর্যবসিত হয়,—নামের পরম মঙ্গলময় সাধনপথে বিষ-তরুর ন্যায় অনর্থকর সেই বিপরীত জ্ঞান জীবের অন্তরে জন্মিয়া থাকিলে, তাহা সম্পূর্ণ ছেদন করা একান্ত প্রয়োজন। এই নিমিত্ত নাম-সম্বন্ধে উক্তপ্রকার আলোচনার দ্বারা নামাপরাধগ্রস্ত জীবের সেই দুর্বুদ্ধির সংশোধন অত্যাবশ্যক বলিয়াই, সাধু, শাস্ত্র এবং স্বয়ং ভগবান্ পর্যন্ত জীবকে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য উপদেশ দিতে বিরত হয়েন নাই। অতএব নাম-সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়—উত্তম, সম্পূর্ণ অজ্ঞানতাও দোষের নহে, যেহেতু উহাতে নামের ফলপ্রাপ্তির কোন বাধা হয় না। কিন্তু অপরাধদুষ্ট বিজ্ঞতা যাহা,—সেই বিপরীত জ্ঞানেরই ফলে নামাপরাধগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়া, উহারই সংশোধন জন্য তদ্বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনামের অবিসম্বাদিত অমোঘ মহিমা, যাহা সর্বদেশকালাদি নিয়ম ব্যতিরেকেই স্বয়ং জীবকল্যাণের নিমিত্ত স্বতঃই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার জন্য অগ্নির ন্যায় প্রাকৃত জড় বস্তুর উল্লেখ করা হইলেও সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে—শ্রীনাম পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—অর্থাৎ ভূমা জ্ঞানময় বস্তু—তিনি কোন প্রাকৃত জড় বস্তু নহেন। এ'কারণে সর্বসমর্থ শ্রীনাম তদীয় আশ্রিতস্মন্য জীবের চিত্তবৃত্তির ও দুর্বাসনাদির গতির সম্পূর্ণ বিচারক্ষম। বিশেষতঃ যুগধর্ম শ্রীনাম, যুগমানবের অভিভাবক হওয়ায় ঐকান্তিকতার অভাবস্থলে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় অব্যর্থ মহিমা প্রকাশে বিরত থাকেন। জীবের যে আচরণ পরম করুণ শ্রীনামের এই অসন্তোষ সৃজন করে, তাহাই নামাপরাধ। বিজ্ঞানময় শ্রীনামের এই স্বেচ্ছাচারিতা প্রযুক্ত, মহিমাসকল প্রাকৃত জড়বস্তুর গুণধর্মের

ন্যায় অবারিতে সর্বক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েন না—ইহাই জড়বস্তু হইতে চিদ্‌বস্তুর বৈশিষ্ট্য।

কোন একটি বিষয়ের বা বস্তুর ন্যূনতা, সমতা কিম্বা শ্রেষ্ঠতা অথবা এককথায় উৎকর্ষাপকর্ষতা জানিতে হইলে—

১। সমজাতীয় একাধিক বস্তুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নচেৎ তুল্যত্ব চিন্তন সম্ভব হয় না। একাধিক বস্তুর জ্ঞান হইতে, কোন বস্তু বা কোন বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের বা অন্য বস্তুর উৎকর্ষতা কিম্বা অপকর্ষতা জানা যায়। এই তুলনামূলক জ্ঞান আবার,—

ক) যথার্থ বা প্রকৃষ্ট এবং

খ) উহার বিপরীত বা ভ্রমাত্মকভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে।

২। ক) কোন বস্তুই অবগত না থাকিলে, উহা কাহা হইতে ন্যূন, কাহার সমান, কিম্বা কাহা হইতে অধিক বা শ্রেষ্ঠ,—এই প্রকার তুল্যত্ব চিন্তনের কোনই অবকাশ থাকিতে পারে না।

অতএব 'নামী' ও 'নাম' রূপ অভিন্ন ভগবদ্বস্তুর সহিত সমজাতীয় অর্থাৎ পারমার্থিক বা মাঙ্গলিক অপর বস্তুর তুল্যত্ব চিন্তন বা উৎকর্ষতা অপকর্ষতা মননাদি সম্বন্ধেও উক্ত রীতি অনুসারে পর্যালোচনা করিলে নিম্নোক্ত বিষয়-কয়টি নির্দ্ধারিত হইতে পারে ;—

১। ক) যে ব্যক্তির শ্রীনাম এবং তদ্ভিন্ন অপর শুভক্রিয়াদির কথাও জানা আছে, তাঁহার পক্ষে "কোনও শুভক্রিয়াদি নামের অধিক বা সমান নহে,—নামই সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্বোত্তম সাধনা"—শ্রীনামসম্বন্ধে শাস্ত্রের এই অভিপ্রায় যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া, নামকে সাধনজগতের অপর ধর্মাদি ও সর্বশুভক্রিয়াদি হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয়-পূর্বক একান্তভাবে নামগ্রহণ করিবার হেতুভূত যে জ্ঞান,—ইহাই হইতেছে নাম-সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ; সুতরাং নামকে এই প্রকার জানাই উত্তম অধিকারীর লক্ষণ। শ্রীনাম-সম্বন্ধে এইরূপ সর্বোৎকর্ষতাবোধে একাশ্রয়তার সহিত যে নামগ্রহণ,—উহাকেই 'নামাশ্রয়' বলা হয়।

খ) যে ব্যক্তির পক্ষে নাম ও তদ্ভিন্ন অপর শুভক্রিয়াদির বিষয় জানা আছে, কিন্তু শাস্ত্রের যথার্থ অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাদি যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যদি অপর ধর্মাদি বা শুভক্রিয়াদিকে নামের সমান কিম্বা নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনায়, নামের প্রাপ্য সর্বাধিক সম্মান না দিয়া, নামের প্রতি অনাদর বা অপকর্ষতা-বোধ পোষণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তদীয় সেই বিজ্ঞতাকে বিপরীত জ্ঞানরূপেই বুঝিতে হইবে, সুতরাং নামসম্বন্ধে তাদৃশ ভ্রমাত্মক জ্ঞান বা অপরাধদুষ্ট বিজ্ঞতার বিষময় ফলে, কেবল যে, "অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন"—এই নামাপরাধটি মাত্রই অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নহে,—

নাম সম্বন্ধে এই প্রকার অপকর্ষতা বুদ্ধিরূপ দুর্বুদ্ধির ফলে, পূর্বোক্ত সমুদয় নামাপরাধেরই সম্ভাবনা হইয়া, নামের সুগম সাধনপথে নিরন্তর অনর্থেরই আধিক্য বিস্তার করিতে থাকে। শ্রীনাম-সম্বন্ধে এই প্রকার অপরাধদুষ্ট যে জ্ঞান,—তাহারই সংশোধন ও তদ্বিষয় হইতে জীবসাধরণকে সতর্কীকরণ যে একান্তই প্রয়োজন, একথা বুঝিবার পক্ষে কোনই অসুবিধা থাকিতে পারে না।

২। ক) যে ব্যক্তির পক্ষে, নাম-সম্বন্ধে কোন কথাই জানা নাই, কিন্তু অন্য কোন শুভক্রিয়াকেই জানিয়া সে ব্যক্তি তাহাতেই একনিষ্ঠ,—এরূপস্থলে উহাকে 'নামাপরাধ' বলা যায় না ; যেহেতু নাম-সম্বন্ধে কোন কিছুই অবগত না থাকায়,—নামের কথা মনেও উদিত না হওয়ায়, তদনুষ্ঠিত সেই শুভক্রিয়ার সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তনের অবকাশ ঘটে না, কারণ সমজাতীয় একাধিক বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে তুল্যতা চিন্তা করা যায় না। অতএব অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত তুলনাপূর্বক নামের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা বুদ্ধি উদয় হইবার এ'রূপস্থলে কোন সম্ভাবনা থাকিতেছে না ; এই জন্য অন্য শুভক্রিয়া-নিষ্ঠ হইলেও, সেই ব্যক্তি তৎকালে নামাপরাধশূন্য বলিয়া, তৎকালে কোনপ্রকারে নাম গৃহীত হইলে,—নামসম্বন্ধে এ'রূপ অজ্ঞানতা থাকিলেও, নামের ফল অবশ্যই লভ্য হইবে।

খ) যে সকল জীবের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্রোক্ত শ্রীনাম বা অপর ধর্ম বা শুভক্রিয়াদি বিষয়ে কোন কিছুই জানা নাই। (যেমন কোন বিদেশীয় কিম্বা শিশু, মূর্খ, ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন—অজ্ঞ ব্যক্তি অথবা পশু, পক্ষী কীটাদি প্রাণী কিম্বা বৃক্ষ, গুল্ম লতা প্রভৃতি স্থাবর জীব)। এই সকল জীবের পক্ষে নামের কিম্বা অপর শুভক্রিয়াদি সম্বন্ধে অথবা উহাদিগের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা সম্বন্ধে কোনরূপ বোধ না থাকায়, তৎকালে তাহাদের 'নামাপরাধ' অনুষ্ঠিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতেছে না। তদবস্থায় সেই সকল জীবকর্তৃক কীর্তনে, শ্রবণে—অধিক কথা কি, নাম-ধ্বনির সংস্পর্শেও—যে কোন প্রকারে, যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা নাম গৃহীত হইলেই—এ'রূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞতাস্থলেও নামের ফল লাভের পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ সকল জন্মের মধ্যে মনুষ্য-জন্মই সাধনার উপযুক্ত জন্ম' বলিয়া, মনুষ্যের পক্ষে শ্রীনাম গৃহীত হইলে, তদ্দ্বারা শ্রদ্ধাদি ক্রমে সাধন-ভক্তির বিকাশ হইয়া, পরিশেষে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। (যে বিষয়ের আলোচনা পরে বিস্তারিতভাবে করা হইবে—মূল শ্লোক ব্যাখ্যায়) কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীতে হরিনাম শ্রবণ কিম্বা কীর্তনধ্বনির স্পর্শ-লাভ ঘটিলেও, তৎফলে পরজন্মেই সাধনোপযোগী মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি ও তথা হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমভক্তির উদয়—ইহাই নামের স্বাভাবিক মহাকৃপা বুঝিতে হইবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে, সেই ভগবদ্বস্তুর ইচ্ছা বা কৃপাবিশেষে, মনুষ্যেতর

প্রাণীর মধ্যে ক্বচিৎ কাহারো পক্ষে যে, সেই জন্মেই প্রেমভক্তি বা সংসার বিমুক্তি না হইতে পারে এমন নহে। এ'রূপ ঘটনা তদীয় অস্বাভাবিক মহাকৃপার অন্তর্গত হইলেও, অচিন্ত্য ভগবৎ বা ভগবদ্ভক্তি-মহিমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীভগবন্নামের পরম মঙ্গলময় সুপ্রশস্ত সাধনপথে একমাত্র 'নামাপরাধ' ভিন্ন অপর কোন বাধা নাই। অতএব সর্বতোভাবে—সকল প্রকারে 'নামাপরাধ' সম্ভাবনা হইতে বিরত থাকিয়া—যেকোন ভাবে, যেকোন অবস্থায়—যেকোন জীব কর্তৃক—যেকোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণনাম—ভগবন্নাম গৃহীত হইলেই, উহার ফল কখনই ব্যর্থ হয়েন না—ইহাই সুনিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে।

বেদগোপ্য সেই পরতত্ত্বসীমা—স্বয়ম্ভগবান্,—প্রেমযুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জলধরের উদয়কালে জগতের উপর যে এক অস্বাভাবিক মহাকৃপা-বৈশিষ্ট্য বর্ষণ হয়—তদীয় অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অস্বাভাবিকতা সমতা প্রাপ্ত হইয়া, উহা স্বাভাবিক মহাকৃপারূপে বর্তমান কলিযুগের পরিসমাপ্তি কাল পর্যন্ত প্রভাবিত হইয়া, তৎকালীন জীবের পক্ষেও, অপর সত্যাদিযুগাকাঙ্খিত এক মহাসৌভাগ্যের বিস্তার করিয়া থাকে। তদীয় অবতারকালের সেই অস্বাভাবিক মহাকৃপার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—এই ব্রহ্মাণ্ডগত তৎকালীন সমষ্টি জীবের উদ্ধারসাধন। অর্থাৎ যে সকল জীব তাঁহাকে অবগত হইয়া বা তদানুগত্য স্বীকারপূর্বক তৎপ্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণনাম আশ্রয় করিয়াছিল, তাঁহারা প্রেমবিশেষ বা 'ব্রজপ্রেম' লাভ করিয়াছে এবং যাহারা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া, তাহা হইতে বিমুখ হইয়া অবস্থান করিয়াছিল ; কিম্বা পাপাচারী, পতিত, পাষণ্ড যাহারা, তাহারাও এককথায় স্থাবর-জঙ্গম পর্যন্ত সর্বজীব প্রেম-সাধারণ বা ভগবদ্ভক্তি লাভে, বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া চিরধন্য হইয়া গিয়াছে। প্রেমযুগাবতার স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক অন্যের অদেয় এই নাম ও প্রেমদান লীলাকালে এই ব্রহ্মাণ্ডগত তৎকালীন সর্বজীবোদ্ধারের মহাব্রত উদ্‌যাপনের দিনে,—সেই স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সমষ্টি জীবের সংসার বিমুক্তি ও প্রেমভক্তি লাভরূপ অস্বাভাবিক মহাকৃপাবর্ষণের পরম রহস্যের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিতমাত্র, সেই শ্রীভগবানের সমক্ষেই কীর্তিত ও তৎকর্তৃক অনুমোদিত ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম হরিদাসের উক্তি হইতেও বুঝা যায়। অবশ্য ইহা তর্কযুক্তির অগোচর—কেবল বিশ্বাসগ্রাহ্য বিষয় যথা,—

"শুনিয়া প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গীকরি পুছয়ে তাহারে।।
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন।।

১। "নৃদেহ মাদ্যং...।" (শ্রীভাগবত—১১.২০.১৭) ; "সৃষ্ট্বা পুরাণি—" (শ্রীভাগবত—১১.৯.২৮) এবং "লব্‌ধ্বা জন্মামরপ্রার্থং মানুষ্যং—।" (শ্রীভাগবত—১১.২৩.২২)

হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গমে আগে করিয়াছ নিস্তার।।
তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ।।
শুনিলেই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে,—প্রতিধ্বনি হয়।।
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন।।
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.৬১-৭১)

জগৎ তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার।।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিয়াছ প্রচার।
স্থির চর জীবের সব খন্ডাইলে সংসার।।
প্রভু কহে সব জীব যবে মুক্ত হবে।
এইত' ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে।।
হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি।।
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্মজীবে পুন কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে।
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.৭০-৭৪)
এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৩.৮২)

—ইত্যাদি উদ্ধৃত উক্তিসকলের মধ্যে—"তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্তন।" "স্থাবরের শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয়', 'সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।' 'তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন'—প্রভৃতি বাক্যগুলির ভিতর শব্দ-তরঙ্গ-বিজ্ঞানের কোন এক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—যাহা বর্তমান বেতার (Radio) বিজ্ঞানের অনুরূপ ও তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য যে কালে তৎবিষয়ে মানবের অন্তরে কোন ধারণার লেশমাত্রও বিকাশ হয় নাই, সে সময়ে

উহা ব্যক্ত করিবার জন্য "উচ্চ সঙ্কীর্তন", 'শব্দ লাগে' 'প্রতিধ্বনি হয়' 'সকল জগতে হয়'—ইত্যাদি প্রকার ভাষার অতিরিক্ত যে আর কোন কিছু বলিয়া, উহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না,—ইহাও বুঝিতে হইবে। যিনি সর্ববিজ্ঞানময় ও সর্বশক্তিমান পুরুষ, সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে যে, সকল বিজ্ঞান, সকল সামর্থ্যই নিহিত রহিয়াছে—ইহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন ; সুতরাং তদীয় বিজ্ঞান-শক্তি দ্বারাই হউক অথবা ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই হউক, তিনি সমস্ত অসম্ভাব্যই সম্ভব করিতে পারেন। তাই মনে হয়, নিজ অভিন্ন স্বরূপ শ্রীনামের অচিন্ত্য মহাশক্তি জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি এই লীলায় শব্দ-তরঙ্গ বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বনে, অথচ সর্বসমর্থতাবশতঃ বিশেষ কোন যন্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়াই, কেবল খোল করতাল যোগে তাঁহার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ নাম সঙ্কীর্তন ধ্বনির তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড অবধি সকল ভুবন, সকল আকাশ তরঙ্গায়িত করিয়া, সেই সূক্ষ্ম শ্রীনামকীর্তন-তরঙ্গের পরম পাবনী শক্তির সংস্পর্শদানপূর্বক, ব্রহ্মাণ্ডগত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্বজীবের উদ্ধার-সাধন এই প্রকারেই সম্ভব করিয়াছেন। যখন বর্তমান শব্দতরঙ্গ-বিজ্ঞানের জগতের সুষুপ্তি অবস্থা,—যে সময়ে জগতে কোনও জড় বৈজ্ঞানিকের মানসপটের নিভৃত কোণে—স্বপ্নেও উহার আভাসমাত্র উদিত হয় নাই ; সেইকালে,—সেই পাঁচশত বৎসর পূর্বে, শ্রীগৌরপরিকরগণ যে, সেই বিজ্ঞানের মূল নীতি সম্বন্ধে জাগ্রত ছিলেন,—অর্থাৎ একস্থানের ধ্বনি যে, সকল পৃথিবীতে—এমন কি সকল ভুবনে—চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আকাশে সঞ্চারিত হইতে পারে, এইতত্ত্ব তাঁহাদের স্বাভাবিক কথোপকথনের ভিতর দিয়াও প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য মহাচিদ্ বৈজ্ঞানিক যাঁহারা—চিদানন্দ বিজ্ঞানের বেদগুহ্য চরম রহস্য আবিষ্কারপূর্বক চিন্ময় নিখিল জীবাত্মার পূর্ণতা প্রদান ও পরম মঙ্গল বিধান করাই তাঁহাদিগের একমাত্র মুখ্য সাধন হইলেও,—সেই মহাবিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক তুচ্ছ ফলেও যে, উক্ত জড়বিজ্ঞানের অনুভূতির উদয় হইতে পারে, এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব শ্রীগৌরপরিকরগণোক্ত—

"বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্বন্দে তং দেব চূড়ামণিমতুলরসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রম্।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—১০)

কিম্বা

"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়া।।" (শ্রীরূপগোস্বামিচরণ)

ইত্যাদি প্রকার বহু বর্ণনার মধ্যে যে, শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখোদ্গীর্ণ হরেকৃষ্ণাদি পদামৃত হইতে প্রেমরূপ পরম-জীবনদানপূর্বক জগতের মায়াহত নিখিল জীবোদ্ধারের

কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে, স্থানবিশেষে উচ্চারিত ধ্বনির এই বিশ্বব্যাপকতা ইহাও যে পূর্বোক্ত শব্দতরঙ্গ-বিজ্ঞানেরই সমর্থক, এ'কথা এখন আমরা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিব।

তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত উক্তিসকল হইতে তদীয় প্রকটকালের এই ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টি-জীবের উদ্ধার-সাধন ও সর্বসাধারণ জীবকে প্রেম-সাধারণ বা ভক্তি দিয়া বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত প্রাপ্তির মহা সৌভাগ্য প্রদানরূপ তৎকালীন এক অস্বাভাবিক মহাকৃপা বৈশিষ্ট্যই ব্যক্ত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং শ্রীনামগ্রহণ বিষয়ে সর্বকালেই একমাত্র নামাপরাধের বিচার বিদ্যমান থাকিলেও, উহা শ্রীগৌর-প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-জীবোদ্ধার-কাল বলিয়া, তৎকালে অপরাধী নিরপরাধী নির্বিচারে এক অস্বাভাবিক মহাকৃপা বৈশিষ্ট্য বিতরিত হইয়াছে।

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৮.৩১)

ইত্যাদি উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। তবে তদীয় চরিত-গ্রন্থাদিতে যে সকল স্থলে অপরাধিগণের শাস্তিভোগ বা তাহাদিগকে তিরস্কারাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা তদীয় অপ্রকটকালের জীবসকলকে 'অপরাধ' হইতে সাবধানতা অবলম্বনের শিক্ষার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে, যেহেতু তদীয় অপ্রকটকালে অপরাধের বিচার থাকিবে।

তাই দেখা যায়, শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটকালে তদীয় সেই মহাকৃপার অস্বাভাবিকতারূপ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়া, শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ বিস্ময়াভিভূত হইয়া লিখিয়াছেন,—

পাত্রাপাত্র বিচারণং ন কুরুতে ন স্ব পরং বীক্ষ্যতে
দেয়াদেয় বিমর্শকো ন হি ন বা কাল প্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ-প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্ল্লভঃ
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ।।

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত—৭৭)

অর্থ,—যে প্রভু নিরপরাধ অপরাধাদিরূপ পাত্রাপাত্র বিচার কিম্বা আত্মপর দৃষ্টি বা দেয়াদেয় চিন্তা অথবা কাল ও ক্রমাদি প্রতীক্ষা কিছুমাত্র না করিয়া (সমষ্টি জীবোদ্ধার কাল নিবন্ধন) শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম, ধ্যানাদিরূপ সাধন দ্বারাও দুর্লভ যে প্রেমভক্তিরস,-তাহা নাম-গ্রহণাদি-মাত্র সদ্যই প্রদান করেন—সেই ভগবান্ শ্রীগৌরহরিই কেবল আমার পরম গতি।

তাহা হইলে বুঝিলাম—"গৌরচন্দ্রের যাবৎ মর্তে স্থিতি"—সেই তদীয় প্রকটকাল পর্যন্তই অস্বাভাবিক মহাকৃপাবৈশিষ্ট্য ব্রহ্মাণ্ডে বর্ষিত হইয়া, তদীয় অপ্রকটে

উহার কিয়দংশ সমতা প্রাপ্ত হইয়া, স্বাভাবিক মহাকৃপারূপে এই গৌরপ্রকটিত প্রেমযুগাখ্য কলিযুগের অবশিষ্ট কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সেই অস্বাভাবিক মহাকৃপার স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি হইতেছে এই যে,—

১। তদীয় অপ্রকটকালে কেবল ভজনশীল জীবসকলেরই সংসার বিমুক্তি ঘটিবে, সমষ্টি জীবের নহে। তবে এই যুগে কলির প্রভাব অকালেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, অকালেই অস্তমিত হইলে জগতে প্রায় সকল মনুষ্যতেই ভজন প্রবৃত্তির বিকাশ হইবে।

২। এইকালে ভজনশীল প্রায়শঃ সকল ব্যক্তির পক্ষেই নামাশ্রয় দ্বারা সাধনসিদ্ধের রীতিতে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, কিন্তু কৃপাসিদ্ধের রীতি অনুসারে নহে, অর্থাৎ শ্রীনামগ্রহণাদি হইতে সদ্যাই প্রেমের কারণ ঘটিয়া উহা সাধনভক্তিরূপে যথাক্রমে শ্রদ্ধাদির আবির্ভাব করাইয়া, যথাকালে প্রেমের কার্য বা প্রেমভক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইবেন, কিন্তু যুগপৎ প্রেমের কারণ ও কার্যরূপে অর্থাৎ সদ্যাই প্রেমরূপে আবির্ভাব ঘটিবে না।

৩। তদীয় অপ্রকটকালে অপরাধাদির বিচার থাকিবে, অর্থাৎ অপরাধসকলও বিশেষভাবে দশবিধ নামাপরাধ বর্জনপূর্বক নিরপরাধে গ্রহণেই নামের অব্যর্থফল লাভ করা যাইবে। তবে শাস্ত্রবিহিত বিধানে ও বহু নাম গ্রহণে সেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার পর নামগ্রহণেও তৎফল অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

উক্ত প্রকারে শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটকালের অস্বাভাবিক মহাকৃপা তদীয় অপ্রকটে কিয়দংশ মন্দীভূত হইয়া স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইলেও এই গৌর প্রকটিত প্রেমযুগাখ্য কলিযুগের অবশিষ্টকাল পর্যন্ত, তদীয় প্রকটকালের সেই মহাকৃপার অস্বাভাবিকতারও নিম্নোক্ত কিয়দংশের বিদ্যমানতা থাকিবে যথা,—

১। অন্যযুগের স্বভাবতঃ সুদুর্লভ শ্রীনাম বর্তমান যুগব্যাপী অপর মহৎকৃপাদির অপেক্ষা না করিয়াও কেবল তদীয় সঞ্চারিত মহাকৃপা প্রভাবেই সর্ব জীবের পক্ষে সহজ গ্রাহ্য বা সুলভ থাকিয়া, এমন কি পরিহাসে, উপহাসে, অবহেলায় ও আভাসাদিতেও উহা জীবের ইচ্ছামাত্র গ্রহণীয় হইবেন।

২। সত্যাদি অপর সকল যুগের অভিলষিত ও অলভ্য যে প্রেম বিশেষ,—বর্তমান যুগে শ্রীগৌর আনুগত্যে শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্তনাদি হইতে সেই 'ব্রজপ্রেম' পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

অতএব সেই বেদগোপ্য পরতত্ত্ব শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব হইতেই যে, বিশ্বে বেদগুহ্য প্রেমধর্ম ও তৎপ্রাপ্তির পরমোপায় শ্রীনামতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ বা পরিপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হইয়া থাকে ও হইয়াছে, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে সকল দিক্ দিয়াই বুঝিতে পারা যায়। প্রেমভক্তির কারণস্বরূপ যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছে, তন্মধ্যে আবার (শ্রীগৌর-প্রকটিত এই বিশেষ কলিযুগে) শ্রীনামসঙ্কীর্তনেরই

সর্বশ্রেষ্ঠতারূপ মহামহিমা—ইহাও শ্রীগৌরসুন্দর হইতেই জগৎ সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়াছে এবং তদীয় অপ্রকটেও—এই কলিযুগের অবশিষ্টকালব্যাপী একমাত্র নামাপরাধ বর্জনপূর্বক নিরপরাধে নামাশ্রয় করিলে সেই শ্রীনাম প্রেমের কারণ হইয়া, যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রেমোদয়রূপ কার্যের অভিব্যক্তি করাইয়া—কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে যে মহাশক্তি ধারণ করেন একথাও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বেদসকলের মুখ্য অভিপ্রায় বা সর্বসার-ভাগ যাহা সেই জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বিষয় সকলের মধ্যে শ্রীভগবৎতত্ত্ব ও তৎসাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভাগবতী ভক্তি বা এককথায় ভাগবত-ধর্মই পরম গুহ্য বিষয়। আবার তন্মধ্যে আরও সূক্ষ্মভাবে নিহিত শ্রীনাম ও প্রেমধর্মই হইতেছেন সর্ববেদের নিগূঢ়তম সম্পদ। এই পরম রহস্যময়ী গুহ্যতম বিদ্যা—এই শ্রীনাম ও প্রেমধর্ম জগতে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ এবং প্রচার ও প্রদান করিবার পক্ষে একমাত্র সেই বেদনির্দেশ্য পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্ ভিন্ন আর কেহই অধিকারী নহেন। এইজন্যই প্রেমধর্মের ন্যায় শ্রীনামের স্বরূপ ও মহিমাদি বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব বা প্রকৃষ্টজ্ঞান তদীয় অবতারকালের পূর্বাবধি জগতে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ না থাকায় তদ্বিষয়ে প্রায়শঃ বহু জীবেরই বহুবিধ অপরাধাত্মক জ্ঞান বা আচরণরূপ নামাপরাধ সঞ্চারিত হইবার পক্ষেও কিছুমাত্র অসম্ভাবনা ছিল না। তদীয় প্রকটকালেই সেই বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া শ্রীনাম স্বমহিমায় বিকশিত হইয়া অখিল জগজ্জনের পরম কল্যাণরূপে—সেই পরম কারুণিক আদ্যহরি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক স্বয়ং আস্বাদিত হইয়া জগতে প্রদত্ত হইয়াছেন।

সেই শ্রীনামের মহামহিমাসকল, অতঃপর আমরা তদীয় শ্রীমুখাব্জ বিনির্গত—শিক্ষাষ্টক শ্লোকের অনুসরণে যথামতি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

"জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম"।



শিক্ষাষ্টকের ইতিহাস

প্রচলিত ধারণানুযায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নিজে কোন গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই। তাঁহার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শিক্ষাষ্টক-শ্লোকই তাঁহার একমাত্র রচনা বলিয়া প্রকাশ। বৈষ্ণব জীবনের সকল সাধ্য ও সাধন তত্ত্বই এই কয়টি শ্লোকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

এই শিক্ষাষ্টকের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মত বিদ্যমান। কবিরাজ গোস্বামিপাদের অনুসরণে জানা যায় শ্রীনবদ্বীপ-লীলাকালে সর্বপ্রথম শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে শ্রীনীলাচল-লীলার সর্বশেষে নিজকৃত সেই শ্লোক আস্বাদিত হইয়া জগতের মহদুপকারের নিমিত্ত, সেই শ্লোকগুলিই যথাক্রমে ও সুস্পষ্ট অর্থসহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সর্বজন সমক্ষে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ-লীলাকালে যে এই শ্লোক লোকশিক্ষার নিমিত্ত প্রথম রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নিম্নলিখিত পয়ার হইতে, যথা,—

পূর্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিখাইল।
সে অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.৫৫)

ব্রজলোকের যে বিশুদ্ধ প্রেমে—স্বয়ং ভগবৎপরা সেই প্রেমে নিজ সুখ-বাসনার লেশাভাস মাত্রও নাই—নিকষিত হেমতুল্য সেই অলৌকিক প্রেমকথা ও তল্লাভের নিমিত্ত উত্তমা-ভক্তিই একমাত্র উপায়—ইহা জানাইবার জন্য—দয়াল প্রভু এই শ্লোক রচনা করিয়া, তাহা অর্থ ও ক্রম ব্যাখ্যা সহকারে বুঝাইয়াছেন।

নীলাচলে প্রকটলীলার অন্তিম পর্যায়ে রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু অহোরাত্র কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বল ? নানা ভাব বিভাবিতে উদ্বেলিত হইয়া অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর ও রামরায়ের সহিত নিরন্তর তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ, গুণ, লীলাকথার আস্বাদনে ও স্বরূপানুভূতিতে প্রভুর হর্ষ, শোক, রোষ, দৈন্য, উদ্বেগ, আর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দশা সমুপস্থিত হইলে তদনুরূপ ভাবাশ্রয়ে স্বীয় পার্ষদসনে স্বকৃত শ্লোক পড়িয়া তাহার অর্থ ব্যাখ্যায় সময় অতিবাহিত করেন, যথা,—

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.৭)

শুধু নিজ আস্বাদনের নিমিত্তই নহে, কলিহত জীবের পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর হিসাবে সাধ্য-সাধনরূপ শ্রীনামের নির্দেশও করিতেছেন, যথা,—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.৫)

সর্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনামের মহামাহাত্ম্য স্বকৃত শ্লোকেই আবার বর্ণন করিতেছেন, যাহার অর্থ শ্রীচরিতামৃতকারের অতি অনবদ্য ভাষায়,—

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গাম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।।
উঠিল বিষাদ, দৈন্য, পড়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.১০-১২)

পূর্বে (শ্লোকাষ্টক রচনাকালে) শ্লোকাষ্টক ক্রমানুসারে প্রচারিত হয় নাই। ইহা পদ্যাবলী দেখিলে জানা যায়। পদ্যাবলীতে[১] এই অষ্ট শ্লোক পার্শ্বলিখিত শ্লোক সংখ্যায় সূচিত হইতে দেখা যায়। যথা,—

১ম শ্লোক	"চেতোদর্পণ—	"ইত্যাদি	পদ্যাবলীতে	২২ শ্লোকে।
২য় ,,	নাম্নামকারি	,,	,,	৩১ শ্লোকে।
৩য় ,,	তৃণাদপি	,,	,,	৩২ শ্লোকে।
৪র্থ ,,	ন ধনং ন জনং	,,	,,	৯৫ শ্লোকে।
৫ম ,,	অয়ি নন্দতনুজ	,,	,,	১৭ শ্লোকে।
৬ষ্ঠ ,,	নয়নং গলদশ্রু	,,	,,	৯৪ শ্লোকে।
৭ম ,,	যুগায়িতং	,,	,,	৩২৮ শ্লোকে।
৮ম ,,	আশ্লিষ্য বা	,,	,,	৩৪১ শ্লোকে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে, নীলাচল-লীলাকালেই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বকৃত ঐ শ্লোকাষ্টক নিজে আস্বাদন করিয়া উহার 'ক্রম' শিক্ষা দিলেন, যথা,—.

বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শ্লোকাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হঞা।।
ভক্ত শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.১২৯-১৩০)

"পুনঃ আস্বাদিল' অর্থে "যথাক্রমে" আস্বাদিল এ'রূপ বুঝিতে হইবে। পূর্বে

১। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ সংকলিত।

নবদ্বীপ-লীলাকালে, যখন এই শ্লোকগুলি রচিত হয় তখন উহার যে 'ক্রম' ছিল, তাহা লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে (সেই ক্রম) ভঙ্গ হয়। যাহা পদ্যাবলী দৃষ্টে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। পরবর্তীকালে নীলাচলে জনহিতার্থে পুনরায় তৎকৃত 'ক্রম' রচিত ও উহার অর্থ ব্যাখ্যাত হয়, যাহা হইতে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তসকল, যথাযথ ক্রমানুসারে নির্ণীত হইতে কোন অসুবিধা হয় না।



প্রস্তাবনা

শ্লোক ব্যাখ্যা সূত্রপাত

'উপমান ও উপমেয়'

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি উপমা অলঙ্কারে ভূষিত। যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয় তাহাকে 'উপমান' ও যাহার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় তাহাকে "উপমেয় বা উপমিত" বলা হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাই বিশেষ। যেমন, "মুখচন্দ্র"—এখানে চন্দ্র উপমান, মুখ—উপমেয়। কিম্বা 'চরণকমল'—এখানে চরণ—উপমেয় ও কমল—উপমান।

উপমা দিবার উদ্দেশ্য—(১) কোন না দেখা বা না জানা বস্তুকে কোন দেখা বা জানা বস্তুর তুলনা দিয়া বুঝান। যেমন শ্রীভগবানের রূপ 'নবজলধরকান্তি'। তাঁহার কান্তি না দেখা ও না জানা বস্তু। আর নবজলধর—দেখা ও জানা বস্তু। (২) আবার কোন বস্তুকে সম্মানিত বা হেয় করিবার জন্য উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বস্তুর সহিত তুলনা দিতে হয়। যেমন 'নরদেবতা' বা 'নরপিশাচ' এ'স্থলে একই 'নর' প্রথমক্ষেত্রে নর হইতেও শ্রেষ্ঠ দেবতার সহিত তুলনীয় হইয়া গৌরবান্বিত, অপরক্ষেত্রে নর হইতেও অধম পিশাচের সহিত সামঞ্জস্যে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীভগবৎ বিষয়—'ভূমা বস্তু'। শ্রীভগবদ্বস্তু ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বিষয়-সকল হইতেছে 'ভূমা' বা নিরতিশয় মহান্ বস্তু ; অর্থাৎ যাহার অধিক আর কিছুই নাই বা কখনও হইবে না। অতিশয় দ্বিবিধ—১) নিরতিশয়—নাই অতিশয় যাহার ; আর ২) সাতিশয়—আছে অতিশয় যাহার।

জড়ীয় বা মায়িক পরিচ্ছিন্ন বস্তুই 'অল্প' বা সপরিসীম—সাতিশয়। যাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু স্বতঃই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সাতিশয়-বস্তুর মহিমা, তদপেক্ষা উৎকর্ষ-সম্পন্ন কোন বস্তুর উপমায় উহার স্বরূপ-সম্বন্ধে ধারণা বর্দ্ধিত করা যায়। যেমন 'নরদেবতা'—নর অপেক্ষা দেবতার উৎকর্ষ স্বতঃই বিদ্যমান। সেই দেবতার উপমাযোগে নরত্বের মহিমা বর্দ্ধিত করা যায়।

শ্রীভগবান্ ও তদীয় শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর এবং ধামাদি সমস্তই 'ভূমা' অর্থাৎ নিরতিশয় মহিমান্বিত। এই মায়া-বৈভব বা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মাত্র একপাদ বিভূতিবিশেষ। যথা, ১) "—একাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা—১০.৪২) অর্থাৎ 'আমি একাংশে এই সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।' ২) "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি"—(পুরুষসূক্ত-৩) প্রাণিকুলসহ এই নিখিল বিশ্ব তাঁহার একপাদ বিশেষ।"

৩) "ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ—" (পুরুরষসূক্ত-৩)। ইত্যাদি প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং তাঁহাকে দেবতা বলিলে তাঁহার মহিমার অল্পতাই প্রকাশ হয়। যেহেতু,—

ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ—৬.৭)

অর্থাৎ,—(তিনি বা শ্রীভগবান্) 'ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকেশ্বরদিগেরও নিরঙ্কুশ মহেশ্বর অর্থাৎ শাসন কর্ত্তা ; ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দৈবত (দেবত্বপ্রদ)।"

যিনি নিজেই সর্বদেবময়—কোন বিশেষ দেবতার সহিতই বা তিনি তুলনীয় হইতে পারেন !

'হেমচন্দ্র' এই শব্দে চন্দ্র-সূর্যাদির সহিত উপমায় পরিচ্ছিন্ন জীবের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার শ্রীচরণনখমণির কিরণ হইতে কোটি কোটি সূর্যচন্দ্রের বিকাশ—তাঁহাকে, 'কৃষ্ণচন্দ্র' বা 'রামচন্দ্র' প্রভৃতি উপমায় চন্দ্র-সূর্য-তুল্য বলিলে, তাঁহার মহিমার ন্যূনতাই ব্যক্ত হয়। কারণ

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।। (গীতা—১৫.২২)

অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজে এই চরাচর বিশ্বজগৎ প্রকাশিত হয়, সে তেজ আমারই জানিবে। (অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি)

চিদ্‌বস্তু নিত্য, অসীম ও মহৎ। আর জড়বস্তু অনিত্য, সীমিত ও ক্ষুদ্র। ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। নিত্য চিদ্‌বস্তু ভূমা অর্থাৎ সর্বতোভাবে পূর্ণ ; মহতো মহিয়ান্—উহা জীবের ধারণা বহির্ভূত। কিন্তু পরিচ্ছিন্নতাবশতঃ সমুদয় জড়বস্তু অপূর্ণ ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং সেই অসীম 'ভূমা' বস্তুকে মনুষ্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণার মধ্যে আনিবার নিমিত্ত সসীম জড়বস্তুর সহিত তুলনা দিলেও তাহার সম্যক্ স্বরূপ ব্যক্ত হয় না। সেখানে উপমান উপমেয় হইতে ছোট পড়িয়া যায়। জড়বস্তুর সহিত জড়বস্তুর উপমা অনেকস্থলে সমতার অতিরিক্ত মহত্ত্বের প্রকাশক। কিন্তু চিদ্ বা ভূমা বস্তু স্বরূপত:ই জড়বস্তু হইতে সর্বক্ষেত্রে অধিক মাহাত্ম্যগুণ সম্পন্ন হওয়ায়, জড়বস্তুর দ্বারা চিদ্‌বস্তুর উপমা দেওয়া বিধেয় হয় না। প্রাকৃত জগতের শ্রেষ্ঠতম বস্তু নিচয়ের উপমার মাধ্যমেও সেই অসীম নিত্যস্বরূপ চিদ্‌বস্তুর অংশ পরিমিতিরও প্রকাশ সম্ভব নহে। তবু যে জীবহিতৈকব্রত মহান্ নামী শ্রীমন্মহাপ্রভু উহার উল্লেখ করিলেন সে কেবল ক্ষুদ্র জীবের সীমিত বুদ্ধির কথা চিন্তা করিয়া, তাহাদের ক্ষুদ্র ধারণা গ্রাহ্য কোন বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভূমা বস্তুর যতটা সম্ভব আভাষ দানের উদ্দেশ্যেই।

শ্রীভগবৎ স্বরূপ ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ে লৌকিক বস্তুর তুলনা করা যে বাতুলতা মাত্র, তাহা ভক্তকবি লোচন দাসের নিম্নোক্ত পদটি হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুপম রূপমাধুর্য্যের বর্ণনায় উপমার অভাবের কথা কবি ছন্দে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা,—

শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ ধিক্ চম্পকের বর্ণ
শোন কুসুম গোরচনা।
হরিতাল সে কোন্ ছার বিকার সে মৃত্তিকার
সে কি গোরা রূপের তুলনা।।
ধিক্ চন্দ্রকান্ত মণি তার বর্ণ কিসে গণি
ফণি মণি সৌদামিনী আর।
ও সব প্রপঞ্চরূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ
তুলনা কি দিব আমি আর।।
যত দেখ বর্ণন অনুসারে উদ্দীপন
গৌর রূপ বর্ণন কে করে।
জান না যে সেই গোরা ধরারূপে অঙ্গ ধরা
দরশে ধৈরজ দূর করে।।
শুন গো প্রাণ সই জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই যাঁর তুলনা তাঁর ঠাঁই
অমিয়া মিশাব কেন বিষে।।
কেবা তাঁর গুণ গায় গুণের কে ওর পায়
কেবা করে রূপ নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে
ভাবিয়া বাউল হইল মন।।
পক্ষী যেন আকাশের কিছুই না পায় টের
যতদূর শক্তি উড়ে যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায় টের
অনুসারে এ লোচন গায়।।

তাই, অনুপম বস্তুর উপমা না থাকিলেও যতটা সম্ভব জীবের বোধগম্যের জন্য—উহার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

শ্রীনামীর সহিত অভিন্নতাবশতঃ শ্রীনামেরও মহিমা নিরতিশয় মহান্। মায়িক

জগতের কোন বস্তুর সহিত তাহার তুলনা না হইলেও জীবের বোধ সৌকর্য্যের জন্য—সেই উপমা, কথঞ্চিৎ মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত আবশ্যক হইয়া থাকে। এই হেতু প্রাকৃত উপমা দিতে হইলেও সর্বক্ষেত্রেই তাহাকে উপমেয় হইতে হীন বা অল্প করিয়াই বুঝিতে হইবে। যেমন,—"কৃষ্ণ কর পদতল কোটী চন্দ্র সুশীতল।" অথবা

মৃগমদ নীলোৎপল গন্ধে যেই পরিমল
যেই হরে তার গর্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ যে নাসায় নেই সম্বন্ধ
সে নাসিকা ভস্ত্রার সমান।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২.২৯)

কিম্বা,— "কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ চরিত
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দিত।" ইত্যাদি—

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২.৩০)

সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণগুণ সম্বন্ধ—প্রাকৃত যে কোন বস্তুনিচয় হইতে অপরিসীম শ্রেষ্ঠতাগুণ সম্বন্ধযুক্ত—তা সে মৃগমদ নীলোৎপল গন্ধই হউক, সুধাসার স্বাদুই হউক কিম্বা শীতলতায় কোটিচন্দ্রের সমাহার স্বরূপই হউক,—তাহারা সকলেই সেই অচিন্ত্য মাধুর্য-ভূপের তুলনায় নিন্দিত, হেয়, ন্যূন—কিছুই সেই শ্রীকৃষ্ণরসভূপের মাধুর্যের কণ পরিমাণও ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।

স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার

স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে সব জানে মুনিগণ।।
আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২০.২৯৫-২৯৬)

অর্থাৎ,—যে বস্তু হইতে যাহা হয়—তাহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ, যে বস্তু যাহা—তাহাই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। শ্রীনাম হইতে যাহা হয়—তাহা নামের তটস্থ-লক্ষণ বা মাহাত্ম্য অর্থাৎ মহিমা। আর শ্রীনাম নিজে যাহা, তাহাই নামের স্বরূপ-লক্ষণ। পূর্বোক্ত, "চেতোদর্পণ" হইতে "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং" পর্যন্ত শ্রীনামের মাহাত্ম্য বা তটস্থ-লক্ষণ, আর "পূর্ণামৃতাস্বাদনং" হইতে—"সর্বাত্মস্নপনং" পর্যন্ত শ্রীনামের স্বরূপ-লক্ষণ।

স্বরূপ অর্থে শ্রীভগবানের রূপ ও গুণকে বুঝায়। তদীয় রূপ এবং গুণও আবার পরস্পর সম্পূর্ণ অপৃথক বা অভেদ। কিন্তু স্বরূপ হইতে শ্রীভগবানের শক্তি বা শক্তিকার্য

কিছু বিশেষ। ইহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ লক্ষণ-যুক্ত—আর ইহাতেই তটস্থ-লক্ষণের প্রকাশ। স্বরূপের 'গুণে' ও 'ধর্মে' এই প্রকারই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কেবল তটস্থ-লক্ষণে যে পরতত্ত্ব বস্তু জানা যায়, তাহা সম্পূর্ণ নহে—তদুপরি স্বরূপ-লক্ষণে পরতত্ত্ব বস্তু জানিলেই তৎ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়। কারণ, শুধু তটস্থ-লক্ষণে জানিলে কেবল তদীয় শক্তি ও শক্তিকার্য বিষয়েই জানা হয়। তাই শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই পরতত্ত্ব-বিষয়কে এই দ্বিবিধ লক্ষণেই প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন,—

১) তটস্থ-লক্ষণ, যথা,—

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-স্তড়িদ্‌গর্ভমেঘ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে, যতো বা জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ।।

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ—৪.৪)

অর্থাৎ,—তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, হরিদ্বর্ণ ও লোহিত চক্ষু শুকাদি পক্ষী, বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ, গ্রীষ্মাদি ঋতু ও সপ্ত সমুদ্র। যেহেতু তুমিই সর্বময় সেহেতু অনাদিমৎ (আদিরহিত, সর্বকারণ) তুমিই সর্বব্যাপীরূপে বর্তমান আছ। তোমা হইতেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

২) স্বরূপ-লক্ষণ, যথা,—

ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ—৬.৭)

অর্থাৎ,—ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকেশ্বরদিগের নিরঙ্কুশ মহেশ্বর অর্থাৎ শাসনকর্তা, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দৈবত (দেবত্বপ্রদ) এবং প্রজাপতিগণেরও পতি বা শাসনকর্তা, অক্ষর ব্রহ্মের পরবর্তী এবং ভুবনাধিপতি ও স্তুতিপাত্র সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমরা (জ্ঞানিগণ) প্রত্যক্ষরূপে জানি।

স্বরূপলক্ষণান্বিত ভগবান্ অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপই 'শ্রীভগবান্' নামে কথিত হয়। আবার শ্রীভগবান্ হইতে তদীয় নাম অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতার সংবাদ শাস্ত্রাদি প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং ভগবৎস্বরূপ হইতে স্বরূপের নামের অভিন্নতাবশতঃ, শ্রীনামেরও স্বরূপ ও তটস্থ—এই উভয়বিধ লক্ষণই বিদ্যমান। নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবানের ন্যায় ভগবন্নামেরও অশেষ মাধুর্যাদি গুণের বিষয় স্বরূপ-লক্ষণে এবং তদীয় মহিমাদির বিষয় তটস্থ-লক্ষণে—একত্রে একই শ্লোকমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

স্বরূপ-লক্ষণ — মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকল নিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।

তটস্থ-লক্ষণ — সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১-৪৫১) ধৃত প্রভাসখণ্ডের বাক্য]

অর্থাৎ,—হে শৌনক ! যিনি মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গলের ও মঙ্গলপ্রদ, নিখিল বেদ-লতিকার পরম উপাদেয় ফল ও চিৎস্বরূপ (স্বরূপ-লক্ষণ)। সেই কৃষ্ণনাম একবার মাত্র হেলায় কিম্বা শ্রদ্ধায় পরিগীত হইলেই মনুষ্যমাত্রকেই উদ্ধার করেন।

শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীভগবন্নাম-সম্বন্ধেও তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণসকল শাস্ত্রে ও সাধুমুখে কীর্তিত হইয়াছে। তবে শ্রীনামের মহিমাদি ও শক্তির বিষয়ই অধিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু রসিক ভক্তের নিকট শক্তি ও শক্তিকার্যসকল আস্বাদ্য হইলেও যেমন উহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হইয়া সেই শক্তির আধারস্বরূপ স্বয়ংরূপ তত্ত্বের অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণের বিষয়ে অভিলাষ জাগরিত হইয়া তৎপ্রাপ্তিতেই পরম পরিতোষ লাভ হয়। সেইরূপ ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন তদীয় নামেরও সৌন্দর্য, মাধুর্য-কল্যাণগুণাত্মক স্বরূপ-লক্ষণই রসগ্রাহী শুদ্ধভক্তের চরম আকাঙ্খার ও আস্বাদনের বিষয়। তাই ভক্তি-বিভাবিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, স্বরূপের ন্যায় শ্রীনামকেই অভিন্ন বোধ হইয়া থাকে। বিদ্বদনুভব প্রমাণে অর্থাৎ মহৎগণের অনুভূত নামী ও নামের আনন্দস্বরূপত্বাদি রূপ অভিন্নতার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখিত হইতে পারে যে,—

(১) নামীর দর্শনে অনুভূতি,—

"মধুরং মধুরং মধুরস্য বিভো, মধুরং মধুরং বদনং মধুরম।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।।

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—৯২)

শ্রীকৃষ্ণরূপ-মাধুরী দর্শনে বিস্মিত শ্রীবিল্বমঙ্গলপাদের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ, শ্রীবদনমণ্ডল, তদীয় মৃদুহাস্যসহ সকল কিছুতেই এক অপূর্ব মধুর লক্ষণ।

আবার নাম-আস্বাদনে ভক্তের তদনুরূপই অনুভূতি,—

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

(পদ্যাবলী—শ্রীচণ্ডীদাসোক্ত শ্রীরাধার অনুভূতি)

নামীর ন্যায় নামেরও সেই একই মধুরতা লক্ষণ, উভয়ের অভিন্নতাসূচক।

শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভেদ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পাতকীতারণ, পতিতপাবন, কংসারী, গোবর্দ্ধনধারী প্রভৃতি শ্রীনামের মহিমাদির সূচক তদীয় তটস্থ লক্ষণের নির্দেশক। অপরপক্ষে তদীয় রূপ ও রূপধৃত (বেণু, লীলা ও প্রেম) এই মাধুর্য-সকল তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ—ইহা কেবল রসিক ভক্তেরই আস্বাদ্য। মহিমা হইতেও মাধুর্যের অধিক

আস্বাদন—তাহা শ্রীনামীর ক্ষেত্রেও যেমন, শ্রীনামের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। মহিমা তটস্থ-লক্ষণের ধর্ম, আর মাধুর্য্য স্বরূপ-লক্ষণের। মহিমা হইতে মাধুর্য অধিক মাহাত্ম্যগুণসম্পন্ন অর্থাৎ তটস্থ হইতে স্বরূপের মাহাত্ম্য অধিক ! এবং ইহা শ্রীনামী ও শ্রীনামে, উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্নতা নিবন্ধন সমসিদ্ধ। যেমন,—

(১) নামীর দর্শনে অনুভূতি,—

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিলে আঁখি দুটি
তাতে দিলে নিমেষ আচ্ছাদন,
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজন।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন তারে করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হইয়া হেন অবিচার,
মোর যদি বোল ধরে কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীগণের উক্তি—২.২১.১১২-১১৩)

এই পদে নামীর দর্শনে ইন্দ্রিয়ের অল্পতা-বোধ-লক্ষণ সূচিত হইতে দেখা যাইতেছে।

(২) নাম আস্বাদনে অনুভূতি ;—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।

(শ্রীরূপপাদকৃত বিদগ্ধমাধবে দেবী পৌর্ণমাসীর উক্তি।)

অর্থাৎ,—কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় কি পরিমাণ অমৃতদ্বারা সৃষ্ট তাহা জানি না। এই অমৃতময় নাম জিহ্বায় নৃত্যপর হইলে জিহ্বার শ্রেণী পাইতে ইচ্ছা করে। শ্রবণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্বুদ কর্ণের স্পৃহা জাগে এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে অপরাপর ইন্দ্রিয়সকল পরাভব মানে।

এই শ্লোকে নামীর ন্যায় নাম আস্বাদনে, ইন্দ্রিয়ের অপ্রতুলতা-বোধরূপ একই লক্ষণের অনুভূতি দেখা যাইতেছে। মহদনুভব প্রমাণে নামী ও নামের অভিন্নতা-লক্ষণের এ'রূপ আরও প্রমাণ উল্লিখিত হইতে পারিলেও বাহুল্যবোধে বর্জিত হইল।

তটস্থ-লক্ষণান্বিত শ্রীনাম হইতে স্বরূপ-লক্ষণান্বিত শ্রীনাম আরও উর্দ্ধস্তরে বিরাজিত হইয়া কেবল মাত্র শুদ্ধ ভক্তগণেরই আস্বাদ্য হইয়া আছেন। কৃষ্ণনামের

মহিমার বিষয়ই কেবল শাস্ত্র ও সাধুমুখে সাধারণপক্ষে জানিতে পারি কিন্তু মাধুর্য বিরল। তাই, শ্রীচরিতামৃতে, উপরোক্ত "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং—" ইত্যাদি শ্লোকপাঠে নামাবতার স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাবিষ্ট ভাব ও নামসিদ্ধ মহাভাগবত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উহা শ্রবণে আনন্দ-নৃত্যের কথা বর্ণিত হইতে দেখা যায়। কারণ স্বরূপ-লক্ষণের সুস্পষ্ট উল্লেখ স্বতঃই দুর্লভ বলিয়া, তদ্‌দৃষ্টে ও তদাস্বাদনে পূর্ণানন্দের অভিব্যক্তিও বিরল। যেমন,—

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা।।
শ্লোক শুনি হরিদাস ঠাকুর উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি।।
কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি।
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.১.৮৮-৯০)

পয়ারে 'মহিমা' শব্দে তটস্থ-লক্ষণকে এবং 'মাধুর্য' শব্দের উল্লেখে স্বরূপ-লক্ষণকে বুঝাইতেছে। শ্রীনামের মহিমা অর্থাৎ তটস্থ-লক্ষণ, শাস্ত্র ও সাধুমুখে বহুল প্রচারিত হইলেও, তদীয় মাধুর্য বা স্বরূপ-লক্ষণসকল তেমন নহে বরং কদাচিৎই যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা উপরোক্ত পয়ার হইতে সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়।



শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি

(তৃতীয় কিরণ)

বা

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

উত্তরার্দ্ধ বা বিষয় প্রকরণ

শিক্ষাষ্টক শ্লোক ব্যাখ্যা

বিশ্লিষ্ট শ্লোক ব্যাখ্যা—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং—" —প্রথম।

অতঃপর আমরা "চেতোদর্পণমার্জ্জনং—" ইত্যাদি শ্লোকটির এক একটি পদের স্বরূপ বিশ্লেষণপূর্বক যথামতি উহার অর্থ উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইব। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন অশেষ কল্যাণগুণাত্মক। সেই অপার কল্যাণ গুণরাশির আভাসমাত্রেরও তুলনা জাগতিক কোন শ্রেষ্ঠতম বস্তুনিচয়ের সাহায্যে দিবার নহে। বাস্তবিকপক্ষে জীবের জ্ঞাত, প্রাকৃত ও লৌকিক বস্তুসকলের মাধ্যমে, সেই অজ্ঞাত অপ্রাকৃত ও অলৌকিক বস্তুকে

তাহাদের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে একান্ত নিরুপায় হইয়াই যেন, পরম জীবহিতৈকব্রত মহান্ নামী শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাকৃত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া নিজ অভিন্নাত্ম শ্রীনামের অপ্রাকৃত মহামহিমা ঘোষণা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং পরম উৎকর্ষেণ বিজয়তে"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন সর্বোপরি উৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন। উহা কিরূপ ? —না, "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং"—অর্থাৎ চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনস্বরূপ। এখানে দর্পণের উপমায় চিত্তের ধর্ম বুঝিতে পারা যায়।

এখন দর্পণের কাজ কি ? —উহার সন্নিকটে ও সম্মুখে উপস্থাপিত বস্তুর যথাযথস্বরূপ প্রতিবিম্বিত করা। বস্তুর প্রকৃত প্রতিফলন ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ উক্ত দর্পণ অবিকৃত ও অমলিন থাকে।

প্রাকৃত দর্পণে সাধারণতঃ তিনটি দোষ বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়—

(১) মালিন্য, (২) বৈপরীত্য এবং (৩) অহঙ্কার।[১] নির্মল দর্পণে বস্তুর যথাযথ প্রতিবিম্ব বা স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিমলিন দর্পণে তাহা সম্ভব হয় না। এমন কি ভ্রমবশতঃ বস্তুস্বরূপের বিপরীত ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। দর্পণের মলিনতা যে প্রতিবিম্ব সম্পাদনের বাধক ইহা সহজবোধ্য। কিন্তু বৈপরীত্য (বিপরীত ভাব) দোষ-দুষ্ট দর্পণে বাম অংশ দক্ষিণ অংশের ন্যায়, কৃশকে স্থূলকায় বা স্থূলকায় ব্যক্তিকে কৃশ। খর্বকায় মনুষ্যকে দীর্ঘকায় বা তদ্‌বিপরীত অর্থাৎ দীর্ঘকায় মনুষ্য খর্বকায় বলিয়া প্রতিভাত হয়। এস্থলে চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনের কথা উক্ত হওয়ায়, বিমলিন চিত্তের বিষয়েই বলা হইতেছে, ইহাই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। তৎসহ অশুদ্ধ দর্পণের যে অপর ধর্ম 'বৈপরীত্য', সেই বিষয়টি দর্পণের পরিশুদ্ধকরণ কথাটির মধ্যে সুক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। দর্পণের মালিন্য নাশে বস্তুর যথাযথ স্বরূপের উপলব্ধি হয়। বৈপরীত্য নাশেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

আত্মবিজ্ঞান—

তুবড়ি যেমন আলোক, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম এই ত্রিবিধ পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইয়া, তদাশ্রয় বা তৎকারণরূপে নিজেও স্বতন্ত্র অবস্থান করে, সেইরূপ অনন্ত শক্তির আশ্রয় শ্রীভগবান্, নিজ নিখিল শক্তিকে প্রধানতঃ ত্রিবিধরূপে প্রকাশ করিয়াও স্বয়ং সচ্চিদানন্দঘন স্বতন্ত্র-স্বরূপে নিত্যই বিরাজমান রহিয়াছেন। ত্রিবিধ ভগবচ্ছক্তি—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন,—

বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।। (বিষ্ণুপুরাণ—৭.৬০)

১। 'দর্পণ' অর্থে দর্প বা অহঙ্কার জন্মে যাহা হইতে। ইহারই ফলে চিত্তে অহঙ্কারবোধ জন্মে।

অর্থাৎ,—শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া এই ত্রিবিধাশক্তি আছেন, তদীয় স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা নাম্নী শক্তিকে জীবশক্তি এবং অবিদ্যা যাহার কার্য এবংবিধ শক্তিকে মায়াশক্তি কহে।

পরাশক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি—ইহা অগ্নির প্রভাস্থানীয়া, ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তির অপর নাম তটস্থা বা জীবশক্তি—ইহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গস্থানীয়া, মায়াশক্তির নামান্তর বহিরঙ্গা বা জড়শক্তি, ইহা অগ্নির ধূমস্থানীয়া আর স্বয়ং শ্রীভগবান্ই কেবল তৎকারণস্বরূপ—অগ্নিস্থানীয়া।

কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসংখ্য—অপরিমিত চিৎকণ বা চিদণু- পুঞ্জকেই জীবরূপে শাস্ত্র নির্দেশ করিয়া থাকেন,—

কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীব সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।।

(শ্রীভাগবতে—শ্রুতি-ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক)

ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।। (চৈতন্যচরিতামৃত—১.৭.১১১)

শ্রুতি পরমেশ্বরকে বিভু সচ্চিদানন্দ (মহান্তং বিভুমাত্মনং—কঠোপনিষদ্-১.২.২২) এবং জীবকে অণুসচ্চিদানন্দ (এষোঽণুরাত্মা—মুণ্ডকোপনিষদ্-৩.১.৯) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ হইলেও 'জীব' আখ্যাত এই চিৎপরমাণু অনাদিকাল হইতেই নিজ অণুত্ব ও পরমাশ্রয় পরমেশ্বর হইতে বহির্মুখতা নিবন্ধন মায়ার অবিদ্যা-নামক পাশ দ্বারা সংবদ্ধ হইয়াছে। ভগবদ্‌বৈমুখ্যতারূপ ছিদ্র বা দোষই জীবের পক্ষে মায়াধীনতার কারণ হইলেও, অনাদিত্ব নিবন্ধন উক্ত কার্য কারণ উভয়কেই যুগপৎ সংঘটিত বলিয়া জানা আবশ্যক।

অনাদিকাল হইতেই জীবের এই কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বা ভগবদ্‌বৈমুখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া সংসার-দুঃখ-প্রদানরূপ দণ্ড বিধানপূর্বক জীবকে সংশোধন-মানসে, মায়া নিজ 'আবরিকা' ও 'বিক্ষেপিকা' নামক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা যথাক্রমে জীবের স্বরূপজ্ঞান আবরণপূর্বক, জড়ীয় দেহ-গেহাদি বিষয়ে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ ভ্রান্তবুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকেন। আত্মবিস্মৃতির এই বিষময় ফলস্বরূপ জড়সঙ্গ ও জড়ীয় কর্মের দ্বারা জীবের স্বকর্মানুরূপ যে বারম্বার বিবিধ প্রকার দেহসংযোগ ঘটে, তাহারই অপর নাম সংসারগতি। সংসারগতি প্রাপ্ত জীবমাত্রকেই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বা ত্রিতাপের সহিত ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জড়রূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ সর্বদা ভবভয়ে ভীত হইতে হয়।

একই বৈদুর্যমণি হইতে বিকীর্ণ নীল, পীত ও লোহিতাদি বর্ণবিন্যাসের ন্যায়, এক

সর্বশক্তিমৎ শ্রীভগবানের আশ্রিতা ও তদীয় স্বাভাবিকী বিবিধ শক্তির মধ্যে ('যো একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্—' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-৪.১) প্রধাণতঃ ত্রিবিধা শক্তিই যথাক্রমে (১) অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, (২) তটস্থা বা জীবশক্তি এবং (৩) বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে একমাত্র জীবশক্তিই তটস্থা অর্থাৎ উভয়ভাবাপন্ন বলিয়া, জীবশক্তিকেই হয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত,—না হয় অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করিতে হয়। এই উভয় ভাবের যে কোন এক পক্ষকে অবলম্বন না করিয়া জীবশক্তি কেবল নিজভাবে অবস্থিত হইতে অসমর্থ বলিয়া জীবকে 'তটস্থাশক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। তদ্ব্যতীত স্বরূপশক্তি ও মায়া বা জড়শক্তি—এই শক্তিদ্বয় নিত্যই নিজভাবে অবস্থিত ভিন্ন অপর কোন শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় না। জীবশক্তির সহিত অপর শক্তিদ্বয়ের ইহাই বৈশিষ্ট্য। লৌহ যেমন অগ্নি সংযোগে লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া অগ্নির ধর্ম্ম কিম্বা বরফের সান্নিধ্যে শৈত্যগুণ প্রকাশ করিলেও, নিজ লৌহত্ব পরিত্যাগ করিয়া অনলে কিম্বা তুষারে পরিণত হইয়া যায় না, সেইরূপ জীবাখ্য তটস্থাশক্তিও স্বরূপশক্তি ও মায়া বা জড়শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেও, তৎসহ কোন প্রকারে একাত্ম বা একীভূত বা তৎশক্তিরূপে পরিণত হইয়া যায় না। কারণ শক্তিত্রয়ের বৈশিষ্ট্য ইহাও নিত্য।

আত্মবিস্মৃত জীব যখন অনাত্ম বা জড়ীয় ভাবের সাম্মুখ্য প্রাপ্ত হয় তখন জড়দেহকেই আত্মা বা আমি মনে করায়, সেই জড়দেহ সম্পর্কীয় জড়ীয় বিষয় সকলে আমার বা 'আত্মীয়' বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। চিদাত্মজীবের এই জড়াত্মতা—স্বরূপভাবের বিপরীত। এই যে বিরূপতা—ইহাই জীবের জড়-সাম্মুখ্য এবং এই জড়-সাম্মুখ্যও আবার সংসারী জীবের অনাদিসিদ্ধ। বহির্মুখতার অর্থ চিদ্ বৈমুখ্য। জড়সাম্মুখ্য ঘটিলেই চিদ্‌বৈমুখ্য অনিবার্য ; যেহেতু উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাশ্রয়। যেখানে যে পরিমাণ জড়সাম্মুখ্য, সেখানে সে পরিমাণ চিদ্‌বৈমুখ্য এবং যেখানে যে পরিমাণ চিদ্‌বৈমুখ্য সেখানে সেই পরিমাণ জড়সাম্মুখ্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। আবার চিদ্ সাম্মুখ্য বা চিদ্‌ভাবের সম্মুখতা ঘটিলেই সেই পরিমাণে জড়বৈমুখ্য বা জড় বিমুখতা অবশ্যম্ভাবী। উত্তর ও দক্ষিণ দিক পরস্পর বিপরীতস্থিত হওয়ায়, যেমন কাহারও উত্তর-সাম্মুখ্য বা উত্তরদিক সম্মুখবর্তী হইলেই দক্ষিণদিক পশ্চাদবর্তী বা দক্ষিণ-বৈমুখ্য—এই উভয় যুগপৎ সংঘটিত হয়। তেমনি জীবের চিদ্‌বৈমুখ্য ও জড়-সাম্মুখ্য অথবা জড়বৈমুখ্য ও চিদ্‌সাম্মুখ্য উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্রীনামসংকীর্তনের সংযোগে জীবের মলিন চিত্ত মার্জিত হইয়া, প্রকৃষ্ট স্বরূপভাব জাগ্রত হইলে, অনাদি জড়সাম্মুখ্যবশতঃ 'দেহ' আমি-বোধ অপনোদিত হইয়া চিদ্‌সাম্মুখ্য ঘটিবার ফলে 'আত্মা' আমির উপলব্ধি হয়।

বহুদিনের অব্যবহার কারণে ধুলিধূমে আবৃত হওয়ায় বিমলিন হইয়া পড়িলে—সেই দর্পণে যেমন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না ; সেইরূপ অনাদিকাল হইতে শ্রীহরি-বহির্মুখ ও মায়া-উন্মুখ জীবের চিত্ত, অবিদ্যাদি ধুলিধূমের আবরণে বিমলিন হইয়া রহিয়াছে বলিয়া জীবের আত্মস্বরূপের প্রকৃষ্ট প্রতিফলনে ব্যাহত হইতেছে। ইহাই চিত্তদর্পণের মালিন্য দোষ। আবার চিন্ময় বা আত্মবস্তু জীবের পক্ষে বৈপরীত্য দোষদুষ্ট চিত্তদর্পণের প্রভাবে তৎস্বজাতীয় পরমাত্মবস্তুর স্বরূপ অবলোকনের পরিবর্তে, অনাত্ম বা জড়বস্তুই বিপরীতভাবে পরমাত্ম-বস্তুর ন্যায় বোধ হইতেছে। (বৈপরীত্য) আর তাই প্রিয় ও সুখস্বরূপ আত্মবস্তুর বিপরীত অপ্রিয় ও অসুখকর অনাত্মবস্তু বা জড় বিষয়েই একান্তভাবে আমি বা আমার বোধে প্রিয়তা ও সুখান্বেষণ তৎপরতা চলিতেছে। (অহঙ্কার) অনাদিকালের কৃষ্ণবৈমুখ্য বা চিদ্‌বৈমুখ্যবশতঃ জড়সাম্মুখ্য বা বিষয়-উন্মুখতারূপ বিপরীতভাব ও মালিন্যাদিদোষ জীবচিত্তে স্থান পাইয়াছে।

আবার মলিন দর্পণ মার্জিত হইলে যেমন তাহার মালিন্যদোষ দূর হইয়া প্রতিফলনক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, তদ্রূপ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের চিত্তদর্পণও যদি জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনামসঙ্কীর্তন দ্বারা মার্জিত হয়, তাহার মালিন্যদোষ অপনোদিত হইয়া যথার্থ চিৎস্বরূপ প্রকাশমান হয়েন। এখন মার্জন দ্বারা যেমন প্রাকৃত দর্পণের মালিন্যদোষই কেবল বিদূরিত হয়, কিন্তু বৈপরীত্য যায় না—শ্রীনামসঙ্কীর্তনের ক্ষেত্রে কিন্তু মালিন্যদোষতো বটেই বৈপরীত্যদোষও বিদূরিত হয়। কারণ জীবের প্রকৃষ্ট আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হইলেই তদাশ্রয় পরমাত্মস্বরূপ পরমাত্মার ও পরমাত্মা শ্রীভগবৎস্বরূপ স্বতঃই উপলব্ধি হয়—যাহার ফলে কৃষ্ণোন্মুখতার উদয় হয়। আর জীবের চিদ্ উন্মুখতা জাগিলেই জড়বিমুখতাও যুগপৎ সিদ্ধ হয়। অনাত্ম বা প্রাকৃত জড়ীয়বস্তুর সহিত চিদ্‌বিষয় বা আত্মবস্তুর উপমা যে সর্বাংশে কত অসম্পূর্ণ তাহা উক্ত দৃষ্টান্ত হইতেই পরিস্ফুট হইবে। কারণ, মার্জন দ্বারা জাগতিক-দর্পণের মালিন্যদোষ দূর হইলেও বৈপরীত্যদোষ দূর হয় না। কিন্তু সকল সন্তাপহারী শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনরূপ মার্জনের দ্বারা জীবচিত্তের যুগপৎ উভয় দোষই বিদূরিত হইয়া যায়।

আলোকের বিপরীতমুখে গমন করিলে নিজ-ছায়াই যেমন অন্ধকার সৃজন করে,—তদ্রূপ অনাদি চিদ্‌বৈমুখ্যবশতঃ জড়সাম্মুখ্য প্রাপ্ত জীবের চিত্তে মায়া আসিয়া অবিদ্যাদির কালিমায় আত্মবস্তুর সত্যস্বরূপকে আবৃত করায়—অসত্য বিষয়ই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।[১] ইহাই বহির্মুখ জীবের প্রতি অঘটন-ঘটনপটিয়সী মায়ার দূরপনেয় প্রভাব। এই মালিন্যরূপ অবিদ্যার অন্ধকারের ফলেই দেহগেহাদি জড়ে 'আমি' ও 'আমার' বোধ করাইয়া, আত্মবিস্মৃত জীবের অনাদি জন্মমৃত্যুরূপ সংসারবন্ধন সৃজন করিতেছে।

১। "অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, নিতাইপদ পাসরিয়া, অসত্যেরে সত্য করি মানি।" (ঠাকুর মহাশয়)

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।। (শ্রীভাগবত—২.৫.১৩)

অর্থাৎ,—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথেও থাকিতে বিলজ্জিতা, নির্বোধ জীব সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিতা হইয়া দেহ-গেহাদিতে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

মায়া প্রতারিত জীবের পক্ষে মায়ার এই প্রতারণা অনাদিকালের সংঘটনা। শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, কর্ম, কাল ও মায়া—ইহাকেই 'পঞ্চ-অনাদিতত্ত্ব' বলা হইয়াছে। বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে পূর্বাপর নির্ণয় করিবার অবকাশ না থাকিলেও বীজকেই যেমন বৃক্ষের কারণ বলা হয়—সেইরূপ কৃষ্ণবৈমুখ্য ও মায়া-সাম্মুখ্য উভয়ই অনাদিসিদ্ধ বলিয়া, উভয়ের মধ্যে পূর্বাপর নির্ণয় না হইলেও—কৃষ্ণবিমুখতাকেই মায়া-সাম্মুখ্যের কারণ বলিয়া নির্ণয় করা হয় এবং ইহা অনাদিকাল হইতেই চলিতেছে।

এই হরি-বহির্মুখতার ফলেই মায়া-সম্মোহিত জীবের—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—মায়াকর্তৃক এই 'পঞ্চ-পর্বের' বন্ধনদশা উপস্থিত হয়। যথা,—

(পাতঞ্জল মতে)—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।"—মায়ার বন্ধনের পর অবিদ্যাকৃত অস্মিতা অর্থাৎ অহন্তা ও মমতার ফলে অনাত্ম জড়দেহে আমি এবং জড় গেহাদিতে আমার বোধ সৃজিত হইয়া থাকে।[1]

বিষয়-গ্রহণ প্রণালিতে চক্ষুকর্ণাদি হইল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বা বাহ্যকরণ বা বহিরিন্দ্রিয়। এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এই চতুর্বিধ হইল অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়। কোন বস্তু বা বিষয় চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও মনের সংযোগ ভিন্ন ইহা অনুভূত হয় না। যেমন কোন বিষয় গ্রহণকালে উহা প্রথমে মনে সামান্যতঃ স্পৃষ্ট হয়, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিতে বিশেষরূপে গ্রাহ্য হয়, তৃতীয়তঃ চিত্তে উহার চিন্তন দ্বারা তৎসম্বন্ধে কর্তব্য বা কার্য স্থির হয়। এই হেতু কর্ম-প্রবৃত্তির মূলে 'চিত্ত'ই প্রধান কেন্দ্র। কারণ চিত্তের দ্বারাই কর্মপ্রেরণা উদ্ভূত হয়। সাংখ্যকারগণের মতে চিত্তের পৃথক সত্তা স্বীকৃত না হইলেও অহংরূপ ভূমিকার উপরেই মন, বুদ্ধি ও চিত্তের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া। সুতরাং চিত্তই সর্বশেষ চিন্তন কেন্দ্র।[2]

অহংকার বা সর্ব বিষয়ে আমি বোধ অর্থাৎ দেহাত্মবোধরূপ অবিদ্যাগ্রস্থ জীবের চিত্তে আমার মন ; আমার বুদ্ধি ইত্যাদি অহঙ্কারের এই ভিত্তি বা বেদীর উপর মন, বুদ্ধি

১। "রাগ" অর্থাৎ জড়বিষয় ভোগে অনুরাগ। "দ্বেষ"—প্রতিকূল ভোগ্য জড়বিষয়ে বিরাগ। "অভিনিবেশ"—বিষয়াসক্তিজনিত দেহের বিনাশে আত্মবিনাশরূপ মরণাশঙ্কা। এই পঞ্চপর্বের শ্রীভাগবতোক্ত অপর নাম—(১) তমঃ (২) মোহ (৩) মহামোহ (৪) তমিস্রা ও (৫) অন্ধতমিস্রা। ইহাই আবার বিবিধ নরকরূপে কথিত হইয়া থাকে।

২। সঙ্কল্প বিকল্পাত্মকং মনঃ। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। অহংকর্ত্তা-অহংকারঃ চিন্তনকর্ত্তৃ-চিত্তম। (তত্ত্ববোধ)

ও চিত্তের অধিষ্ঠান ও তৎ তৎ ক্রিয়া সানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জাগতিক সকল জীবের পক্ষে অন্তঃকরণই—কার্যাকার্য বিষয় নির্ণয় করিবার পক্ষে মূল বা প্রধান। পঞ্চ-বহিরিন্দ্রিয় (যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) কৃত গ্রাহ্যবস্তু অন্তঃকরণ দ্বারাই উপলব্ধি হয়। এখন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট স্পৃষ্ট বা গৃহীত কোন বস্তু মাত্রের প্রথম প্রেক্ষণ মনের উপর। এই 'মন' আবার 'সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক'। উহা স্থিরভাবে কিছু নিশ্চয় করিতে পারে না। এমতাবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট, স্পৃষ্ট বা গৃহীত বস্তুর 'প্রতিচ্ছবি' বুদ্ধি-বৃত্তির নিকট প্রেরিত হইলে, বুদ্ধি 'নিশ্চয়াত্মিকা' বৃত্তির দ্বারা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করে ;—তদনন্তর চিত্তে 'চিন্তন' বা চিন্তাশক্তির দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য স্থিরীকৃত হইয়া উহারই নির্দেশে বা পরিচালনায় কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগতে কর্মরূপে প্রকাশ পায়। যেমন কাহারো গমনকালে পথিমধ্যে পতিত কোন লভ্যমান বস্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য হইল। এস্থলে উক্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর 'প্রতিচ্ছবি' মনের নিকট প্রেরিত হইলে মন, তাহা সর্প না রজ্জু উহা স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিলেও তৎকর্তৃক উপলক্ষিত গৃহীত বস্তুমাত্রই বুদ্ধির নিকট প্রেরিত হইলে বুদ্ধি উহাকে সর্প বা রজ্জু হিসাবে স্থির নিশ্চয় করে। অনন্তর চিত্ত করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করে অর্থাৎ সর্প হইলে সাবধান হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করিতে ও রজ্জু হইলে ভীত না হইতে নির্দেশ দেয়। সুতরাং জীবের কার্যকারণ বিষয়ক ক্রিয়াসম্বন্ধে 'চিত্ত'ই উত্তমা। এইহেতু ঐহিক বা পারত্রিক বিষয়ে ঔচিত্য নিবন্ধন চিত্তই প্রধান নির্দেশিকা। আত্মানাত্ম বস্তুনিচয় সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয়ে চিত্তের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

এইহেতু চিত্তই কর্মপ্রেরণার মূল হওয়ায় মানস-মুকুর ও বুদ্ধি-দর্পণ প্রভৃতি না বলিয়া শ্লোকোক্ত 'চিত্তদর্পণ' শব্দটি প্রযুক্ত হওয়া সর্ববিষয়ে সুসঙ্গত হইতেছে। মন ও বুদ্ধির অনুল্লেখে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক "চেতোদর্পণ—" বলিবার ইহাই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়।

নির্গুণ চিৎকণ জীবের দেহ ও চিত্তাদি সকল ইন্দ্রিয়ই মায়িক বা জড়শক্তি সম্ভূত সুতরাং মলিন। মলিন চিত্ত হইতে চিন্তিত সকল জড় বিষয়-বাসনাও মলিন। আবার মলিন বিষয়-চিন্তা হইতে সমুদ্ভূত জীবের সকল কর্মও মালিন্য দোষদুষ্ট। সুতরাং জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধনও ভয়ের হেতু।

জড়শক্তি বা মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধা গুণাত্মিকা। সুতরাং মায়িক বস্তুমাত্রেই সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়। জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু কিন্তু জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই মায়িক জড়বস্তু। চিদ্‌বস্তু মাত্রেই স্বরূপতঃ নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণত্রয়ের অতীত। সুতরাং স্বরূপতঃ নির্গুণ হইয়াও মায়াধীনতার জন্য দেহাত্মবোধযুক্ত জীবমাত্রেই অনাদি কৃষ্ণবহির্মুখ, এইহেতু ত্রিগুণা প্রকৃতি বা মায়াপাশবদ্ধ হইয়া পড়ায় অনাত্ম বা জড়বস্তুর ধর্ম অনিত্যতা ও অসুখকারিতা—জন্মমৃত্যু ও ত্রিতাপাদি সংসারপাশরূপে

সংঘটিত হইয়া থাকে। যথা,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।। (গীতা—১৪.৫)

অর্থ,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই তিনটি গুণ, নির্বিকার দেহী বা জীবাত্মাকে দেহ সংঘটনপূর্বক তন্মধ্যে সংবদ্ধ করিয়া রাখে। রজস্তমোযুক্ত জীবের অবিদ্যাগ্রস্ত মলিন চিত্তে জড়বিষয় বা ভুক্তি বাসনারই প্রকাশ হইয়া থাকে। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণীতে সত্ত্বাদি প্রাকৃত হেয়গুণসকলের ধর্ম ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই বলা যাইতেছে, যথা,—

(১) সত্ত্ব— তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। (গীতা—১৪.৬)

অর্থ,—হে অনঘ ! ত্রিগুণ মধ্যে এই সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া উহা প্রকাশ স্বভাব ও উপদ্রবশূন্য। উহা জীবকে সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

(২) রজঃ—রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।। (গীতা—১৪.৭)

অর্থ,—হে কৌন্তেয় ! তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে জাত রজোগুণ অনুরঞ্জনাত্মক জানিবে ; উহা জীবকে কর্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।

(৩) তমঃ—তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।। (গীতা—১৪.৮)

অর্থ,—হে ভারত ! তমোগুণ অজ্ঞানজাত, এ'জন্য মোহজনক। উহা জীবকে অনবধানতা, অনুদ্যম ও অবসাদ দ্বারা আবদ্ধ করে।

পুনরায় ত্রিগুণের কার্যকারিতা সম্বন্ধে একত্রে উক্ত হইতেছে, যথা,—

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।। (গীতা—১৪.৯)

অর্থ,—হে ভারত ! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করিয়া রাখে।

কিম্বা,— সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।। (গীতা—১৪.১৭)

অর্থ,—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আর এই গুণ-সম্বন্ধের বা সংযোগের ফলস্বরূপ জীব যে গতিপ্রাপ্ত হয় তাহাও অতি সুস্পষ্টরূপে শ্রীভগবান্ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা,—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠতি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।। (গীতা—১৪.১৮)

অর্থ,—সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, রজঃপ্রধান জনগণ মনুষ্যলোকে অবস্থান করেন এবং জঘন্য গুণের অর্থাৎ তমোগুণের বৃত্তিতে জীবকে অধোগামী হইতে হয়।

রজঃ তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত ভুক্তিচ্ছামূলক ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ বিষয়-বাসনা ও তৎসাধনের উপায়স্বরূপ হিংসাযুক্ত বা অহিংস সকাম কর্মাদি বিষয়ে, বেদাদি শাস্ত্রে অজস্র পন্থা উক্ত হইয়াছে কিন্তু সত্ত্বগুণ নির্মল স্বভাব হওয়ায় তাহা হইতে জ্ঞান (সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্) ও তৎফলে ক্রমশঃ মুক্তির ইচ্ছাই উদয় হইতে দেখা যায়। তথাপি ভুক্তিচ্ছা ও মুক্তিচ্ছা উভয়ই মলিন ; কারণ ঐ সকল প্রাকৃতগুণ-সম্বন্ধযুক্ত ও সকাম বিষয়। উক্ত বিষয়ই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে'রূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। যথা,—

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—বাঞ্ছা এই সব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১.৫০)

তাহা হইলে ত্রিগুণ-মুক্তির উপায় কি ? তদুত্তরে বলা যায় যে,—স্বরূপতঃ নির্বিকার, নিত্য, অমৃত ও আত্মবস্তু হইয়াও জীবের অনাদি কৃষ্ণবৈমুখ্যতারূপ বিপরীত কর্মবশতঃ মায়াকর্তৃক ত্রিগুণরচিত দেহসংযোগ ও তৎফলে জন্ম-মৃত্যুরূপ উভয় পদক্ষেপে সংসারারণ্যে ভ্রমণ, অনাদিকাল হইতেই চলিতেছে। সুতরাং সেই সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হওয়াই জীবের সকল ভয়, ভাবনা, দুঃখ, শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব লাভের উপায়রূপে ঐ শ্রীগীতাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।। (গীতা—১৪.২০)

অর্থ,—দেহী (জীবাত্মা) দেহ-সংঘটক এই গুণত্রয়কে অতিক্রমপূর্বক সংসাররূপ জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্রদৃষ্টে জানা যায়—নির্গুণা ভক্তিই গুণসম্বন্ধ মুক্তির একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ গুণসম্বন্ধে গুণ মুক্ত হওয়া যায় না। এমন কি সত্ত্বগুণ প্রকাশ স্বভাব হইলেও স্ব-সুখ-তাৎপর্যময় সকাম মোক্ষ-বাসনা-নিবন্ধন অজ্ঞানতারূপ কৈতব দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়ায় বন্ধনেরই কারণ হইতেছে[১]।

১। গ্রন্থকারকৃত শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পূর্বোক্ত "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ"—(গীতা—১৪.৬) ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত জ্ঞান ও যোগ মূলতঃ সাত্ত্বিক, এই হেতু পরিণামে নির্গুণা ভক্তিসঙ্গেই মুক্তি সিদ্ধিপ্রদ হয়।

রজোগুণও বন্ধনের কারণ। পূর্বোক্ত "রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি"—(গীতা—১৪.৭) ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। কর্মের ফল বন্ধনই। কর্মে ভক্তি আরোপেই সিদ্ধি হয়। ভক্তি আরোপিত হইলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তখন নিষ্কাম কর্মে মতি হয়। নিষ্কাম কর্মের ফলে জ্ঞানের অধিকার জন্মে।

তমোগুণও স্পষ্টতই বন্ধনের মূল—কারণ তমোগুণ অশুদ্ধ। ভক্তি আরোপে উহা ক্রমশঃ উন্নত হয়। পূর্বোক্ত—"জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।"—(গীতা—১৪.৯) ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

একমাত্র ভক্তিই নির্গুণা—অর্থাৎ প্রাকৃত ত্রিগুণের অতীত গুণরহিত ভক্তিসঙ্গ ব্যতীত কোন সাধনাতেই সিদ্ধি নাই। সকল শাস্ত্রের সারকথা এই যে—মন্ত্রীর মন্ত্র ; তপস্বীর তপ ; কর্মীর কর্ম ; জ্ঞানীর জ্ঞান ; যোগীর যোগ—সকলই ভক্তিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনও সুফল প্রদান করিতে পারে না। ভক্তিই সাধনজগতে মহারাণী, ভক্তিই সর্বপ্রধান সাধ্য ও সাধনা। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—সকলেই ভক্তিমুখাপেক্ষী—কেবল ভক্তিই অনন্যাপেক্ষী—সুতরাং ইহাদের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতিতুচ্ছ। যথা,—

ভক্তিমুখ নিরীক্ষক—কর্ম, যোগ, জ্ঞান।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে ফল।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২২.১৪-১৫)

ভক্তিই সকল সাধনা ও সকল সিদ্ধির জীবন স্বরূপিণী। প্রাণহীন দেহ যেমন বর্জনীয় হয়, ভক্তিসম্বন্ধ রহিত সাধনাও সেইরূপ সর্বদা পরিত্যাজ্য।

জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ।

[হরিভক্তিবিলাস (১১.৫৬৯) ধৃত বৃহন্নারদীয় বাক্য]

ইহার অর্থ,—জীবগণ যেমন জননীকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণে সমর্থ হয় ; সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

দেহধারী জীবের সগুণ বা সত্ত্বাদি গুণসংযুক্ত অবস্থায়, 'কৈতব' বা অজ্ঞানতার বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী। তাই সকৈতব অবস্থায় সত্ত্বাদি গুণ বা বৃত্তি অনুসারে জনসাধারণের প্রবৃত্তি জন্মে সগুণা ভুক্তি কিম্বা মুক্তির সাধনায়। নির্গুণ শ্রীভগবৎ বিষয়ে বা তৎসেবাদিরূপা ভক্তি-বিষয়ে তদ্রূপ প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। এইহেতু সত্ত্বাদি

গুণসংযুক্ত অবস্থায় তদনুরূপ শ্রেয়ঃ লাভের নিমিত্ত—চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম রূপ ভুক্তির ও মুক্তির ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে সকল শাস্ত্রে,—যাহা জনসাধারণের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধার উপযোগী।

জীবের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে তৎস্বভাবজা শ্রদ্ধা। প্রকৃতিগত সগুণা শ্রদ্ধায় সগুণা বিষয়েই রতি হয়। জীবের স্বভাবজ শ্রদ্ধা সত্ত্বাদি ভেদে ত্রিবিধ হওয়ায়—ত্রিবিধ বিষয়েই তাহার কর্মপ্রবৃত্তি নিয়োজিত। স্বভাবজ শ্রদ্ধার অতিরিক্ত নির্গুণা (প্রাকৃত গুণ-সম্বন্ধ রহিত) শ্রদ্ধা নির্গুণ বা ভাগবতী বৃত্তির অবিদ্যমানতায়, শ্রীভগবান্ বা তৎসেবাদি বিষয়ে সাধারণতঃ জীবের যে প্রবৃত্তি থাকে না—এ'বিষয়ে সেই স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি দেখিতে পাই, যথা,—

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসতে ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্।। (শ্রীভাগবত—১১.২১.৩২)

অর্থাৎ,—রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণনিষ্ঠ ব্যক্তিসকল রজঃসত্ত্বতমোগুণ-সেব্য ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতির উপাসনায় যে প্রকার প্রবৃত্ত হয়,—আমার উপাসনায় সে'রূপ প্রবৃত্ত হয় না।

যে জাতীয় শ্রদ্ধায় যে'রূপ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাও শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন। যথা,—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ।। (শ্রীভাগবত—১১.২৫.২৭)

তাৎপর্যার্থ,—জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী, স্বর্গাদি প্রাপক যজ্ঞাদি কর্মে যে শ্রদ্ধা—তাহা রাজসী। অধর্মাদি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই তামসী ; আর আমার (শ্রীভগবানের) সেবারূপা ভক্তিলাভে যে শ্রদ্ধা, তাহাই নির্গুণা।

এখন উপরোক্ত বিষয়টি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাইতেছে। প্রাকৃত জগতে সাধারণতঃ 'পুরুষার্থ' বলিয়া প্রসিদ্ধ 'ভুক্তির' অন্তর্গত ধর্মার্থ-কাম ও তদতিরিক্ত 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ'—এই চতুর্বর্গই উক্ত গুণসম্বন্ধযুক্ত। জীবের স্বভাবানুরূপ—তামসী ও রাজসী শ্রদ্ধায় ভুক্তি বিষয়ে এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় মুক্তি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা। গুণসংস্পৃষ্ট জীবে নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাবে নির্গুণা ভাগবতী বৃত্তি বা শুদ্ধাভক্তি বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মে না।

সুতরাং সেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে হইলে, সেই প্রবৃত্তির মূলে প্রয়োজন তদনুরূপ শ্রদ্ধার। যেহেতু জীবের সকল কর্মপ্রবৃত্তির মূলে তজ্জাতীয় শ্রদ্ধার অবস্থিতি অনিবার্য। ত্রিগুণসংবদ্ধ জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাও সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিগুণাত্মিকা ও ত্রিবিধা হওয়ায়, সেই সগুণা শ্রদ্ধায় মায়িক সগুণ বিষয়েই জীবের প্রবৃত্তি। যথা,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।। (গীতা—১৭.২০)

অর্থ,—দেহধারী জীবের শ্রদ্ধা স্বভাবানুসারিণী সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা হইয়া থাকে,. ইহা—শ্রবণ কর।

তাহা হইলে গুণসম্বন্ধ অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তির মূলে যে শ্রদ্ধা থাকা চাই—তাহাও নির্গুণা হওয়া আবশ্যক। যেহেতু জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধায় নির্গুণ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না।

একমাত্র শ্রীভগবদ্ সেবাবাসনাই নির্গুণ, অকৈতব, অমলিন, নির্মল। ইহা ব্যতীত অপর সকল কিছুই ভুক্তি, মুক্তি কিম্বা সিদ্ধির বাসনা পর্যন্ত সকৈতব—অর্থাৎ অজ্ঞানতানিবন্ধন মলিন। তাই ভক্ত বা ভাগবত ধর্ম লক্ষণ নিরূপণের প্রারম্ভেই, ভক্তির উক্ত-বৈশিষ্ট্য শ্রীমদ্ভাগবতে অসঙ্কোচে ও উদাত্তস্বরে কীর্তিত হইয়াছে, যথা,—

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্—" (১.১.২) অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের পরমধর্ম নিরূপণ করা হইয়াছে। সেই পরম ধর্মটি কিরূপ ? —তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রকৃষ্টরূপে ত্যক্ত হইয়াছে 'কৈতব' অর্থাৎ স্ব-সুখ-তাৎপর্যরূপ কপটতা যাহাতে। ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"প্র" শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। —অর্থাৎ প্র শব্দে মোক্ষাভিলাষকেও নিষেধ করা হইয়াছে।

একমাত্র প্রকৃষ্টরূপে নির্গুণ হইলেই যে সগুণ মায়িক-সম্বন্ধকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহা পূর্বালোচনার পর জীবের অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ের আধিকারিক দেবতাগণের বিষয়ে আলোচনা করিলে আরও যথার্থভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়। জীবের চিত্তাদি অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় সগুণ বা মায়িক বস্তু ; উহাদের অধিকারী দেবতাগণ হইলেন, যথাক্রমে (১) মনের দেবতা—চন্দ্র, (২) বুদ্ধির দেবতা—ব্রহ্মা, (৩) অহঙ্কারের—রুদ্র এবং (৪) চিত্তের—বাসুদেব। যথা,—"মনসো দেবতা চন্দ্রমাঃ। বুদ্ধের্ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্য রুদ্রঃ। চিত্তস্য বাসুদেবঃ।"—তত্ত্ববোধঃ।

এক্ষণে লক্ষণীয় যে জীবচিত্ত অপরাপর অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ন্যায় সগুণ বা মায়িকবস্তু হইলেও, উহার অধিষ্ঠাতা 'বাসুদেব' কিন্তু 'নির্গুণ'। তিনি অপরাপর অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার ন্যায় সগুণ নহেন। অপরপক্ষে রুদ্র ও ব্রহ্মা সান্নিধ্য দ্বারা তমো রজঃ গুণের পরিচালক। কিন্তু বিষ্ণু (নির্গুণ বলিয়া) কেবল সঙ্কল্প দ্বারাই সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ নির্গুণ ভগবত্তত্ত্ব কখনই গুণ-সংস্পৃষ্ট নহেন। যথা,—

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।। (গীতা—১৩.৩৩)

অর্থ,—যেমন সর্বব্যাপী আকাশ পঙ্কাদি সর্ববস্তুতে থাকিয়াও স্বয়ং অতিসূক্ষ্ম

সুতরাং অসঙ্গ বলিয়া কোন বস্তুরই সহিত লিপ্ত হয়েন না, সেইরূপ আত্মা সর্ববিধ দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত।

"যাহার ভগবত্তা লইয়াই অন্যের ভগবত্তা", অন্যকে কোন বিষয়ে অপেক্ষা না করিয়া যিনি অভিব্যক্ত হয়েন অর্থাৎ যিনি স্বতঃসিদ্ধ তাঁহাকেই "স্বয়ংরূপ" কহে,—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্।

একই 'স্বয়ংরূপ' যখন যুগপৎ অনেকরূপে প্রকট হইয়া থাকেন তাহাকে '**প্রকাশ**' কহে। প্রকাশ দ্বিবিধ—প্রাভব প্রকাশ ও বৈভব প্রকাশ। যে প্রকাশে স্বয়ংরূপ হইতে আকার ও গুণলীলাদির কোনরূপ ভেদ পরিলক্ষিত না হয়, তাহাকে **প্রাভব প্রকাশ** ; যেমন রাসমণ্ডলে দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ। এই প্রকাশ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ। আর যে প্রকাশে স্বয়ংরূপ হইতে আকার ও গুণাদির অতি অল্পই পার্থক্য থাকে তাহাকে **বৈভব প্রকাশ** কহে,—যেমন 'বাসুদেব যখন দ্বিভুজ' এবং বলদেব যখন ব্রজে গোপভাবে—তাঁহারা তখন বৈভব প্রকাশ। আর যখন 'বাসুদেব চতুর্ভুজ' ও বলদেব যখন মথুরা ও দ্বারকায় ক্ষত্রিয়ভাবে তখন তাঁহারা প্রাভব বিলাস। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০.১৬৬-৬৮, ১৭৪-৭৮ ও ১৮৭-৮৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের চতুঃপার্শ্বস্থ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক ব্যূহচতুষ্টয়ের নাম 'আদি বা প্রথম চতুর্ব্যূহ' এবং বৈকুণ্ঠনাথ—নারায়ণের চতুঃপার্শ্বস্থ বাসুদেবাদি মূর্তি চতুষ্টয় দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ যথাক্রমে প্রথম চতুর্ব্যূহের বিলাস। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২.২০.১৯২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু, অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত–২.২২.৩০)

এ'স্থলে 'গুরু' শব্দে শিক্ষাগুরুকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। যেহেতু শিক্ষার কথাই এই পয়ারের অভিপ্রায়। এতদ্ব্যতীত অন্তর্যামীরূপ শিক্ষাগুরুর কথাও বলা হইয়াছে, পরবর্তী পয়ারে আরও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ—মহান্ত স্বরূপে।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত–১.১.৪৭)

তাহাতে বুঝিলাম অন্তর্যামী গুরুর সহিত বাহ্যতঃ সাক্ষাৎকার হয় না, তিনি অন্তরে থাকিয়া কেবল প্রেরণা দ্বারাই জীবকে শিক্ষা দেন।

এখন চৈত্যগুরুরূপ শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বা স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতের উক্তি, যথা,—

শিক্ষাগুরুকে তো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত–১.১.২৮)

স্বরূপ বলিতে প্রায় কৃষ্ণসম অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ। এখন অন্তর্যামীরূপে উক্ত হওয়ায়—উনি কি অন্তর্যামী পরমাত্মা ? ইহাই জিজ্ঞাস্য। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অন্তর্যামী পরমাত্ম-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ, সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিলেও ('হৃদ্যেষ আত্মা'—শ্রুতি) তিনি তদবস্থায় কেবল জীবের কর্মের সাক্ষীমাত্র। তদ্ভিন্ন তিনি (পরমাত্মা) জীবকৃত কোন শুভাশুভতেই লিপ্ত নহেন।

সুতরাং হৃদয়স্থিত পরমাত্মা যিনি তিনি জীবের অন্তর্যামী হইলেও শিক্ষাদাতা নহেন। চিন্তনকেন্দ্র 'চিত্ত' হইতেই জীবের সকল কর্মের প্রেরণা আসে। এই অন্তর্যামীকে চৈত্যগুরুরূপে স্পষ্টতঃ নির্দেশ করায়, ইহাকে চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—"বাসুদেব" বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। (চিত্তস্য বাসুদেবঃ)। সুতরাং জীবের অন্তর্যামী—চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেবস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণা দ্বারা ভাগ্যবান্ সংসার-তরণেচ্ছু জীবকে তৎপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষাদান করেন। এই 'চৈত্যগুরুর' প্রেরণার কথাই, গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি হইতে জানা যায়,—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।" (গীতা—১০.১০)

উক্ত চৈত্যগুরুরূপে জীবে শিক্ষাদান—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রকারান্তরে অর্থাৎ বাসুদেব স্বরূপেই বুঝিতে হইবে।

সুতরাং গুণাধিকারিক দেবতাগণের বিচারেও চিত্তের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন হইল।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতম্।" (শ্রীমদ্ভাগবত—৪.৩.২৩)—বিশুদ্ধসত্ত্বের অপর নাম বসুদেব। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্বজীব-চিত্তে বাসুদেবরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যে অংশরূপ অপর স্বরূপে সর্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে বিদ্যমান—তাহা গীতায় শ্রীমুখের উক্তি হইতেই জানা যায়। যথা,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ। (গীতা—১০.২০)

অর্থাৎ,—হে বিপুলকীর্তে ! আমি সর্ব প্রাণী-হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা। প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণও আমি।

কিন্তু চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব হইতেছেন অংশী। সুতরাং পরমাত্মারূপে তদীয় সাধারণ কার্য অপেক্ষা চিত্তের অধিষ্ঠাতার কার্য পৃথক।

বিশুদ্ধসত্ত্ব ত্রিবিধ যথা,—১) সন্ধিনী প্রধান (সৎ) ২) সম্বিৎ প্রধান (চিৎ), ৩) হ্লাদিনী প্রধান (আনন্দ), আর হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বই—'ভক্তি', ইহাই নির্গুণা অর্থাৎ প্রাকৃত গুণত্রয়ের অতীত। ইহা হইতেই ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকল বাসনা বিদূরিত হইয়া কেবল নির্গুণ নির্মল শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা চিত্তে উদয় হয়। এই শুদ্ধসত্ত্বরূপা নির্গুণা ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবদ্বস্তু গ্রাহ্য হয়েন। যথা,—

"ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি—" (মাঠরশ্রুতি)

অর্থ,—শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির পরম উপায়। কিম্বা—

"অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ—" (শ্রীভাগবত—৯.৪.৬৩)

অর্থ,—আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার কোন স্বতন্ত্রতা থাকে না, ইত্যাদি।

একমাত্র ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবৎস্বরূপ অপর কোন সাধনাদি দ্বারা লভ্য কিম্বা গ্রাহ্য হয়েন না, এ'কথাও তদীয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারাও জগতে বিঘোষিত হইয়াছে, যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।। (শ্রীভাগবত—১১.১৪.১৯)

ইহার অর্থ,—হে উদ্ধব ! আসন প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচারাদিরূপ জ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম, বেদাদি পাঠ, কৃচ্ছ্রাদিসাধ্য তপস্যা এবং সন্ন্যাসাদিরূপ ত্যাগ প্রভৃতি এইসকল আমাকে সে'রূপ বশীভূত করিতে পারে না, আমাতে বিবর্দ্ধিতা ভক্তিদ্বারা আমি যে'রূপ বশীভূত হইয়া থাকি।

শাস্ত্রে অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে,—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্।। (শ্রীভাগবত—৭.৭.৫২)

ইহার অর্থ,—দানে নহে, তপস্যায় নহে, যজ্ঞাদিতে নহে, শৌচাদি আচারে নহে, কিম্বা ব্রতাদিতেও নহে, একমাত্র অমলাভক্তিই শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থা ; তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই তদ্বিষয়ে বিড়ম্বনা অর্থাৎ নটের নটন মাত্র (বিড়ম্বনং নটনমাত্রং।'—স্বামিপাদ)।

শ্রীকৃষ্ণই লীলাপুরুষোত্তম। সতত লীলাপরায়ণ তিনিই আদি ব্যূহ বাসুদেব রূপে সর্বকর্তা ও নিয়ন্ত্রাতা। মালিন্য ও বৈপরীত্য দোষ বিদূরিত জীবের নির্মল চিত্তদর্পণে সাধনভক্তির প্রভাবে হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বময়ী সাধ্যভক্তির উদয়ে বাসুদেবের সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির প্রকাশ হইলে শ্রীভগবৎদর্শনই ফল। কারণ চিত্তের শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশেই শ্রীবাসুদেবের অধিষ্ঠান।

ভক্তি দ্বারাই সর্বমূল—সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণের পারম্য উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ংভগবত্তা জ্ঞান সম্বিৎপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই প্রকাশ। তদ্ভিন্ন গুণস্পৃষ্ট ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণে—স্বতন্ত্রবোধে মমতা বুদ্ধি ঘটিয়া অপরাধজনক হইয়া থাকে ও মায়া-বন্ধনের কারণ হয়। তবে সর্বশাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মরুদ্রাদির সমতা-দর্শন-সম্বন্ধে সমাধান এই যে,—কার্যকারণের অভিন্নতা অথবা প্রিয়তা-সম্বন্ধেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মারুদ্রের অভিন্নতা কিন্তু তত্ত্বতঃ ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য যে বিদ্যমান ইহা জানিতে হইবে। নতুবা স্বরূপতঃ অভিন্ন চিন্তনে অনর্থ ও অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়।

এইহেতু নিম্নোক্ত শ্লোকে মায়ামুক্তিকামীদেরও শ্রীকৃষ্ণ ও তদংশ-সকলের উপাসনাদি বিহিত হইয়াছে। যথা,—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ।। (শ্রীভাগবত—১.২.২৬-২৭)

অর্থাৎ,—মুক্তিকামীব্যক্তি অন্য দেবতা বা দেবতান্তরের উপাসকদিগকে নিন্দা অথবা ঘোররূপধারী রুদ্রাদির উপাসনা না করিয়া, বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ভগবানের কলার (অংশরূপে অবতীর্ণ মূর্ত্তির) ভজনা করিয়া থাকেন।

রজঃ ও তমোগুণ বিশিষ্ট লোকে ধনৈশ্বর্য এবং স্ত্রীপুত্রাদির কামনায় নিজসম রজঃ ও তমোগুণ সংস্পৃষ্ট পিতৃগণ, ভূতগণ, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদিগকে ভজনা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণই—স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব এবং সমস্ত বেদের বাসুদেব-পরতা ঘোষণা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পরতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরা ক্রিয়াঃ।।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।। (শ্রীভাগবত—১.২.২৮-২৯)

ইহার অর্থ,—বেদসকল বাসুদেবপর, যজ্ঞসকলও বাসুদেবপর, সমস্ত যোগবিদ্যা বাসুদেবপর ; সমস্ত কর্মকাণ্ড বাসুদেবপর। সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড ও তপস্যাদি বাসুদেবপর ; নিখিল ধর্মই বাসুদেবপর এবং বাসুদেবই পরমাগতি।

এইরূপে সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত কর্তৃক সমস্ত বেদাদির বাসুদেবপরতা ঘোষিত হইলেও কিন্তু স্থূলবাহ্য দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত বেদ এবং অপর সমস্তই যে বাসুদেবপর ইহা বিদিত হওয়া যায় না। অপরের কথা দূরে থাক, এমনকি জ্ঞানিগণের পক্ষেও তাহা অবগত হওয়া সজহসাধ্য নহে,—এ'কথা আমরা গীতায় স্বয়ং সেই বেদময় পুরুষের শ্রীমুখের বাণী হইতেও জানিতে পারি। যথা,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।। (গীতা—৭.১১)

ইহার অর্থ,—বহুজন্মের পর জ্ঞানবান 'চরাচর বিশ্ব সমস্তই বাসুদেবময়' এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত হইয়া (সেই বাসুদেবই যে আমি) আমারই শরণাগত হয়েন, সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

সাধারণতঃ জ্ঞানিগণ যাহাকে “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্মময় বলিয়াই উপলব্ধি করেন—তাহারই সার অর্থ ‘বাসুদেবময়’—ইহাই গীতোক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায়।

অতএব নির্গুণা ভক্তিলাভই জীবের গুণসম্বন্ধ মুক্ত হইবার পরম উপায়। আবার শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তনই মুখ্যফলে সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপা ভক্তিলাভের ও তদানুষঙ্গিক ফলে চিত্তের মালিন্য ও বৈপরীত্যরূপ দোষ নাশ করিয়া চিত্তদর্পণের মার্জনের পরম উপায়স্বরূপ জানিতে হইবে—আর এইহেতু সর্বোপরি উৎকর্ষের সহিত শ্রীনাম নিত্যই জয়যুক্ত হইতেছেন।

নবধাভক্তির মধ্যে নামসঙ্কীর্তনই অঙ্গী এবং নবধাভক্তি নামেরই অঙ্গ বলিয়া অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়,—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপুর্ণ নাম হৈতে হয়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০৮)

শ্রীনামসঙ্কীর্তনের ফলে জীবের মলিন ও বৈপরীত্য দোষযুক্ত চিত্তদর্পণ যথার্থরূপে পরিমার্জিত হইলে জড়সাম্মুখ্যের পরিবর্তন হইয়া চিদোন্মুখতার ফলে নিজের প্রকৃষ্ট স্বরূপভাব—যে ‘নিত্য কৃষ্ণদাস্য ভাব’—তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তদনুষঙ্গে বিষয়-ভোগবাসনামূলক মায়াতাড়িত সংসারেরও প্রকৃষ্টস্বরূপ যে মহাদাবানলের ন্যায় ত্রিতাপজ্বালাময় ভয়াবহ তাহার উপলব্ধির কারণ ঘটে।



বিশ্লিষ্ট শ্লোক ব্যাখ্যা—
"ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং—" —দ্বিতীয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিজয়তে—"শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন। উহা কিরূপ না,—"ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং—" অর্থাৎ ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাপক।

ইতিপূর্বে চিত্তরূপ দর্পণের সর্বোত্তম মার্জনস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনকে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার দ্বারা চিত্তের মালিন্য ও বৈপরীত্য এই উভয় দোষ যুগপৎ বিদূরিত হইয়া সেই শুদ্ধচিত্তে বস্তুর যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি হয় ও কৃষ্ণোন্মুখতার উন্মেষ হয়। তখন সেই শুদ্ধচিত্তে সংসারেরও যথার্থস্বরূপ যে 'মহাদাবানল' তাহার উপলব্ধি ঘটিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—চিত্ত মার্জিত হইলে তৎফলে দুঃখ তাপাদির নাশ হইয়া সুখ বা আনন্দের আবির্ভাব হইবারই কথা, কিন্তু তৎপরিবর্তে সংসারের দাবানলস্বরূপ ভীষণতার আবির্ভাবের হেতু কি ? —তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বে মালিন্য ও বৈপরীত্য-দোষবশতঃ যে সংসাররূপ বিষধরকে সুকোমল ও সুশীতল পুষ্পমাল্য মনে করিয়া অতি আদরে কণ্ঠে ধারণ করা হইত—শ্রীনামসঙ্কীর্তন প্রভাবে চিত্তদর্পণের যুগপৎ এই দোষনাশে ভবের যথার্থস্বরূপ যাহা সেই মহাদাবানলের উপলব্ধি হওয়াতে, উহাতে মাল্যভ্রমে সর্প-গ্রহণের ন্যায় ভীষণতা দর্শনই স্বাভাবিক।

"ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং—" অর্থাৎ ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাপক—এই পদটিতে উপমা অলঙ্কারের বিচারে 'ভব'—উপমেয় ; 'মহাদাবাগ্নি'—উপমা, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন—উপমেয় ; নির্বাপক অর্থাৎ বর্ষণ—উপমা। ভব' অর্থে সংসার। স্বকৃত কর্মফল ভোগার্থে জীবের বারম্বার জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে আসা যাওয়ার নামই—"সংসারদশা"। যেমন গমনকালে উভয় পদক্ষেপে অর্থাৎ পদ দ্বারা ভূমিকে একবার ত্যাগ ও একবার গ্রহণ—ক্রমিক এই প্রণালীতে চলিতে হয়। সেইরূপ অবিদ্যা বা মায়ার প্রতারণায় প্রতারিত জীবাত্মাও দেহাত্মবোধে অবস্থিতিকালে, জন্ম-মৃত্যুরূপ উভয় পদক্ষেপ দ্বারাই সংসারপথে চলিতেছে। তাই বলা হয়—"স্বকর্ম্মোপলব্ধ জনন মরণরূপ সংসারঃ।"—অর্থাৎ স্বীয় কর্মফলজনিত জন্মমৃত্যুরূপ সংসারদশা।

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে সান্ত্বনা দানার্থে দুর্লঙ্ঘ এই সংসার গতির কথাই বলিতেছেন, যথা—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। (গীতা—২.২৭)

অর্থাৎ,—যেহেতু জন্ম হইলে মরণ নিশ্চিত এবং মরণ হইলে পুনরায় (পূর্বজন্মকৃত কর্মফল ভোগার্থ) জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য তুমি শোক করিতে পার না।

মায়াহত অবিবেকী জীবগণ স্বভাবতঃই নশ্বর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থে অনন্তকাল হইতে আত্মবুদ্ধি (আমি বোধ) স্থাপন করিয়া, ধ্রুবসত্য আত্মাকে দেখিতে পায় না, আর তাহারই ফলে অনন্তকাল ধরিয়া জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু এইরূপ সংসার-গতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যতদিন না এই প্রগাঢ় মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া বিবেকসূর্য সমুন্মেষিত হয় এবং সংসারাসক্ত জীবগণের দেহগেহাদি অনাত্মবিষয় হইতে জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত আত্মবুদ্ধির অপনোদনে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রতি উন্মুখতা জাগে—ততদিন সংসার-গতি হইতে মুক্তি নাই। সেইকাল সমুপস্থিত হইবার পূর্বাবস্থা পর্যন্ত জীবের যে অসুখকর গতি তৎসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে,—

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ।। (শ্রীভাগবত—১১.১০.২৯)

অর্থাৎ,—এই দেহ দ্বারা দুঃখ যাহার পরিণাম এতাদৃশ কর্মসকল করিয়া ঐ কৃত কর্মসকল দ্বারা পুনর্বার দেহই প্রাপ্ত হইতে হয়। এইরূপে সংসার-চক্রে বর্তমান ঐ মরণধর্মী মনুষ্যের কি প্রকারে আত্মপ্রীতিকর সুখ হইবে। সুতরাং মুক্তি না হওয়া অবধি ভ্রাম্যমান জীবের সংসারক্ষেত্রে জন্মমৃত্যুরূপ পদক্ষেপের নামই জীবের সংসার-বন্ধন বা দশা।

"ভবমহাদাবাগ্নি" এই পদটিতে "মহাদাবাগ্নি" এই শব্দটির উল্লেখ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বনদহনের যে দাবানল, উহা বনভূমিকে দহন করিবার পর স্বত:ই নির্বাপিত হয়। উহাদের স্থায়িত্বকাল দুইদিন, দুই একমাস কখনও বা বৎসরাধিক কালব্যাপী হইতে দেখা যাইলেও কোন সময়ে না কোন সময়ে ইহা দাহ্যবস্তুর অভাবে বা অন্য কোন কারণে নির্বাপিত হয়। কিন্তু সংসারপথে ভ্রমণশীল জীবের যে ত্রিতাপরূপ দাবদহন বা ভবদাবানল—ইহা অনাদিকাল হইতে চলিতেছে ও সংসারমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত অনন্তকাল অবধি চলিতে থাকিবে। এইহেতু স্থায়িত্বের বিচারে ইহাকে 'মহাদাবাগ্নি' বলা হইয়াছে।

সংসারপথে বিচরণশীল জীবমাত্রকেই "ত্রিতাপ" ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে ত্রিতাপ বলিতে—(১) আধ্যাত্মিক (= শারীরিক ও মানসিক দুঃখ) (২) আধিভৌতিক (= ভূত ও প্রাণীগণ হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদিদংশন, ব্যাঘ্র কর্তৃক হত হইয়া ইত্যাদি প্রকারে উৎপন্ন বিবিধ দুঃখ।) এবং (৩) আধিদৈবিক (দেবতা হইতে অর্থাৎ বন্যা,

অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতাদি প্রভৃতি দুঃখ।)—এই ত্রিবিধ দুঃখকে বুঝায়।

চিদ্‌বস্তু ও জড়বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন। যাহা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, যাহা বিকার বিকৃতি রহিত, যাহা আনন্দস্বরূপ ও নিত্যনবনবায়মান তাহাই চিদ্‌বস্তু। আর যাহা তদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহা বিনাশশীল, যাহা নিয়তই পরিবর্তনশীল, যাহা অসুখকর—তাহাই জড়বস্তু। চিদ্‌বস্তুমাত্রেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সৎ অর্থে নিত্য, চিদ্ অর্থে চেতন ও আনন্দ বা সুখস্বরূপ। আর জড়বস্তু অসৎ (অনিত্য), অচিদ্ (অচেতন) ও নিরানন্দ (অর্থাৎ অসুখকর বা আনন্দেরই আবরক)। সুতরাং যাহা ক্ষয় ও বিনাশশীল সেই বস্তুর লাভেও, পরিণামে তাহার ত্যাগ বা অভাবজনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীভগবান্ গীতায়, এই জগতের পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে,—

'অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (গীতা—৯.৩৩) অর্থাৎ এই সংসারকে অনিত্য ও অসুখকর জানিয়াই, (নিত্য ও সুখস্বরূপ) আমার ভজনা কর। অনিত্যতা ও অসুখকারিতা—জড়ের এই দুইটি ধর্মই সংসারগতিপ্রাপ্ত জীবকে জন্মে জন্মে অনাদিকাল হইতেই অনুভব করিতে হইতেছে।

চিদ্‌বস্তু সুখস্বরূপ, জড় অসুখকর অনিত্য—ইহা পূর্বে বল হইয়াছে। তথাপি সুখের সন্ধানে ও অসুখকর জড়বিষয়স্তূপ হইতে উহার আহরণে আগাগোড়াই ব্যর্থকাম হইতে দেখা যায়। সুখসন্ধান ও তদাস্বাদনই জীবের স্বরূপগত বৃত্তি হইলেও, জড়ের অনুধাবনে জন্মে জন্মে যে দুঃখপ্রাপ্ত হইতে হইতেছে এবং সুখাভাসকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া ধরিলেও উহার অনিত্য স্বভাবে বারম্বার উহা হইতে বিচ্ছেদ ঘটিতেছে—ইহা স্বরূপবিস্মৃত জীবের প্রতি মায়ার দৃঢ় দণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, সেই বিষয়বাসনা ও কর্মের ফলে পুনরায় জড়দেহই ধারণ করিবার কারণও হইতেছে। এই ভ্রম যতদিন না ভাঙ্গিবে, ততদিন জীবের জন্মমৃত্যুরূপ সংসারগতির বিরাম হইবে না। যেমন সূর্যালোকের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের জ্বলন্ত অনলেই পতঙ্গকুল আত্মাহুতি দেয় সেইরূপ চিৎস্বরূপ ও সুখপিয়াসী জীবের পক্ষে অবিদ্যাকৃত, আত্মবিস্মৃতির ফলে চিৎসুখের পরিবর্তে 'সুখাভাস' গ্রহণে জড়তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়া—আত্মহত্যারই নামান্তর।

অনাত্মবিষয় অর্থাৎ জড়বস্তুসমূহ স্বরূপতঃ সুখহীন ও অপ্রিয়। কারণ যাহা জড়বস্তু তাহাই অনিত্য ও অসুখকর। আর যাহা কিছু অনিত্য ও নিরানন্দময় তাহাই জড়বস্তু বা অনাত্মবিষয়। কারণ আত্মবস্তুমাত্রই চিদ্‌বস্তু। আর চিদ্‌বস্তু স্বরূপতঃ নিত্য ও সুখস্বরূপ ইহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। সংসারক্ষেত্রে অনাত্ম জড়বস্তুকেও যে কখনও কখনও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়—তাহা তাহাদের কোনও স্বরূপগত ধর্ম নহে। ঐসকল সুখহীন ও অপ্রিয় বস্তুতে আত্মভাবের অধ্যাস বা আরোপ হেতু—তাহা

আত্মারই স্বরূপগত সুখধর্ম ও প্রিয়তার দ্বারা পরিসিক্ত হইয়া সুখকর বা প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহাই সুখাভাস, যাহা প্রকৃত সুখ হইতে প্রভূত পরিমাণে বিচ্ছিন্ন।

জীব চিৎকণ ; সুতরাং জীব আত্মবস্তু বলিয়া তাহাকে জীবাত্মা কহে। উহা দেহাদির ন্যায় জড়বস্তু নহে। জড়বস্তুতে আত্মবস্তুর ন্যায় সুখধর্ম ও প্রিয়তা না থাকায়, উহার অপর নাম অনাত্মবস্তু। আমরা অবিদ্যাবশতঃ দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মার সন্ধান অবগত নহি বলিয়া, সেই চিদাত্মার পরিবর্তে যেমন নিজ নিজ অনাত্ম-দেহকে 'আমি' বা আত্মস্বরূপ মনে করি, তেমন আবার স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যাদির দেহাতিরিক্ত চিদাত্মার সহিত পরিচয় না থাকায়, তাহাদিগের জড়ীয় দেহকেই 'আমার বা আত্মীয় জ্ঞানে, সেই অনাত্ম জড়পিণ্ড-সকলকে সুখের ও প্রীতির বিষয় মনে করিয়া থাকি,—ইহা স্বরূপভ্রান্ত জীবের প্রতি মায়ার নিষ্ঠুর পরিহাস ! বস্তুতঃ চিন্ময় বা আত্মবস্তু ব্যতীত কোনও অনাত্ম বিষয়ে সুখধর্ম বিদ্যমান থাকিতেই পারে না,—অতএব তাহা প্রিয় বা প্রীতিকরও হইতে পারে না। সুখ বা আনন্দ একমাত্র আত্মবস্তুরই নিজধর্ম ; সুতরাং আত্মবস্তুই একাধারে যেমন সুখ ও সুখকর, তেমনি সুখই প্রিয় বলিয়া সুখময় আত্মবস্তুই আবার যুগপৎ প্রিয় ও প্রীতিকর।

জীবাত্মা আত্মবস্তু, তাই জীবাত্মা সুখময়। জীবাত্মার সুখধর্মের এতই প্রভাব যে, যদি কোন অনাত্ম বা জড়বস্তুতে আত্মসম্বন্ধযুক্ত বা আত্মভাবের আরোপ হয় তথাপি সেই সুখহীন অনাত্মবিষয়ে আত্মার আভাস পতিত হওয়ায়, তাহাকেও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। যে ধর্ম বা যে লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাতে মিথ্যাবশতঃ সেই ধর্মের যোজনা করাকেই 'আরোপ' কহে। যেমন—দোষারোপ অর্থাৎ যে দোষ যাহাতে নাই তাহাতে মিথ্যা করিয়া সেই দোষের অপবাদ করার নাম 'দোষারোপ'। সেইরূপ অনাত্মবিষয়-সকলে অর্থাৎ যাহাতে সুখধর্ম নাই সেই সকল জড়ীয়বিষয়ে অবিদ্যাবশতঃ 'অস্মিতা' বা অহংমমাদি-জ্ঞান অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার আত্মসম্বন্ধ 'আরোপ' করিয়া সুখধর্মে তাহাদিগকে সুখকর ও প্রীতিকর মনে করাকেই অনাত্মবিষয়ে আত্মবুদ্ধি আরোপ কহে। আত্মবস্তুর আনন্দ ও প্রিয়তার এতই প্রভাব যে, আত্মভাব আরোপিত অনাত্মবিষয়েও সুখময় আত্মার সুখসম্বন্ধে সুখকর ও প্রীতিকর হইয়া উঠে।

জলস্থিত সূর্যপ্রতিবিম্ব উচ্ছলিত হইয়া কোনও জ্যোতিহীন পদার্থে নিপতিত হইলে, তাহাও যেমন জ্যোতির্ময়রূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেহে প্রতিবিম্বিত আত্মভাব উচ্ছলিত হইয়া অপর কোনও অনাত্মবিষয়ের উপর পতিত হইলেও, সেই সুখহীন বিষয়কে সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে সুখ ও প্রিয়তাধর্ম জড়বস্তুতে থাকে না ; চিন্ময় মুখ্য আত্মার সম্বন্ধবশতঃ জড়ীয় দেহে আত্মবোধ হইয়া

আবার সেই দেহরূপ গৌণ-আত্মার সম্বন্ধ বা আত্মাভাস অপর অনাত্ম বিষয়ে আরোপ করা হইলে, দেহের ন্যায় তাহাও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। সারমেয় যেমন রসরক্তহীন শুষ্ক অস্থিখণ্ডকে বারম্বার চর্বণপূর্বক উহাকে স্বীয় দশন নিঃসৃত রুধিররাগে রঞ্জিত ও স্বীয় রসনা নিঃসৃত লালাধারা সিক্ত দেখিয়া, স্বীয় রস-রক্তাদিকেই যেমন শুষ্ক অস্থিখণ্ড হইতে প্রাপ্ত বিষয় বলিয়া মনে করে তেমনি অনাত্মবিষয় স্বরূপতঃ সুখহীন ও অপ্রিয় হইয়াও, আত্মভাবের আরোপহেতু—আত্মারই সুখধর্ম ও প্রিয়তার দ্বারা পরিসিক্ত হওয়ায়, উহাকে সুখকর ও প্রীতিকর বোধ করাইয়া থাকে।

মায়িক জড়বস্তুমাত্রেই সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়। আর জীবাত্মা জড়াতীত—চিৎকণ—নির্গুণ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সুখবস্তু। 'ভব' বা সংসারভাবপ্রাপ্ত জীবমাত্রেই ত্রিগুণ বা মায়াপাশে বদ্ধ, সুতরাং ত্রিতাপ ও সংসারদাবাগ্নিসন্তপ্ত। জড়ীয়কর্মফলে যে অদৃষ্ট নির্মিত হয় তদনুরূপ শুভাশুভ জন্মলাভ করিয়া তদনুরূপ বিষয়ভোগের জন্যই জীবের দেহ-সংযোগ ও সংসারগতি প্রাপ্তি হয়। জীবের গুণসম্বন্ধই হইল এই কর্ম প্রবৃত্তির মূল। এ'বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে,—

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ।। (শ্রীমদ্ভাগবত—১১.১০.৩১)

অর্থাৎ,—গুণ অর্থাৎ গুণকার্য যে ইন্দ্রিয়সকল, তাহারাই কর্মসমূহের সৃষ্টি করে। আবার সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণসকল ঐ ইন্দ্রিয়সকলকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত করে। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ঐ জীবই কিন্তু কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে (কারণ অনুভব বা চৈতন্যশক্তি জীবাত্মারই)।

মরীচিকার প্রতি ধাবমান পিপাসাতুর ব্যক্তি যেমন পিপাসা না মিটিলেও জলের আশায় ধাবিত হয়। সেইরূপ সুখহীন সংসারের ত্রিগুণ দ্বারা আবৃত জীব, এই প্রাকৃত দেহ লাভ করিয়া সুখাশায় অসুখকর মায়িক বিষয় তৃষ্ণায় জড়বিষয়-স্তুপের দিকে ধাবিত হইতেছে।

সংসারে স্ত্রী, পুত্র, প্রিয়, পরিজন হইতে বা জড়ীয় বিষয় হইতে আমরা যে সুখ পাইয়া থাকি তাহা প্রকৃতপক্ষে 'সুখ' নহে, সুখের আভাস মাত্র। যেমন আতরের বাক্সে রক্ষিত তুলায়, আতরের সৌগন্ধের লেশ লাগিয়া থাকে তদ্রূপ চিৎজড়াত্মক এই জগতে, বিষয়ে চিদ্‌সুখের আভাসমাত্রের সংযোগে তাহাকে সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ করাইয়া থাকে। উহা অতীব ক্ষণস্থায়ী সৌগন্ধ, আতরের ন্যায় বেনারসী কাপড়ের বিচিত্র তুলার নিজস্ব গুণ নহে। বাক্সের লাল ফিতার প্রতি যেমন অজ্ঞ বালকের আকর্ষণ তেমনি যথার্থ চিৎসুখের পরিচয় না থাকায় বিষয়ীজনের আপাত রমণীয় ক্ষণস্থায়ী বিষয়সুখেই মতি দেখা যায়। সাংসারিক সুখের স্বরূপকে আমরা যদি স্থিরভাবে একটু বিচার করিয়া

দেখি, তাহা হইলেই এই মহাসত্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাংসারিক সুখের বিচার করিলে দেখা যায় উহা প্রধাণতঃ তিন প্রকার—(১) দুঃখের প্রতিকারকেই সাংসারিক লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। (২) অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের সংরক্ষণ বাসনাই সুখ অর্থাৎ আশাই সুখ ; (৩) রজোগুণান্বিত কর্মপর ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যাহা দুঃখ তাহাকেই সুখ বলিয়া মনে করে।

"কুর্ব্বন" দুঃখপ্রতিকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী। (শ্রীমদ্ভাগবত—৩.৩০.৯) অর্থাৎ গৃহীজন দুঃখের প্রতিকারকেই সুখ বলিয়া মনে করে। দুঃখের সাময়িক অভাব বা ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই 'সুখ' বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। একান্ত অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে উপার্জনের সংস্থান যেমন তাহার অভাবজনিত দুঃখের নিরাকরণ করিয়া সুখ প্রদান করেন, কিম্বা একান্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতরজনে খাদ্য ও পানীয় প্রদত্ত হইলে উক্ত শারীরিক দুঃখের অবসানে তাহাকে সুখী করিয়া তোলে—এই অবস্থার পরিবর্তনই সংসারীলোকের সুখাস্বাদন সম্পাদন করে, কিন্তু তাহা প্রকৃতই সুখ নহে। প্রাকৃত বা জড়বিষয় মাত্রেরই ধর্ম—দুঃখ ও সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি। কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময় বিষয়ের ধর্ম হইল প্রকৃষ্ট সুখ।

বিষয়লাভে দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইলেও উহা সুখকর নহে বলিয়া উহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় পুনরায় নূতন বিষয়-প্রাপ্তির আশায় চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। তাই বলা হইয়াছে আশাই সুখ—আশা হি সুখম্। দেহে আত্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞানতা নিবন্ধন প্রকৃষ্ট ভূমাবস্তুর, যাহার সহিত জীবের জন্মগত মিলন সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা ভুল হইয়া, অল্পের ও অসুখকর পথে বড় হইবার ও বেশী পাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

আর তাহার ফলে জীবের এই নিরন্তর প্রাপ্তির আকাঙ্খারূপ বহ্নিশিখা কোনদিনই নির্বাপিত হইতেছে না আর হইবেও না। চিদ্‌বস্তুই 'ভূমা'বস্ত, তাহাই পূর্ণ—ইহারই প্রাপ্তিতে জীবের কামনা বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি—আর আত্মবস্তুই সেই চিদ্‌বস্তু। অপরপক্ষে জড়বস্তুমাত্রেই স্বরূপতঃ অপূর্ণ ও অল্প হওয়ায় উহা প্রাপ্তির অবশেষেও আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি হয় না। বরং পরক্ষণেই কামনার বহ্নি আরও অধিকতররূপে প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে।। (শ্রীমদ্ভাগবত—৯.১৯.১৪)

ইহার অর্থ প্রাঞ্জল—সংসারক্ষেত্রে কোনও সুখকর বস্তু লোভনীয় ও প্রাপ্তির বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও যদি কোন প্রকারে উহা লাভ করা যায়, সেই কামনাপূর্তির ফলে চিত্তের উপরতির পরিবর্তে আবার তদপেক্ষা অধিকতর সুখকর বস্তুর বিদ্যমানতাহেতু তদ্‌প্রাপ্তির লোভ ও কামনা জীবহৃদয়ে অচিরেই উপজাত হয়। এইভাবে

আশা বা ভাবী সুখ সম্ভাবনা লইয়াই সংসারপথে জীব ধাবিত হইতেছে। কিন্তু সুখাশা কোনদিনই পূর্ণ হয় না। অধিকন্তু জড়বিষয় অনিত্য বলিয়া সর্বক্ষণ 'ভয়' বা ভাবী দুঃখ সম্ভাবনার তাপ লইয়াই অবস্থান করে। অপ্রাপ্তবস্তুর কামনা ও প্রাপ্তবস্তুর বিয়োগভয়ে রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ 'যোগক্ষেম' কার্যেই জীব সর্বদা ব্যাপৃত থাকায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিরুদ্বেগ সুখাস্বাদনের সুযোগ সংসার মাঝে একান্তই বিরল।

পূর্বে জীবাত্মার দেহসম্ভবের কারণরূপে ত্রিগুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ও তাহাদের কার্যকারিতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ("চেতোদর্পণ—" শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) বাহুল্যভয়ে বর্তমানে তাহাদের উল্লেখমাত্র করিয়া পরবর্তী বিষয়ালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

(১) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের মধ্যে তমোগুণ অচৈতন্যস্বরূপ। উহা জীবের প্রমাদ মোহ প্রভৃতির উদ্রেক করে। কঠিন রোগগ্রস্থ অচৈতন্য ব্যক্তি যেমন মৃতপ্রায় হইয়া থাকে, কোনরূপ কর্ম-প্রচেষ্টা দেখা যায় না, তমোগুণের জড়ত্বও সেইরূপ। রজোগুণের কর্মপ্রচেষ্টার সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, রোগাক্রান্ত অচৈতন্য ব্যক্তির পক্ষে বিকার ঘোরে নানাপ্রকার ভ্রমময় বাক্যালাপ ও শারীরিক উদ্যম প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ রজঃ ও তমোগুণের অচেতনতার মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। বস্তুতঃ উভয়ই মায়াজনিত ভবব্যাধির লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। —পূর্বোক্ত "তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি—" (গীতা—১৪.৮) ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(২) রজঃগুণ অনুরঞ্জনাত্মক, তাই ইহা হইতেই তৃষ্ণা বা লোভ অর্থাৎ বিষয়ভোগ পিপাসা প্রকাশ পায়। আর তাহারই ফলে জীব কর্মজালে বদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত গীতার "রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি—" (গীতা—১৪.৭) ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। তাপনিরোধক চিমনির ন্যায় রজোগুণে তাপসহনশীলতা ও কর্মপ্রবণতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ'জন্য রজোগুণসম্পন্ন জীব অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ অতীব কর্মপর এবং মূলতঃ যাহা দুঃখেরই নিদান তাহাকেই 'সুখ' বলিয়া মনে করে—"রজোঽধিকা কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ।"

মায়ামুক্তির দ্বারস্বরূপ এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া, উহার জন্য প্রকৃষ্ট সাধনের পরিবর্তে রজোগুণান্বিতা হইয়া মানবসমাজে এই যে অদম্য বিষয়কর্মের প্রবৃত্তি—ইহাই মনুষ্যগণের প্রতি মায়ার শ্রেষ্ঠতম প্রতারণা। বস্তুতঃ রজোগুণ সংবদ্ধ সংসারী জীবের সমস্ত সুখাশাই যে ভবতাপ বা দুঃখের নামান্তর—এ'বিষয়ে স্বয়ং ভগবদোক্তি যথা,—

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।। (গীতা—১৮.৩৮)

অর্থাৎ,—(ইন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত) যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন,

প্রথমে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, তাহাই রাজস সুখ বলিয়া কথিত হয়।

প্রাকৃত জড়বিষয়মাত্রেই ষড়বিকার সম্পন্ন—জন্ম, স্থিতি, জন্মান্তর বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু। সুতরাং বিয়োগজনিত দুঃখ পরিণামে অবশ্যম্ভাবী। তথাপি এই অনিত্য বিষয়ে নিত্যত্ব-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া আমরা বিষয়সুখলাভে প্রমত্ত হই—ইহাই বিড়ম্বনার বিষয়।

বৈরাগ্যশতকে দৃষ্ট হয়—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বংবস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।। (৩২)

অর্থ,—অপরিমিত বিষয়ভোগে রোগ হইতে ভয়। সদ্বংশে বা উচ্চকুলে জন্ম হইলে আচার ভ্রংশ হইতে ভয়। বহু অর্থাদি থাকিলে রাজপুরুষ হইতে ভয়। উচ্চসম্মান থাকিলে দীনতা প্রকাশ পাইবার ভয়। দেহবল ও সৈন্যবল থাকিলে শত্রুর আক্রমণ হইতে ভয়। সুন্দর রূপ থাকিলে বার্ধক্য ভয়। বহুশাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে বাদবিসম্বাদ হইতে ভয়। সদ্গুণ থাকিলে খল ব্যক্তি হইতে ভয়। দেহ থাকিলে মৃত্যু হইতে ভয়। এই জগতের সকল বস্তুই ভয়যুক্ত। সুতরাং মনুষ্যগণের বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগরূপ বৈরাগ্যই অভয়।

(৩) পূর্বোক্ত "সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি......" (গীতা—১৪.৯) ইত্যাদি শ্লোকে সত্ত্বগুণ জীবকে সুখের সন্ধান দেয় বলিয়া যে উল্লিখিত হইতে দেখি, তাহা ঘষাকাঁচের মধ্য দিয়া অপর পারের আলোক যেমন কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়—তদ্রূপ। তমোরজের অন্ধকার হইতে সত্ত্বের ইহাই প্রধান প্রভেদ। সত্ত্বগুণে বস্তুর স্বরূপ কিয়দংশে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রকৃষ্ট সুখের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ মানবাত্মা হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যাহা কোন বৈষয়িক সুখ নহে আত্মারই স্বধর্মজাত।

তখন মায়িক বিষয়মাত্রেই যে সুখের আবরক ও তাপকর ইহা উপলব্ধি হইয়া—বিষয়ভোগে বিরক্তি ও পরমার্থ বিষয়ে আসক্তির উদয় হয়। জড়বিষয় সঙ্গেই তাপ। আর বাসনা ত্যাগেই সুখ। শাস্ত্র হইতেই এই পরমসত্য অবগত হওয়া যায়, যথা—

যচ্চ কাম সুখং লোকে, যচ্চ দিব্য সুখং মহৎ।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতি ষোড়ষী কলাম্।।

তাৎপর্যার্থ,—বিষয়বাসনা ও তৃষ্ণা থাকাই দুঃখজনক। সেই বিষয়বাসনার ক্ষয় হইলেই যে আত্মার স্বাভাবিক আনন্দের প্রকাশ হয়—তাহাই বিমল সুখ। তাহার তুলনায় মনুষ্যলোকের সমস্ত ভোগসুখ ও দিব্যলোকের সমস্ত সুখ একত্র করিলেও, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংসের এক অংশও হয় না।

১। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা—।" (ঈশোপনিষৎ-১)

সেই ত্রিগুণ হইতে মায়িকা বিষয়সুখ স্পৃহতা ক্ষয় হইয়া আধ্যাত্মিক বস্তুতে যে পরিমাণে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই পরিমাণে আত্মবস্তুর স্বরূপানন্দ প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ভোগ বিতৃষ্ণা জন্মিবার কারণ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা ইহাই বুঝিলাম যে,—শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনই মলিন চিত্তদর্পণের সর্বোত্তম মার্জন। এই মার্জিত চিত্তেই সংসারের প্রকৃত স্বরূপটি মহাদাবানলরূপে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টিহীন চক্ষুতে অঞ্জনলেপনদ্বারা ক্রমশঃ যেমন বস্তুর স্বাভাবিক স্বরূপ উপলব্ধি হয়, সেইরূপ হরিনাম-সঙ্কীর্তনরূপ মার্জনদ্বারা চিত্তদর্পণ যে পরিমাণে সুমার্জিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে ভব বা সংসারের বিষময় স্বরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষয়াশক্তির নিবৃত্তি ও পরমার্থে প্রবৃত্তির উদয় হয়। তখন কেবল শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ হরিকথার সুশীতল ভক্তিমন্দাকিনীর ধারায় নিমজ্জিত থাকিয়া সংসারতপ্ত মনপ্রাণকে সুশীতল রাখিবার স্বতঃই সাধ হয়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎ-পুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্।। (শ্রীভাগবত—১১ ১৪.২৫)

অর্থ,—যেমন চক্ষু অঞ্জন-সংযোগে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার পুণ্যকথা শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব (মদীয় স্বরূপ ও মদীয় লীলার যথার্থতা) দর্শন করে।

এতাদৃশ নামসঙ্কীর্তন, জীবের পরম শ্রেয়ঃ নববিধা ভক্তির উদয় করাইয়া সেই সাধনভক্তি হইতে যথাক্রমে চিত্তে ভাব ও প্রেমভক্তির আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকেন। এইহেতু নবধাভক্তিরও জনক বলিয়া শ্রীনাম তার মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ বা অঙ্গী এবং নবধাভক্তি তদঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শ্রীনামের সর্বোপরি বিজয়বার্তা জগতে ঘোষিত হইয়াছে।

এক কৃষ্ণনাম করে, সর্ব্বপাপ নাশ।
নব্বিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।।
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে।।
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০৮-১১০)

তাই শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তনেরই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানের পরমোপযোগিতা থাকায়—

ইহাকেই জীবের 'পরমলাভ' বলিয়াই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ।।

(শ্রীভাগবত—১১.৫.৩৭)

অর্থাৎ,—সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান দেহী বা জীবসকলের পক্ষে ইহা হইতে 'পরমলাভ' আর কিছুই নাই,—যে সঙ্কীর্তন হইতে পরমাশান্তি লাভ ও সংসারগতি রোধ হইয়া থাকে।

"শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণম্—" —তৃতীয়।

অতঃপর বলা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন পরম উৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন,—উহা পুনরায় কিরূপ ?— "শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং—" অর্থাৎ শ্রেয়ঃ (মঙ্গল)রূপ কুমুদিনী বিকাশের পক্ষে চন্দ্রালোক বা জ্যোৎস্নাস্বরূপ। ইহার তাৎপর্যার্থ—সংসার বা ভব জীবের পক্ষে মহাদাবানলস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনের ফলে দাবানল ত্রিতাপাদি দুঃখানল নির্বাপিত হইয়া পরমশ্রেয়স্কর যাহা তাহারই আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ মহাদাবানলের ভয়াবহ অবস্থার বিপরীত—জ্যোৎস্নালোক উদ্ভাসিত স্বচ্ছ-সরসী-বক্ষে শুভ্রকুমুদিনী স্ফুটনোন্মুখ পরম রুচিকর শুচিস্নিগ্ধ শোভার আবির্ভাব হয়। এখানে শ্রেয়ঃ—উপমেয় ; কৈরব—উপমা। সঙ্কীর্তন—উপমেয়, চন্দ্রিকা—উপমা।

এখন প্রশ্ন হইল শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল কাহাকে বলে ?—তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—যাহা মূলতঃ (আত্মার) অধোগতিরোধক এবং যাহার সাধনে (আত্মিক) ক্রমোন্নতি লাভ করা যায়—তাহাই শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ যাহা তাহাই (জাগতিক) দুঃখের নিরাকরণ অর্থাৎ সংসার নাশ করে এবং (পরা) সুখ বা আনন্দ প্রদান করে। ইহাই বিবেকী সাধুদিগের আচরিত ধর্ম, শ্রেয়লাভের পন্থাকে তাই 'সদ্‌ধর্ম' বলা হয়।

অপ্রাকৃত চিন্ময়বস্তু ও প্রাকৃত জড়বস্তু যেমন একে অপর হইতে ভিন্ন তেমনি জীবাত্মা আত্মবস্তু বলিয়া অনাত্ম দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় অপর জড়বস্তু হইতে ভিন্ন এবং দেহ, গৃহ, বিত্ত ও পরিজনাদি নিখিল জড়বস্তুও জীবাত্মা হইতে পৃথক।

'মনুষ্য' বলিতে এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত শরীর আর তাহার অভ্যন্তরস্থ অদৃষ্ট অপ্রাকৃত এক চিন্ময় আত্মার সম্মিলিত অস্তিত্বকেই বুঝায়। এই প্রাকৃতশরীর বা দেহ, আর সেই দেহের সহিত সম্পর্কযুক্ত যাহা কিছু গৃহ-বিত্তাদি বিষয়সকল দেহান্তরস্থ আত্মার সহিত মূলতঃ সম্পর্কশূন্য, তাই অনাত্মা। আর অনাত্ম বলিয়া এবং প্রকৃতিগত ধর্মানুসারে, তাহাদের জড়বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে।

অপরক্ষেত্রে দেহাভ্যন্তরস্থ যে আত্মা, তাহা কিন্তু প্রকৃতির বা মায়াশক্তির অতীত সুতরাং অপ্রাকৃত, অতএব চিন্ময়। সুতরাং দেহাতিরিক্ত জীবাত্মা হইতেছে আত্মবস্তু, আত্মা ব্যতিরিক্ত দেহাদি হইতেছে অনাত্মবস্তু—ইহাই বিচারের দ্বারা নির্ণয় হইয়া থাকে।

অতএব মনুষ্যের পক্ষে জীবাত্মা যখন আত্মবস্তু তখন তাহার মঙ্গলসাধনরূপ যে ধর্ম তাহাকে বলা হয় 'আত্মধর্ম'। অপরপক্ষে দেহ অনাত্ম জড়বস্তু হওয়ায় তাহার মঙ্গলসাধনরূপ যে ধর্ম তাহাকে বলা হয় 'দৈহিকধর্ম'। অতএব আত্মিক মানুষ বা মানবদেহের ও দেহসম্পর্কে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত অপর বস্তুসকলের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে যে ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই হইতেছে 'দেহ-দৈহিক ধর্ম'। ইহাই শ্রুতিতে "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ" নামে যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তে
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।। (কঠোপনিষদ্—১.২.২)

অর্থাৎ—শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বিচার দ্বারা ইহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া অবগত হয়েন। তাই জ্ঞানীগণ প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কেই বরণ করেন, আর মন্দমতিগণ যোগক্ষেম (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বিষয়সুখসম্পদের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়সুখের রক্ষণাবেক্ষণ) কামনায় প্রেয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দৈহিকধর্মমাত্রেই সগুণ অসুখকর ও অনিত্য—

দেহ ও দেহসম্পর্কিত বস্তুমাত্রকেই ত্রিগুণময় বলিয়া জানা আবশ্যক। এই কারণে অর্থাৎ দেহাদি ত্রিগুণময় বলিয়া দেহ-দৈহিকধর্মও ত্রিগুণময়। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের বিকারই প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়। সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই মূলে যে ঐশ্বরিক মায়াশক্তি বা প্রকৃতির অধিষ্ঠান তাহা সত্ত্বরজঃতমোময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণের সমাহার। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিগত এই গুণত্রয়ের সাম্যভাব বিদ্যমান থাকে। সৃষ্টিকালে উহাই সংক্ষোভিত হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টবস্তুর প্রকাশ ঘটায়। মনুষ্যশরীর উপাদানগতভাবে পাঞ্চভৌতিক—যাহা প্রাকৃতবস্তুই, সুতরাং ইহারও মূলে সেই ত্রিগুণেরই অবস্থিতি। এই কারণেই ইহাকে ত্রিগুণময় বলা হইয়াছে।

তাই গুণসম্বন্ধ বলিতেই জড়সম্বন্ধ বুঝায়। জড়বিষয়মাত্রেই বিকারাদি ধর্মযুক্ত হওয়ায় তাহাকে অসুখময় ও অনিত্য হইতেই হইবে। অতএব কারণ অনিত্য বলিয়া উহার বিয়োগজনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

দৈহিকধর্মের ক্রমোৎকর্ষ সীমা—

দেহাত্মবোধ ব্যতীত দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ববোধ বা আত্মবিজ্ঞানের অভাববশতঃ যাহারা তাঁহাদের বর্তমান দেহ-গৃহ-বিত্তাদির মঙ্গলচিন্তায় যে'সকল ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা ও অপর মঙ্গল অনুষ্ঠান করেন—দেহ ও ইহসর্বস্বজনের তাহাই ধর্ম।

দেহ স্থূল ও প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত। অপরপক্ষে আত্মা ঈশ্বরশক্তির অংশবিশেষ হওয়ায় সূক্ষ্ম ও স্থূলদৃষ্টির অগোচর। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,

এষ সর্ব্বেষু ভুতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। (কঠোপনিষদ্—১.৩.১২)

অর্থাৎ,—সর্বভূতে গূঢ় আত্মারূপে যিনি অবস্থিত আছেন, তিনি স্থূলদৃষ্টির অগোচর। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও সূক্ষ্মাগ্র-বুদ্ধিসম্পন্নজনের নিকট তিনি দর্শনীয় হয়েন।

সুতরাং স্থূলবুদ্ধিজনের নিকট সূক্ষ্মতত্ত্ব নিবন্ধন আত্মার স্বাভাবিক অপ্রকাশতাহেতু কেবল—স্থূলদেহই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। এ'জন্য সূক্ষ্ম আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতার দরুণ, সেই সকল লোক প্রত্যক্ষগোচরীভূত স্থূল দেহকেই 'আমি' জ্ঞান করিয়া, সেই দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বিষয়সকলই চরম, এই বুদ্ধিতে উহাদের মঙ্গলকামনায় দিন অতিবাহিত করে। তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ এই কারণেই বাহ্য দেহ ও গৃহাদির উন্নতির প্রচেষ্টাতেই নিযুক্ত হয় ও তদ্বিষয়ক স্বার্থসিদ্ধিতেই তাহারা নিজেদের কৃতস্মন্য ও কৃতবিদ্য জ্ঞান করে। বিষয় ভোগবাসনায় নিরত ইহসর্বস্ব সংসারী জীব নিরন্তর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকর অপরিমিত বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছা ও তৎসংরক্ষণেই আজীবনকাল ব্যস্ত থাকে। বিষয়ের উদ্ভাবন, সম্ভোগ ও সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় তাহাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত কর্মজীবন নিরত, পরিচালিত ও প্রধাবিত হইতেছে। এইসকল বিষয় জড় ও পরিণামে অনিত্য ও অসুখকর হইলেও তাহারা উহাদের উপর নিত্যত্ববুদ্ধি আরোপ করে। দেহে আত্মবোধ ও দেহসম্পর্কিত গৃহবিত্তাদি বিষয়সকলে মমত্বের প্রকাশ আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞজনে যে'রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাদের বিষয় শ্রীশুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনকালে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা,—

অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন ! কুটুম্বভরণেন বা।।
দেহপত্যকলত্রাদিস্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।। (ভাগবত—২.১২.৭)

অর্থাৎ,—আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিহীন গৃহাসক্ত মানবগণের আয়ু রাত্রিতে নিদ্রা অথবা

স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা এবং দিনে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় অথবা পরিবারগণের ভরণপোষণের চেষ্টায় বৃথা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

তাহারা দেহ, পুত্র, ভার্যা প্রভৃতি ভোগায়তন ও ভোগের উপকরণ অনিত্য হইলেও সেই সকল বস্তুতে নিত্যত্ববুদ্ধি রাখিয়া আসক্ত হইয়া থাকে এবং দেহাদি বস্তুসকলের বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না।

জাতবস্তুমাত্রেই বিনাশ বা মরণশীল। লোকসকলের পক্ষেও "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে"—এই সত্যই ধ্রুব, তাই সতত মরণশীল এই লোকের নাম মর্ত্ত্যলোক। এ'সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি হইতেছে—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ—" ইত্যাদি। অর্থাৎ জন্ম হইলে মরণ নিশ্চিত এবং মরণ হইলে পুনরায় (পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃতকর্মের ফল ভোগার্থ) জন্মও অবশ্যম্ভাবী। তথাপি মানুষ যে মৃত্যু বিস্মৃত হয় এবং অনিত্য অসুখকর যে সংসার তৎসম্পর্কে তাহার বিবেক বুদ্ধি জাগরিত হয় না, ইহা দেখিয়াও না দেখারই মত। যেমন জনতার মধ্যবর্তী প্রতিটি ব্যষ্টিজনই নিজে দ্রষ্টার ভূমিকায় থাকিয়া অপর সকলকেই একত্রে ভিড়রূপে দর্শন করে এবং নিজেকে কেহই সেই ভিড়ের মধ্যে গণ্য করে না—সেইরূপ সকলেই মরণশীল হইয়াও কেহই নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে পারে না। মানবের এই প্রবৃত্তি ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ।। (শ্রীভাগবত—১১.১৭.৫৮)

অর্থাৎ এইরূপে গৃহে বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন যাঁহারা তাহারা সর্বদা বিষয়চিন্তা করিয়াও অতৃপ্ত অবস্থায় মৃত্যুর পর অন্ধতম লোক প্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞ ও দেবস্বর্গ—

ইহা হইতে উত্তম দৈহিকধর্ম হইতেছে—যাঁহারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন এবং পরজন্মে উৎকৃষ্টতর দেহসংযোগ ইচ্ছা করেন, যে দেহে উৎকৃষ্টতর বিষয়ভোগ সাধিত হয়।

আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সুতরাং দেহ ও দেহাদি বিষয়সমূহে অহং-মমাদি-পর বিশাল জনসমাজের মধ্যে আবার কতিপয় বিবেকীজন ইহলৌকিক জীবন ও বিষয়সমূহের অনিত্যতা এবং বিকার ও বিয়োগজনিত অসুখকারিতার বিষয়চিন্তা করিয়া তদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্টতর কিছু পাইবার বিষয় চিন্তা করেন। তদনুরূপ চিন্তার ফলে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কথঞ্চিৎ সচেতনতা জাগরিত হয়। অতঃপর ক্ষণভঙ্গুর জীবনের অস্তিত্ববিষয়ে অনাস্থা ও অনীহার দরুণ দীর্ঘস্থায়ী পারলৌকিক অর্থাৎ স্বর্গাদি রাজ্যের

উৎকৃষ্টতর, অনিত্য হইলেও বিকারাদি ধর্মবর্জিত বিষয়ভোগাকাঙ্খায় তদনুরূপ ভোগের উপযুক্ত তদনুরূপ উৎকৃষ্ট, রোগজরাদিবর্জিত সূক্ষ্ম দেবদেহ ধারণের বাসনায় যাহা কিছু ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা পূর্বোক্ত আত্মতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ জনের আচরিত দৈহিকধর্ম অপেক্ষা উন্নত। যেমন ইহলোকে যজ্ঞাদিকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহান্তে পারলৌকিক দেবদেহ ধারণের পর স্বর্গাদি বিষয়ভোগ লাভ। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মাকে জানিয়াও তাহাতে দেহাদিরূপ অনাত্ম বা জড়সম্বন্ধের সংযোগ করা হয় বলিয়া যজ্ঞাদিকেও দৈহিক ধর্মরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফলে পরলোকে যে দেবস্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও অনিত্য। পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। স্বর্গরাজ্যের বিপুল বৈভব, দেবতাদিগের রোগজরাদিবর্জিত রমণীয় সূক্ষ্মদেহসকল তদীয় ভোগের নিমিত্ত বিকারাদি হেয়গুণবর্জিত বিষয়সকল ইহলৌকিক জগতের অনিত্য অসুখকর বিকারাদি গুণসমন্বিত বিষয়সকল হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও তাহাই চরম ও নিত্য নহে। যাবৎকাল পুণ্যফল বিদ্যমান থাকে তদবধিই উহাদের ভোগ সম্ভব হয়। সেই ভোগকাল জাগতিক কালের হিসাবে বহুগুণে অধিক হইলেও একেবারে অনন্ত অসীম নহে—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।

তপঃস্বর্গ—সিদ্ধলোক

তদপেক্ষা উত্তম দৈহিকধর্ম হইতেছে অধিকতর তপশ্চরণ করিয়া অধিকতর ঊর্দ্ধলোকস্থ দেহ ও তজ্জাতীয় অধিক সুখপ্রাপ্তি। তপশ্চর্যার ফলানুসারে প্রাপ্ত এইসকল ভোগরাজ্যের অবস্থিতি স্বর্গেরও উপরে। এইসকল স্থানের ভোগসুখের মাত্রাও স্বর্গাধিক। তপশ্চর্যার গভীরতা অনুসারে ক্রমশঃ প্রাপ্তলোকসকলের নাম—১) মহর্লোক ২) জনলোক ৩) তপঃলোক ও ইহাদের সর্বোর্দ্ধে ৪) সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকের অবস্থিতি। তপস্বী তদীয় তপশ্চর্যার সিদ্ধিতে দেহান্তে উক্ত ক্রমোন্নত লোকসকলের উপযুক্ত দেহধারণ করিয়া তদ্রূপ উচ্চতর প্রাকৃত সুখভোগ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত মায়িক বা অনাত্ম সুতরাং অনিত্য স্মরণ রাখিতে হইবে। এই স্বর্গাদিলোকের সুখনিচয় মনুষ্যলোকের মায়িক সুখের তুলনায় ক্রমশঃ অধিকতর সুখকর হইলেও মায়িক বা অনাত্মবস্তু বলিয়া ইহাও অনিত্য ও অল্প। যে পর্যন্ত যাজকের পুণ্যফল বিধৃত থাকে সেই পর্যন্তই স্বর্গাদিলোকের ভোগসুখ সম্ভব হয়, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় এই কর্মভূমি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। যথা—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।।" (গীতা—৯.২১)। তাই শ্রীভগবান্ অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ।। (শ্রীভাগবত—১১.২৪.১৪)

অর্থাৎ,—যোগ, তপঃ ও ন্যাসহেতু (অর্থাৎ কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি সাধনসকলের ফল তারতম্যহেতু) মহর্লোক, জনলোক, তপঃলোক ও সত্যলোক উত্তমাগতি লাভ হয়। আর ভক্তিযোগের ফলে মদ্‌বিষয়া গতি অর্থাৎ অক্ষয় অচ্যুত পরমধাম লভ্য হইয়া থাকে।

অতএব উপরোক্ত "যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য—" ইত্যাদি শ্লোকে মনুষ্যলোকের তুলনায় উক্ত উন্নততর লোকসকলকে অমলাগতি বলা হইলেও, ইহাও দৈহিকধর্ম বলিয়া অনিত্য ও অল্প। সুতরাং ইহা নিত্য নহে। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।। (গীতা—৮.১৬)

অর্থ,—হে অর্জুন ! প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয়লোক প্রাপ্ত হইয়াও তথা হইতে সংসারে পুনরাবর্তিত হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। স্বয়ং শ্রীমুখেই গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্।। (গীতা—৮.১৬)

অর্থ,—ইন্দ্রাদি দেবপূজক যাঁহারা, সেই দেবব্রতগণ দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন। পিতৃপরায়ণ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ারত যাঁহারা তাঁহারা পিতৃলোকে গমন করেন। বিনায়ক মাতৃগণাদি ভূতসকলের পূজারত যাঁহারা তাঁহারা সেই সেই লোকে গমণ করেন। কিন্তু উক্ত লোকসকলে গমনে করিলেও পুণ্যক্ষয়ে উহা হইতে পুনরাবর্তিত হইতে হয়। আর আমার (শ্রীভগবানের) ভজনশীল অর্থাৎ মৎপরায়ণ বা মদ্ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা অক্ষয় পরমানন্দ-স্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। (শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে।)

তাহা হইলে দৈহিকধর্মের সীমা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত হইলেও, উহার সাধন বা তপস্যাদিধর্মও অনাত্ম বা মায়িক জড়সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উহারও অনিত্যত্বাদি দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

দেহ-সম্বন্ধ ত্যাগ উপদেশ

তাই শ্রীভগবান্ জীবকে সমস্ত জড়সম্বন্ধের মূল দেহসম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া অনিত্য ও অসুখকর বিষয়ভোগ সুখাশা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্বমূল পরমাত্মবস্তু তাঁহাকে ভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন—"অনিত্যং অসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (গীতা—৯.৩৩) অর্থাৎ এই লোককে অনিত্য ও অসুখকর জানিয়াই আমার ভজনা করিবে।

দৈহিকধর্মের এই পর্যন্ত সীমা। অতঃপর আত্মধর্ম বিষয়ে ও যথাক্রমে উহার উৎকর্ষ সীমাও প্রদর্শিত হইতেছে।

জীবাত্মার ত্রিগুণ বা জড়দেহ সংযোগই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারবন্ধনের কারণ। এখন তাহাদের এই দেহ—কর্মভূমির মনুষ্যদেহ বা পুণ্যভূমির দেবদেহ বা পাপের ফলে নারকীদেহ বা ৮৪ লক্ষ প্রাণীদেহ যাহাই হউক না কেন।

গীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উক্তি,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।। (গীতা—১৪.৫)

অর্থ,—হে মহাবাহো অর্জুন ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই তিনটি গুণ নির্বিকার দেহী বা জীবাত্মার দেহসজ্ঘটনপূর্বক তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

জীবের অনাদি কৃষ্ণবিমুখতার ন্যায় বিপরীত কর্মজনিত অশুভ ফলে সংসারপাশরূপ দুর্গতাবস্থায় পতিত হইবার নিমিত্ত প্রকৃতিগত গুণসম্বন্ধে দেহ সম্ভব হয়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্তই ত্রিগুণময়—সুতরাং প্রাকৃতদেহ মাত্রেই ত্রিগুণরচিত। তা সে মনুষ্যদেহ বা দেবদেহ বা নারকীদেহ বা ৮৪ লক্ষ প্রাণীদেহ, যাহাই হউক না কেন। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ।। (গীতা—১৮.৪০)

অর্থ,—পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদিগের মধ্যে এমন দেহধারী কেহই নাই যিনি প্রকৃতিগত এই তিনটি গুণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

প্রতিকারের উপায়—

স্বরূপতঃ নির্বিকার, নিত্য, অমৃত আত্মবস্তু হইয়াও অনাদি কৃষ্ণবিমুখ জীবের বিপরীত কর্মবশতঃ মায়া-কর্তৃক ত্রিগুণরচিত দেহসংযোগ ও তৎফলে জন্মমৃত্যুরূপ উভয় পদক্ষেপে সংসারারণ্যে ভ্রমণ অনাদিকাল হইতেই চলিতেছে। সুতরাং সেই সত্ত্বাদি ত্রিগুণসম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হওয়াই জীবের সকল ভয়, ভাবনা, দুঃখ, শোক, জরাব্যাধি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্বলাভের উপায়রূপে সেই শ্রীগীতাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে,—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।। (গীতা—১৪.২০)

অর্থাৎ,—দেহী (জীবাত্মা) দেহসংঘটক এই গুণত্রয়কে অতিক্রমপূর্বক সংসাররূপ জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দুঃখ ও সংসারপাশ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় দেহসম্বন্ধকারক গুণত্রয়কে অতিক্রম করা।

আত্মধর্ম—

জীবাত্মার পক্ষে অনাত্ম বা জড়দেহ ধারণের ইচ্ছা বর্জনপূর্বক পরমাত্ম বা বিভু আত্মবস্তুলাভ করিবার অভিপ্রায়ে যে সাধন ইহারই নাম 'আত্মধর্ম'।

দেশ, কাল, জাতি প্রকৃতি বা জলবায়ু অনুসারে মানুষে মানুষে দৈহিকভিন্নতা স্বতঃই বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। এইহেতু যাহা দেহসম্বন্ধীয় ধর্ম তাহা ভেদমূলক হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দৈহিকধর্ম সর্বকালে ও সকলের পক্ষে একই প্রকার কখনই হইতে পারে না। কিন্তু দেহী বা জীবাত্মা একই ঈশ্বরশক্তির অংশ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর সে'রূপ কোন ভেদ থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং শুধুমাত্র মনুষ্যের মধ্যেই নহে মনুষ্য মনুষ্যেতর প্রাণীদিগের ক্ষেত্রেও সেই একই চিন্ময় আত্মা বিদ্যমান থাকায়, উহা সর্বকালে সর্বাবস্থায় এবং সর্বক্ষেত্রে একই। উহার পরিচয়ও এক এবং একই অভিপ্রায়ও তাহাতে বিদ্যমান থাকায় ইহা সার্বজনীন।

কিন্তু অনাদিবহির্মুখতার প্রবাহে ভাসমান জীবাত্মার পক্ষে মায়াকৃত অবিদ্যাজনিত অনাত্ম বা জড়ের অনুভূতি ভিন্ন, আত্মার বা চিদ্‌বস্তুর উপলব্ধিই থাকে না। এইহেতু জীব নিজে আত্মবস্তু হইয়াও নিজের সহিত নিজ চির আশ্রয়—চিরপ্রিয় পরমাত্মবস্তুকেও চিরবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহার ফলে মায়াকবলিত হইয়া জীবের পক্ষে জড়দেহকেই আমি ও দেহসম্বন্ধীয় পুত্র, বিত্ত, কলত্র, গৃহাদি মায়িক বা জড়বিষয়সকলে "আমার" বলিয়া বোধ করিবার কারণ ঘটিতেছে অনাদিকাল হইতেই। ঈশ-বৈমুখ্যের অনিবার্য পরিণতি হইতেছে জড়সাম্মুখ্য, যাহার পরিণাম—দেহে আত্মবোধ ও গেহাদি জড়বিষয়ে মমতা বা আমার বোধ এবং সর্বতোভাবে সেই অনাত্মবিষয়সকলেরই প্রাপ্তি, সংরক্ষণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা—যাহা পূর্বোক্ত দেহ-দৈহিক-ধর্মমাত্র।

সেই ভেদমূলক দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধীয় ধর্মের বিপরীত যাহা, তাহাই আত্মধর্ম। সেই এক সর্বকারণ, সর্বাশ্রয় পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের আশ্রিত থাকিয়া আশ্রয়ের পক্ষেও আশ্রিতকে সর্বভাবে পালন এবং সংরক্ষণ, ইহাই সার্বজনীন আত্মধর্ম। ইহাতে কোনপ্রকার ভেদই বিদ্যমান থাকিতে পারে না।[১] আর এই আত্মধর্মই 'শ্রুতি'তে শ্রেয়ঃ-রূপে উক্ত হইয়াছে এবং ইহাকে মূলতঃ ত্রিবিধ বলিয়াই স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইতে দেখা যায়। যথাঃ—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।।
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্।।

১। উদ্ধৃতাংশ— "মহৎসঙ্গ প্রসঙ্গ" গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগ দ্রষ্টব্য।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।

(শ্রীভাগবত—১১.২০.৬-৮)

অর্থ,—শ্রীভগবান্ কহিলেন, মনুষ্যগণের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত মৎকর্তৃক কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগরূপ তিনটি যোগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় কোন স্থলে উক্ত হয় নাই। এই যোগত্রয়ের মধ্যে দুঃখবুদ্ধি প্রযুক্ত কর্মে ও কর্মফলে বিরক্ত, অতএব ফলপ্রদ লৌকিক ও বৈদিক কর্মত্যাগকারী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগই অভীষ্টফল প্রদান করে এবং কর্ম ও কর্মফলে দুঃখবুদ্ধিশূন্য, অতএব আসক্তব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগই অভিলষিতফল প্রদান করে।

আর কোন ভগবদ্ভক্তের কৃপাজাত সৌভাগ্যের উদয়ে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্টব্যক্তি যদি সাংসারিক সুখ-দুঃখপ্রদ কর্মে অতি বিরক্ত নহেন, অথচ অত্যাসক্তি শূন্য হয়েন, তবে তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং এই আত্মধর্মও পুনরায় নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

১) জ্ঞানসাধন—জ্ঞানের সাধন দ্বারা জীবের পক্ষে অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তি বা সদ্যমুক্তি লাভ হয়। ইহাতে জীবাত্মার জন্মমৃত্যুরূপ সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া মায়িক সুখ-দুঃখ নাশ হয়। সেই সঙ্গে অখণ্ডচৈতন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হওয়ায় আত্মনাশের তুল্য হইয়া থাকে। এক নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। নিজ সত্তারও অনুভূতি থাকে না। বরং সাধন অবস্থায় নিজের পৃথক সত্তা থাকায় যে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইত, সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মমগ্ন হইয়া গেলে তাহারও অনুভব থাকে না। সুতরাং যে সুখ বা আনন্দপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের সমূহ কর্মপ্রচেষ্টা ও সাধনাদি বিবৃত আছে, পরিণামে তাহারই অননুভূতিতে এমন কি স্বীয় সত্তামাত্রেরও অবলুপ্তিতে সাধকের আত্যন্তিক দুঃখ নাশ ও সংসারক্ষয় হইলেও জ্ঞান-সাধনের এই ফলকে পরমপ্রাপ্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই কারণে ইহা আত্মধর্ম হইলেও সর্বার্থপ্রদ নহে।

তদুপরি জ্ঞানযোগের সাধনও সহজসাধ্য নহে। একমাত্র আত্মাই সত্য, তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই মিথ্যা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই তত্ত্ববিবেক জাগরিত না হইলে জ্ঞান-সাধনের অধিকারী হওয়া যায় না। আবার একমাত্র সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তিই এই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েন। জ্ঞানসাধনের সর্বপ্রথম সোপান—ব্রহ্ম কি ? এই প্রশ্নটিমাত্র গুরুসমীপে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত সাধকের সাধনচতুষ্টয়ে সিদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ'স্থলে সাধনচতুষ্টয় সম্পর্কে কেবল আভাসমাত্রই প্রদত্ত হইতেছে। সাধনচতুষ্টয় অর্থাৎ (১) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক (অর্থ—একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, তদ্ব্যতিত সমস্তই অনিত্যবস্তু) ; (২) ইহামুত্রার্থ ফলভোগবিরাগ (অর্থ—ইহলোকে

মাল্যচন্দন, বনিতাদি বিষয়ে ও পরকালে স্বর্গাদি বিষয়ে নিস্পৃহতা) ; (৩) শমাদি সাধন সম্পত্তি (অর্থ—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি গুণাবলী। শম—মনোনিগ্রহ ; দম—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ ; উপরতি—স্বধর্মানুষ্ঠান ; তিতিক্ষা—শীতাতপ সুখ-দুঃখ সহিষ্ণুতা ; সমাধান—চিত্তের একাগ্রতা ; শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস ; এবং (৪) মুমুক্ষুত্ব (অর্থাৎ মুক্তিলাভের ইচ্ছা)।

অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত মায়াহত জীবে উক্ত সাধনচতুষ্টয়ের সমাধান একান্তই কষ্টসাধ্য। সাধনক্ষেত্রে এই অধিকারীভেদের ও গুরূপসত্তির বিষয় শ্রুতি বলিতেছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" (মুণ্ডকোপনিষদ্—১.২.১২)

অকৃত অর্থাৎ যাহা কর্মের দ্বারা কৃত নহে, সেই স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যপরতত্ত্ববস্তুকে কৃত অর্থাৎ কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। কর্মের দ্বারা নিষ্পাদিত লোকসমূহকে অনিত্যরূপে নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণ নির্বেদ লাভ করিবেন। সেই পরতত্ত্ববস্তুকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য (অনুভব করিবার জন্য) সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ হস্তে যজ্ঞকাষ্ঠ (ভগবৎসেবার উপায়ন) লইয়া শ্রুতিশাস্ত্রে পারঙ্গত পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। যথাশাস্ত্র সমুপাগত প্রশান্তচিত্ত সংযতেন্দ্রিয় সেই শিষ্যকে গুরুদেব সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বতঃ বলিবেন, যে বিদ্যার দ্বারা সত্য ও অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। অতএব যখন নির্বেদপ্রাপ্ত- ব্রাহ্মণ ব্যতীত জ্ঞানসাধনের ক্ষেত্রে অপর কাহারো পক্ষে অনুপ্রবেশ করা সম্ভব হয় না, তখন আপামর জনসাধারণের মধ্যে ঈদৃশ অধিকারী হওয়া একান্তই সুদূরপরাহত। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।। (গীতা—১২.৫)

অর্থ,—যাঁহারা নির্গুণব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহাদের অধিকতর ক্লেশ ভোগ হয়, কেন না নির্গুণব্রহ্মলাভ দেহীর পক্ষে নিতান্তই ক্লেশকর।

(২) অষ্টাঙ্গযোগ—এখন ইহা হইতেও উন্নততর আত্মধর্ম "ক্রমমুক্তি" যাহা অষ্টাঙ্গযোগের সাধন দ্বারা লভ্য হয়। ইহার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মবস্তুরও সাক্ষাৎকার হয় এবং জীবাত্মার নিজের পৃথক সত্তা বিদ্যমান থাকায় পরমাত্মার আশ্রয়ে তদীয় আনন্দ উৎসারিত হইয়া যোগীর আত্মাকে অভিষিক্ত করায় যোগী তখন "আত্মারাম" হয়েন। এ'বিষয়ে গীতোক্ত (১৮.৬২) যথা,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।

অর্থ,—হে ভারত ! তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণ লও। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তুমি পরমশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

এই নিত্যধামের পরম শান্তি লাভ করিতে পারিলে প্রাকৃত কোন সুখের আর আবশ্যক হয় না, সেই সুতৃপ্ত জীবাত্মার। এই সংসারমুক্তি, জ্ঞানীর সাযুজ্যমুক্তিরূপ আত্মধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট। এইজন্য জ্ঞানী হইতে যোগীর শ্রেষ্ঠত্বই উক্ত হইয়াছে শ্রীমদভগবদ্গীতায়। যথা,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।। (গীতা—৬.৪৬)

অর্থ,—কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্বিগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, ইষ্টপূর্ত্তাদি ও যজ্ঞাদি কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও।

মুক্তিও স্বপ্রয়োজনপর আত্মধর্ম—এই হেতু সকৈতব। এখন 'মুক্তি' আত্মধর্ম হইলেও ইহা স্বপ্রয়োজনপর বলিয়া ইহাও অকৈতব (অর্থাৎ অজ্ঞানতাশূন্য) নহে। ইহাতে নিজ আত্মার কল্যাণই চিন্তিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের বা পরমাত্মার কোন প্রয়োজনের কথা চিন্তিত হয় নাই। তাই "কারণের সুখেই যে কার্যের সুখ সৃষ্ট হয়" যথার্থরূপে এই তত্ত্বটি কৈতব বা অজ্ঞানতা থাকায় বুঝা যায় না।

তদুপরি জ্ঞানের ন্যায় যোগের সাধনও একান্ত কৃচ্ছ্রতামূলক ও দুষ্পূরণীয়। কারণ যোগসাধনায়ও—আসন, প্রাণায়াম—পূরক, রেচক ও কুম্ভক প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করা একান্তই দুঃসাধ্য। জ্ঞানের ন্যায় যোগের ক্ষেত্রেও অধিকারী ভেদ স্বীকৃত হয়। সুতরাং ইহাও সার্বজনীন 'আত্মধর্ম' নহে।

ব্রহ্ম ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও তৎসাধন—জ্ঞান ও যোগ ইহা সাত্ত্বিক। আরও বিশেষ এই যে, জ্ঞান ও যোগের সাধনায় তদঙ্গরূপে যে সগুণাভক্তির সংযোগ থাকে, জ্ঞানসন্ন্যাসে অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার প্রাক্‌কালে জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে তখন সেই ভক্তিমাত্র অবশেষ থাকায় এবং জ্ঞান-সাহচর্য-রহিত হওয়ায় উহা শুদ্ধা বা নির্গুণা হইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সংযোগদানে তৎপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। এ'স্থলে ভক্তির গৌণ অবস্থিতির নিমিত্ত তদীয় গৌণফলমাত্রই চতুর্বর্গ প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে যে, জ্ঞানী বা যোগীর নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় প্রবৃত্তি নহে, স্ব-প্রয়োজন মুক্তিতেই প্রবৃত্তি। জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা ব্রহ্মের সেবানুরোধে নহে—নিজ মুক্তি কামনায়। যোগীর পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছাও তদ্রূপ পরমাত্মার সেবার নিমিত্ত নহে, নিজ অষ্টসিদ্ধির সহিত মুক্তিকামনায়। কিন্তু ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা কেবল ভগবৎসেবা ও তৎপরিতোষের কামনায়, নিজ ভুক্তি বা মুক্তির নিমিত্ত নহে।

ভক্তিপরায়ণ ভক্তজনের পক্ষেই স্বসুখতাৎপর্যশূন্যা কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়ী ভাগবতীবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। অপর সকলক্ষেত্রেই ভুক্তি ও মুক্তিবাসনায় স্বসুখতাৎপর্যময় 'কৈতব বা অজ্ঞানতা' বিদ্যমান থাকে। ভক্তিই কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছারূপ 'কৈতব' দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে।

(৩) ভক্তিধর্ম—সুতরাং একমাত্র ভাগবতধর্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আত্মসুখসন্ধানরূপ কৈতবশূন্যতা অপর কোন ধর্মে দৃষ্ট হয় না ; তাই ভক্তি বা ভাগবতধর্মের লক্ষণ নিরূপণের প্রারম্ভেই ভক্তির উক্ত বৈশিষ্ট্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১.১.২) অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে কীর্তিত হইয়াছে—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্।"—অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর (অসূয়াশূন্য) সাধুদিগের পরম ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। উহা কিরূপ ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে 'কৈতব' অর্থাৎ স্বার্থরূপ কপটতা যাহাতে। প্রোজ্ঝিত 'শব্দোক্ত' 'প্র' শব্দের ব্যখ্যার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছে—'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, অর্থাৎ 'প্র' শব্দের দ্বারা কেবল ভুক্তি কামনাই নহে, মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কৈতব পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাতে সেই পরমধর্মের নিরূপণ এই শ্রীমদ্ভাগবতে। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তিই গরীয়সী হইতেছেন। যথা—'সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্য-ধিকতরা'—নারদ ভক্তিসূত্র/২৫) অর্থাৎ সেই ভক্তি—কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠা।"

ভক্তি-ভগবৎসুখসাধনপর—

যে আত্মধর্মে নিজ প্রয়োজনের কথা ত্যক্ত হইয়া পরমাত্মবস্তুর পরমস্বরূপ শ্রীভগবানের সুখসাধনরূপ প্রয়োজনের কথা চিন্তিত হইয়াছে তাহাই 'অকৈতব আত্মধর্ম'।

—কারণের সুখপোষণে কার্যের সুখ সাধিত হয়—

বিষয়বাসনাহীন নিষ্কাম শুদ্ধভক্তের অনাবিল দৃষ্টির সমক্ষে সকল বিষয়েরই পূর্ণস্বরূপ জাগরিত হইয়া উঠে। তাঁহাদেরই শুদ্ধচিত্তে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, কার্যের স্বতন্ত্র প্রীতিসাধন প্রয়াস অপেক্ষা, তৎকারণের প্রীতিসাধন দ্বারা কার্য ও কারণ উভয়েরই সম্যক্ প্রীতি সাধিত হইতে পারে। এইকারণে একমাত্র ভক্তি বিভাবিত শুদ্ধজনের নিকট ইহাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকৃত সত্য যে, কার্যস্থানীয় জীবাত্মার স্বতন্ত্র সুখসাধন অপেক্ষা অর্থাৎ আত্মসুখতাৎপর্যশূন্য হইয়াও কেবলমাত্র সর্বকারণের কারণ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিতাৎপর্য অঙ্গীকার করিয়া অনুকূলভাবে একমাত্র তদীয় সেবা দ্বারা সাধিত ভগবৎপ্রীতির আনুষঙ্গিক গৌণ ফলেই নিখিল ভুবনের সহিত নিজ আত্মার

পরিপূর্ণ সুখময়তা অনায়াসেই সাধিত হইয়া থাকে। তাই সুখসন্ধানের পরিবর্তে সুখবিস্মরণ এবং আত্মসুখ তাৎপর্যের পরিবর্তে কৃষ্ণসুখতাৎপর্যই পূর্ণানন্দপ্রাপ্তির প্রকৃষ্টপন্থা; তাই শ্রীভাগবতকার বলিলেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।

(শ্রীভাগবত—৪.৩১.১৪)

অর্থাৎ,—যেমন বৃক্ষমূলে জলসেচন দ্বারাই বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা ও উপশাখার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। যেমন একমাত্র প্রাণের তর্পণেই ইন্দ্রিয়বর্গের তর্পণ সিদ্ধ হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইলেই সকল আত্মা ও সকল প্রাণীর পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভগবৎ-বিমুখ অর্থাৎ জড়ত্বপ্রাপ্ত জীবের জড়ীয় বুদ্ধিতে আত্মসুখতাৎপর্য ও সেই সুখসম্বন্ধীয় বিষয়সকলের লাভই সুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত ও আচরিত হইলেও সুখলাভের এই পন্থা যে একান্তই অলীক, অবান্তর দোষদুষ্ট ও মায়াবিজৃম্ভিত—এই উপলব্ধি কেবলমাত্র ভক্তের শুদ্ধদৃষ্টিতেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম এই পুরুষার্থত্রয় বা ভুক্তীচ্ছার মধ্যে আত্মসুখতাৎপর্য অর্থাৎ স্বকীয় দুঃখ পরিহার ও সুখপ্রাপ্তির বাসনা স্পষ্টরূপেই প্রকাশ রহিয়াছে, আর মোক্ষ নামক চতুর্থ পুরুষার্থ বা মুক্তিচ্ছা যাহা—তাহার সিদ্ধাবস্থায় জীব-ব্রহ্মৈক্যভাব উদিত হওয়ায় তৎকালে আত্মার বাঞ্ছাদিধর্মের বিলীনতা নিবন্ধন, আত্মসুখেচ্ছা প্রকাশের অসম্ভাবনাবশতঃ উহা অলক্ষিত থাকিলেও যখন তৎসাধনকালে স্বীয় দুঃখনিবৃত্তির অভিপ্রায় মুখ্যভাবে ও স্পষ্টাকারে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন মোক্ষাভিসন্ধির অন্তরালেও যে, স্বসুখতাৎপর্য সূক্ষ্মরূপেই নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। অতএব জীবের ভুক্তি বা ভোগবাঞ্ছা ও মুক্তি বা মোক্ষবাঞ্ছা—স্পষ্টাস্পষ্ট যে'ভাবেই হউক উক্ত উভয়বিধ অভিপ্রায়ই যে, আত্মপ্রীতিবাঞ্ছাসঞ্জাত ও স্বসুখতাৎপর্যেই পর্যবসিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থই যে অল্পাধিক অজ্ঞানতা বা কৈতব দ্বারা সংস্পৃষ্ট সুতরাং অকৈতব কৃষ্ণভক্তিপথের বাধক-স্বরূপ, পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাকার শ্রীমদ্‌ভাগবতের নির্দেশ অনুসারেই তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন—

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব।।
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১.৫০)

এ'স্থলে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল এই যে, চতুর্বিধ পুরুষার্থ মধ্যে

মোক্ষবাঞ্ছাকে কৈতব প্রধান বলা হইয়াছে। ইহার কারণ ভুক্তীচ্ছা প্রমত্ত জীবাত্মার পৃথকসত্তা বিদ্যমান থাকায় সংসারচক্রে ভ্রমণকালে কোনদিন কোন মহৎ-সঙ্গাদিজনিত কৃপাবারি সিঞ্চিত হইয়া, জীবের প্রকৃষ্ট প্রয়োজন যাহা, সেই কৃষ্ণভক্তিলাভের আশা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সংসার গতাগতি হইতে মুক্তিকামী জীব সাধনার সিদ্ধিতে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য অর্থাৎ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই নির্বিশেষস্বরূপে স্বকীয় স্বতন্ত্র সত্তার অপ্রকাশতা হেতু কৃষ্ণভক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

এখন ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির অতিরিক্ত সালোক্যাদি অপর পঞ্চপ্রকার মুক্তির বিষয়ও শাস্ত্র হইতে জানা যায়। উহার যথাক্রমে (১) সালোক্য (উপাস্য শ্রীভগবানের সহিত একলোকে বাস) (২) সামীপ্য (উপাস্যের সন্নিকটে অবস্থিতি) (৩) সারূপ্য (উপাস্যের সমান রূপপ্রাপ্তি) (৪) সার্ষ্টি (উপাস্যের সমান ঐশ্বর্যলাভ) ও (৫) সাযুজ্য (উপাস্যের সহিত একতা প্রাপ্তি)।

সাযুজ্য আবার 'ব্রহ্মসাযুজ্য' ও 'ঈশ্বরসাযুজ্য' ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মসাযুজ্য জ্ঞান সাধারণের ফল। তন্মধ্যে আবার প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি অধিকতর আত্মবঞ্চনা বা সকৈতব।

একমাত্র রাগভক্তির অধিকারিকগণই প্রকৃষ্ট নিষ্কাম, নিষ্কপট ও অজ্ঞানতাশূন্য। তাঁহাদের বিষয়েই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন, যথা,—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।।
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৬.২৩৬-২৪২)

তাহা হইলে বুঝিলাম একমাত্র শ্রীকৃষ্ণৈকসেবাতাৎপর্যময়ী শুদ্ধা রাগভক্তি ব্যতিরেকে ভুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি পর্যন্ত সকল কিছুই অল্পাধিক কৈতব বা অজ্ঞানতা সংস্পৃষ্ট। তাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং দিতে চাইলেও, রাগভক্তির অধিকারীগণ একমাত্র তদীয় সেবাভিন্ন, ভুক্তি, মুক্তি কিছুই গ্রহণ করেন না। এ'সম্বন্ধে শ্রীভগবানের নিজোক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে বিধৃত দেখিতে পাই,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।। (শ্রীভাগবত—৩.২৯.৩১)

অর্থাৎ,—শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি প্রদান করিতে চাহিলেও উহা গ্রহণ করেন না।

সুতরাং এ'রূপ ভক্তই প্রকৃষ্ট নিষ্কাম, অবিদ্যারহিত, পরম শান্ত। এতদ্ব্যতীত ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি সকলেই সকাম, সকৈতব ও অশান্ত। যথা,—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৯.১৩২)

ভক্ত বা ভাগবতগণের যাহা স্বভাব তাহারই নাম ভক্তি বা ভাগবতধর্ম। ভক্তের সেবালালসাময় আত্মধর্ম বা ভক্তিই যথার্থ অকৈতব ও শুদ্ধ আত্মধর্ম। ভক্তের পুরুষার্থ' 'ধর্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা' হইতে অতিরিক্ত বা 'পঞ্চম' যে ভগবৎ প্রীতি, সেই ভগবৎ সেবাতেই পর্যবসিত হওয়ায় উহাকে 'প্রেম' বা 'পঞ্চম পুরুষার্থ' বলা হইয়া থাকে। যথা,—

কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ।।
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৭.৮১-৮২)

সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার সেবা উদ্দেশ্যে অন্তরে ভক্তিমকরন্দের সঞ্চার ইহাই ভক্তের ভক্তি। পদ্মে মধু সঞ্চার, যেমন পদ্মের কোন নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত নহে, ভক্ত হৃদয়ে ভক্তিসঞ্চারও সেইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ সেবার নিমিত্তই জানিতে হইবে। আবার পদ্মবক্ষে মধুর সঞ্চার হইলে মধুব্রত যেমন স্বয়ংই সাধ করিয়াই উড়িয়া আসিয়া সংবদ্ধ হয় তামরসকোষে, তদ্রূপ রাগভক্তের হৃদয় সঞ্জাত প্রেম পরিমলে আকৃষ্ট হইয়া সুরমুনীন্দ্র দুর্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অলির ন্যায়ই ভক্তের হৃদয়দুয়ারে আবির্ভুত হইয়া ধরা দিয়া আবদ্ধ হইতে চান ভক্তের (মন্দিরে) প্রেমপাশে।

শুদ্ধাভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা—বিধিভক্তি ও রাগভক্তি। যথা, 'বৈধীরাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১.২.৫)। আর সাধনরূপা ভক্তি দ্বিবিধা হওয়ায় তদাশ্রয়ী ভক্তগণেরও দ্বিবিধ ভেদ পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রবিধিনিষেধাদির অনুবর্তনে কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে শ্রবণ কীর্তনাদি সমন্বিত যে ভগবদনুশীলন তাহা 'বৈধীভক্তি'। আর ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণানুরাগের কথা শ্রবণ করিয়া সেই সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়ে একান্ত লোভের বশবর্তী হইয়া শ্রবণ কীর্তনাদিরূপ যে সানুরাগ কৃষ্ণানুশীলন, তাহারই নাম রাগানুগা বা রাগভক্তি। এ'বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

এই তো সাধন ভক্তি দুই তো প্রকার।
এক বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর।।
রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়।। (২.২২.৫৮-৫৯)

রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসি জনে।
তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে।। (২.২২.৮৫)
রাগময়ী ভক্তি হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান।।
লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।। (২.২২.৮৭-৮৮)
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং-ভগবত্ত্বে ভগবত্ত্বে প্রকাশ দ্বিরূপ।।
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়।। (২.২৪.৬১-৬২)

—বৈধীভক্তি—

ইহার দ্বারা ঐশ্বর্যপ্রধান বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিধিভক্তিরূপ আত্মধর্মে জীবাত্মার নির্গুণ বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎ সেবোপযোগী চিন্ময় নির্গুণ ভগবৎপার্ষদ দেহ লাভ হয়। যাহা মায়িক দেহের ন্যায় অনিত্য নহে এবং সেখানে যে অপর সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তি লাভ হয়, উহাও সগুণ ভুক্তির ন্যায় অনিত্যাদি দোষদুষ্ট নহে। উঁহা স্বরূপতঃ চিন্ময়, নিত্য ও সুখস্বরূপ।

বৈকুণ্ঠলোকে ভক্তের ভগবৎসেবামাত্রই কামনা থাকে, নিজ সালোক্যাদি সুখভোগ নহে। তথাপি ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রেমসেবায় বশীভূত হইয়া সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিসুখ ভক্তকে দান করেন। আর প্রভুর দান বলিয়া ভক্তও উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

—রাগভক্তি—

কিন্তু সালোক্যাদি দান করিলেও তাহা গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা একমাত্র তদীয় সেবা ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না, সেই একান্তী ভক্তের আচরণীয়—ব্রজের রাগভক্তিরূপ যে আত্মধর্ম, ইহাই সম্পূর্ণ উৎকর্ষপ্রাপ্ত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখেই যাহা পর্যবসিত। নিষ্কিঞ্চনতা এই কথার অর্থ, আত্মসুখস্পৃহালেশ-শূন্যতা। এই বিষয়ে শ্রীভগবানের উক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
মর্য্যার্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।। (শ্রীভাগবত—১১.১৪.১৪)

অর্থ,—আমাতে একান্ত সমর্পিতচিত্ত ভক্তগণ মদ্ভিন্ন ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রত্ব, সার্বভৌমত্ব কিংবা পাতালের আধিপত্য অথবা যোগসিদ্ধি বা নির্বাণমুক্তি প্রভৃতি কিছুই কামনা করেন না।

পূর্বোক্ত 'সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত' ইত্যাদি শ্লোকেও এই অভিপ্রায়ের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এ'স্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ হইতে বিরত রহিলাম।

রাগভক্তির বিকাশে অর্থাৎ জীবের এই পূর্ণতম স্বরূপভাবের উদ্ভব হইলে আত্মসুখের সকল প্রসঙ্গই অবসান প্রাপ্ত হয়। আত্মসুখাভিপ্রায় তো দূরের কথা, যে জন্ম-মরণরূপ ভববন্ধন ছিন্ন করাই যেখানে মুক্তিকামীগণের মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া বিবেচিত এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদের যাবতীয় সাধনক্রিয়া, সেই ভয়াবহ সহস্র সংসারজন্ম গ্রহণ করিলেও যাহাতে ভগবৎসেবা ভগবৎস্মৃতি হইতে ক্ষণকালও বিচ্যুত হইতে না হয় আত্মসুখানুসন্ধানরহিত পরম ভাগবতগণ সে দুঃখকেও বরণ করিতে পরাঙ্‌মুখ না হইয়া বরং তদবস্থায় সে ভগবৎ-অনুধ্যান সামর্থ্যমাত্রই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাই ভক্ত প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছেন,—

নাথ ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।।
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বমানুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু।। (বিষ্ণুপুরাণ—১.২০.১৮-১৯)

অর্থ,—হে নাথ ! আমি যে কোন জন্মই পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার ভক্তি অবিচলিত থাকে। অবিবেকীদিগের, বিষয়ে যেমন প্রীতি তোমাতে যেন আমার সেইরূপ প্রীতিই অক্ষুন্ন থাকে। ইহারই প্রতিধ্বনি যে ভক্তকবি বিদ্যাপতির গানে শুনিতে পাই—

কি এ মানুষ পশু পাখী কি এ জনমিয়
অথবা কীট-পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।।

সম্পূর্ণ আত্মসুখানুসন্ধানশূন্যা ও ভগবৎসুখতাৎপর্যময়ী রাগভক্তির অভিব্যক্তির চরমাবস্থা নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমেই পরিস্ফুট হইবে। যথা,—"দেহত্যাগ করিয়াও স্বদেহস্থিত পঞ্চভূত দ্বারা (অপ্রাকৃত বা চিন্ময় ক্ষিত্যাদি দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণসেবালালসায় সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি,—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহা স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।

তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়-মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ।।

(উজ্জ্বলনীলমণিধৃত পদ্যাবলী, স্থায়ীভাব—১৮৯)

অর্থ,—(শ্রীরাধিকা ললিতাকে বলিলেন—সখি হে ! কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে আর আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে পাইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না, সুতরাং এই সেবাহীন দেহ অতিকষ্টে আর রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমিও আর যত্ন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিও না।) —আমার এই দেহ পঞ্চত্বলাভ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে আকাশাদি পঞ্চভূতের সহিত সংমিশ্রিত হউক। আমি মস্তক অবনত করিয়া বিধাতার নিকট এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহার দীর্ঘিকায় ইহার জল, তাঁহার মুকুরে ইহার অনল, তাঁহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাঁহার গমনাগমন পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়।

অতএব 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' হইতে ভক্তিকে অতিশয় গরীয়সীই জানিতে হইবে। (সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।—নারদভক্তিসূত্র-২৫)। ভোগবাঞ্ছা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ স্বসুখ তাৎপর্য্যের মলিনতা যে পর্যন্ত লেশমাত্রও অন্তরে সংলিপ্ত থাকে তাবৎ সেই হৃদয়ে পরম শুদ্ধা ভক্তিসুখের আবির্ভাব কখনও হইতে পারে না। তাই পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১.২.২২)

অর্থাৎ,—যে পর্যন্ত ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্তমান রহিয়াছে সেই পর্যন্ত ঐ হৃদয়ে ভক্তিসুখের আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? (অর্থাৎ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে)।

দুঃখবহুল জন্মও যদি ভগবৎসুখতাৎপর্যরূপ রতিমতি যুক্ত হয়, তাহারও গ্রহণে এমন কি দেহান্তে দেহস্থিত পঞ্চভূত দ্বারা কান্তের সেবালালসায় যে ভগবৎ প্রীতি তাৎপর্য—ব্রজের সেই রাগভক্তিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সম্পূর্ণ অধীন হয়েন। বিধিভক্তিতে ভগবান্ বশীভূত হইলেও অধীন হয়েন না। বিধিভক্তি হইতে রাগভক্তির ফলতাৎপর্যের এইখানেই উৎকর্ষ। ব্রজপ্রেমভক্তির এই চরমোৎকর্ষের বিষয় শ্রীচরিতামৃতকারের অপূর্ব বর্ণনায় নিম্নোক্তরূপে বিধৃত দেখা যায়,—শ্রীভগবানের উক্তি—

"সকল জগৎ মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।।

ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে মোর নহে প্রীত।।
আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে আমি না হই অধীন।। ★★
আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।।
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি।।
আপনারে বড় মানে, আমাকে সম হীন।
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।।
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।।
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক—তুমি আমি সম।।
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে ইহা হরে মোর মন।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১৪.১৫-২৩)

সাধনার ফলে প্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে শুদ্ধাভক্তির অভাবস্থলে তত্ত্বদৃষ্টিরও অভাবহেতু—সমূর্ত্ত ও সন্নিকটবর্তী ভগবান্ কেবল মায়িক মনুষ্যরূপেই গ্রাহ্য হয়েন। সুতরাং তত্ত্বতঃ অজ্ঞাত শ্রীভগবানে কেবল মনুষ্যবুদ্ধির উদয় হওয়ায় ভক্তিহীন জনের নিকট তাঁহাকে মানবোচিত গুণদোষের বিচারাধীনও হইতে হয়। আবার শুদ্ধাভক্তির অভাবে এবং মিশ্রাভক্তির বিদ্যমানতা হেতু অষ্টাঙ্গযোগী ও জ্ঞানযোগীর নিকট সেই এক ভগবৎস্বরূপই যথাক্রমে নিজ নিজ উপাস্য—যথাক্রমে সর্বান্তর্যামীরূপ আংশিক ও সবিশেষ পরমাত্মবস্তুর প্রকাশবিশেষরূপে এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুরও অংশে নামরূপাদি-বিশিষ্ট মায়িক সগুণপ্রকাশ বিশেষরূপেই উপলব্ধ হয়েন। পরতত্ত্ববস্তুরও প্রকাশমাত্রেই ভূমাত্মনিবন্ধন সকল স্বরূপের উপাসকের পক্ষেই নিজ উপাস্যের পারম্য বা সর্বোত্তমতা বোধ থাকা স্বাভাবিক হইলেও তটস্থ বা নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রবিচার দ্বারা সেই এক সবিশেষ শ্রীভগবৎ তত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ও পুরুষাদি তত্ত্বের কারণরূপে অবগত হওয়া যায়। যথা,—

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্ত্বিহ কিঞ্চন।। (শ্রীভাগবত—১০.১৪.৫৬)

অর্থ,—এইজগতে তত্ত্বতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের নিকট স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তুর সহিত শ্রীরাম, নৃহিংহ—নারায়ণাদি অখিল ভগবদ-রূপসকল সেই এক পরমাত্মরূপেরই অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। অধিক কি তাঁহাতে যে বস্তু নাই, সংসারে এমন কোন বস্তুর সত্তাই নাই।

"ঈদৃশ সর্বব্যাপক, সর্বভূতাশয়স্থিত, সর্বরূপধৃত, সর্বকারণ কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-গ্রাহ্য। আবার তিনি শুদ্ধাভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হইলেও, সেই শুদ্ধাভক্তির অবস্থাবিশেষ অনুসারে তাঁহার চিদ্‌ঘন সমূর্ত স্বরূপের প্রকাশ বিশেষের তারতম্য সাধিত হয়।

বিধিভক্তিতে তত্ত্বদৃষ্টির প্রকাশ থাকায় 'ঐশ্বর্যপ্রধান' অর্থাৎ সর্বান্তর্যামী সর্বভূতান্তরাত্মাদি ঈশ্বরভাব প্রধানরূপে সমূর্ত ভগবান্ গ্রাহ্য হয়েন।

আর রাগভক্তিতে নিহিত তত্ত্বদৃষ্টির অপ্রকাশহেতু 'মাধুর্যপ্রধান' অর্থাৎ কেবল মমতাস্পদ প্রিয়তম নিজজনরূপেই সমূর্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গ্রাহ্য হয়েন। সুতরাং এতাবৎ আলোচনার সারস্বরূপ—ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তিসাধনের প্রাপ্তির ক্রমোৎকর্ষের বিচারেও আমরা 'রাগভক্তির' পারম্যের বিষয়ই উপলব্ধি করিলাম।

সুখ অপেক্ষা সেবা অধিকতর সুখকর। রাগভক্তির সাধনে এই সেবাই মুখ্য। এই সেবাপরতার ফলে ভগবৎপ্রীতির মাধ্যমে নিখিল জীবাত্মার প্রীতিও সাধিত হয়। —"যয়াত্মা সুপ্রসীদতি (শ্রীভাগবত—১.২.৬) সেবার তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা শ্রীহরির তোষণ ও তাহারই আনুষঙ্গিক ফলে নিজ সুখেচ্ছা না থাকিলেও তৎসুখে সুখী হওয়া যায়। "সুখবাঞ্ছা নাই, সুখ হয় কোটিগুণ" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৪.১৫৭)। তাই 'সুখ' শব্দ ছোট হইয়া যায় 'সেবা' শব্দের কাছে। পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইল পরমানন্দময়। সুতরাং সুখ শব্দেরই অপ্রয়োজনীয়তা—সাধনের অর্থাৎ আত্মধর্মের শেষসীমা যে রাগভক্তি—এই সীমায় 'সেবাই' একমাত্র শব্দ। 'সুখ' শব্দ এখানে আসিয়া বিলীন হইয়া যায় 'সেবা' শব্দের নিকট। সেবা অর্থাৎ সেবন আস্বাদন। অধিক কি ভক্তের ভক্তি বা ভালবাসা অর্থাৎ প্রেমসেবার বিষয় হইয়া ভগবান্ যে পরিমাণে আনন্দিত হয়েন, সেই ভগবদানন্দের 'আশ্রয়' হইয়া ভক্ত তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে আনন্দাস্বাদ করিয়া থাকেন।

সেবাসহ শ্রীভগবদ্‌বস্তুই আস্বাদ্য হওয়ায় আস্বাদনের বা সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত অপর বস্ত্বন্তরের আবশ্যক হয় না। ভগবৎ আনন্দ সমূর্ত ও সাকার। সুখেরই গড়া মূর্তি। মূর্তিতে সুখ নয়—সুখেরই গড়া বিষয়। বিষয়ে সুখ নয়। শ্রীভগবদ্ধাম শ্রীভগবানের বসনভূষণ পরিকরাদি সমস্তই আনন্দে গড়া, চিদানন্দময়। ভগবদানন্দ বা ভক্তিসুখ পূর্ণতম মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া যখন পরমানন্দ পরমরসময় হইয়া যায়, তখন উহাই হয়

‘শ্রীকৃষ্ণানন্দ’ বা পরম প্রেমসুখ। শ্রীকৃষ্ণই সকলের পরম আশ্রয়—পরম কারণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।। (ব্রহ্মসংহিতা—৫.১)

কায়াস্থানীয় ভক্তিসুখের সহিত তদীয় ছায়াস্থানীয় বিষয়-সুখের কোন তুলনাই চলে না। ছায়া ধরা যায় না, কিন্তু কায়া ধরা যায়। সেইজন্য বিষয় সুখে না পাওয়ার অতৃপ্তি, কিন্তু ভক্তিসুখে প্রাপ্তির পরিপূর্ণতা। ছায়াকে যেমন ধরিতে গেলে ক্রমশঃই আগাইয়া চলে সেইরূপ বিষয়সুখের পরিতৃপ্তি চিরদিনই নাগালের বাইরে চলিয়া যায়। অপরপক্ষে কায়াকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করা যায়—ভক্তিসুখ প্রাপ্তির পরম তৃপ্তিতে আত্মার সুপ্রসন্নতা সাধিত হয়।

সুতরাং সাধনের অর্থাৎ আত্মধর্মের শেষসীমা যে রাগভক্তি, যাহা সকল শ্রেয়ের শ্রেয়ঃ, সেই রাগভক্তির উদয়ে সাধক এমন এক পরম মহিমময় সুখানুভূতিতে আপ্লুত হইয়া যান যে উহার অধিক আর কিছুই নাই। এ’কথা শাস্ত্র স্বয়ংই স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি।। (শ্রীভাগবত—১.২.৬)

অর্থাৎ,—যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ও বিঘ্নশূন্যা ভক্তি জন্মিয়া থাকে, সেই ধর্মই মানবমাত্রেরই পরমধর্ম—যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে আত্মার প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে।[১]

যাহা অপর সকল শ্রেয়ঃকে পরাভূত করিয়া সর্বোপরি বিরাজমানা, সেই সম্পূর্ণ নিষ্কামা রাগভক্তি লাভই হইতেছে পরম শ্রেয়ঃ। অধিক কি ? কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি ভক্তিসম্বন্ধ বিযুক্ত হইয়া যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্যগর্ভ সাধনসকল ব্যর্থতাকেই বরণ করিয়া থাকে। একমাত্র ভক্তির আনুষঙ্গেই তাবৎ সাধনসকল ফলপ্রসু হইয়া থাকে। তাই চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সর্ব্বফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র—প্রধান।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২২.১৪)

—কিম্বা—

ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সর্ব্বফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২৪.৬৫)

একমাত্র ভক্তিই সকল সাধনা ও সর্বপ্রকার সিদ্ধির জীবন স্বরূপিণী। প্রাণশূন্য

১। উদ্ধৃতাংশ ‘উজ্জীবন’ পত্রিকার ২৫তম বর্ষ ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদক লিখিত ‘ধর্মের ক্রমোৎকর্ষ ও পরিসীমা’ প্রবন্ধের অংশ।

দেহ যেমন মৃত দেহ বলিয়া পরিত্যক্ত হয় ; তদ্রূপ ভক্তিসম্বন্ধবর্জিত সাধনসকলও পরিত্যাজ্য। ইহাই শাস্ত্রে নিম্নোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে। যথা,—

জীবন্তি জন্তবঃ সর্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ।।

(হরিভক্তিবিলাস—১১.৫৬৯ ধৃত বৃহন্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ,—জীবগণ যেমন জননীকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

সুতরাং স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে, অধিকারানুরূপ কর্ম, জ্ঞান, যোগ যে কোন সাধনার অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের যথোপযুক্ত মঙ্গললাভ হইতে পারে,—যদি তাহা কোনরূপে ভক্তিকে অবজ্ঞাপূর্বক অনুষ্ঠিত না হয়।

স্বামীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, স্বামীর আত্মীয় পুরুষগণের সেবা যেমন কুলস্ত্রীর পক্ষে ব্যভিচারের সমান হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তির সম্বন্ধ বর্জিত হইলে শ্রুতি-স্মৃতি বিহিত নিখিল কর্মই ব্যভিচারে পরিণত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য, যথা—

বিষ্ণুভক্তি বিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশফলং তাসাং স্বৈরিণী ব্যভিচারবৎ।।

ইহার অর্থ,—বিষ্ণুভক্তি বিহীন হইলে, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণিত সমুদয় কর্মই কুলটার ন্যায় ব্যভিচার যুক্তই হইয়া থাকে। অতএব কেবল ক্লেশমাত্রই তদনুষ্ঠানের ফল জানিবে।

তাই ব্রত, পূজাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান মন্ত্রাদির সহিত ভক্তির প্রধান অঙ্গস্বরূপ শ্রীভগবন্নাম সর্বত্র জয়যুক্ত। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব।। (শ্রীভাগবত—৮.২৩.১৬)

ইহার অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণাদি দ্বারা যে সকল দোষ ঘটে, শ্রীভগবন্নাম কীর্তনে তাহা নির্দোষ হইয়া থাকে।

সকল শ্রেয়ের মধ্যে ভক্তির সাধনই কেবল 'অনপেক্ষিত'। কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির 'ভক্তি' অপেক্ষা আছে, কিন্তু ভক্তি নিজে স্বতন্ত্রা স্বয়ংসিদ্ধা। ভক্তিই বেদাদি সর্বশাস্ত্রের মুখ্য ও পরম বন্দনীয়া। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধসকলের মূল উদ্দেশ্য ভক্তিই, অর্থাৎ ভক্তিই সকল শ্রেয়ের শ্রেয়ঃ। ভক্তিলাভের প্রচেষ্টাই জীবের পরম পুরুষার্থ, শাস্ত্রানুসারে ভক্তির আনুগত্য ব্যতীত কোন কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া উচিৎ নহে। এই উভয় বিধিনিষেধই নিম্নোক্ত শ্লোকের মুখ্য তাৎপর্য ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড, ৪২ অঃ, বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র-৯৭ শ্লোক)

ইহার অর্থ,—সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে, কদাচ তাঁহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না, সমস্ত শাস্ত্রের যত বিধি ও নিষেধ সে সমুদয় উক্ত বিধিনিষেধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ভক্তিকে নির্দেশ ও তদভিমুখে চালিত করিবার ও তাহা হইতে বঞ্চিত না হইবার জন্যই, বেদাদি শাস্ত্রান্তর্গত সমস্ত বিধিনিষেধের যে তাৎপর্য তাহা শ্রীনারদাদি সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভূতিতেই, তাহার সম্যক্ প্রমাণ। যথা,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। (শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র—১.৬)

ইহার অর্থ,—যদি শ্রীহরিই আরাধিত হয়েন, তবে অন্য তপস্যার কি প্রয়োজন ? আর যদি শ্রীহরিই আরাধিত না হয়েন, তবেই বা সে তপস্যার প্রয়োজন কি ? যদি অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি বিহার করেন, তবেই বা আর তপস্যার প্রয়োজন কি ? যদি শ্রীহরি অন্তরে বাহিরে বিহার নাই করিলেন, তবেই বা সে তপস্যার প্রয়োজন কি ?

শুদ্ধাভক্তির অনুদয় কাল পর্যন্তই জীবের পক্ষে সকল শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ পালনীয়। একমাত্র একান্তী ভক্তির উদয়েই সমস্ত বিধিনিষেধের বন্ধন অতিক্রম করা যায়। ভক্তির অনুষ্ঠাতা ভক্ত একমাত্র শ্রীহরি ব্যতীত অপর কাহারও নিকট ঋণী নহেন। যথা,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।।

(শ্রীভাগবত—১১.৫.৪১)

অর্থাৎ,—যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি পরিহারপূর্বক সর্বতোভাবে শরণাগত প্রতিপালক মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন ; তিনি দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব ও পিত্রাদির নিকট আর ঋণী নহেন, শ্রীভগবদ্দাস অপর কাহারও ভৃত্য হন না।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য সকলের সারমর্ম এই যে, স্বধর্ম ত্যাগ করিলেই লোকে ভক্তির অধিকারী হয় না, কিন্তু যদৃচ্ছালব্ধ ভক্তির অধিকার জন্মিলে স্বধর্মসকল আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়।

তোমার ভক্তকৃত অধর্মবৎ অনুষ্ঠান ধর্ম এবং তোমার অভক্তকৃত ধর্মানুষ্ঠানও অধর্ম, যথা,—

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোহপি ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোহপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।।

(হরিভক্তিবিলাস—১০,৯১ ধৃত স্কন্দবাক্য)

তাই নারদ-ভক্তিসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—'ওঁ নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।' (৭২) অর্থাৎ ভক্তের জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়াদির কোন অপেক্ষা নাই। এতাদৃশী ভক্তি অঙ্গী শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতেই যথাক্রমে উদয় হইয়া থাকে। এইহেতু সর্বশ্রেয়ো মধ্যে ভক্তিই সর্বোপরি সর্বভাবে জয়যুক্ত। তদুপরি শ্রীনামসঙ্কীর্তনেরই জয় জয়াকার—সেই ভক্তিলাভের পরম ও একমাত্র কারণ বলিয়া।

শুদ্ধাভক্তিবিষয়া নির্গুণা শ্রদ্ধালাভের পরমসৌভাগ্যসূর্য যতক্ষণ না জীবের মঙ্গলাকাশে উদিত হইতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্তই অগত্যা হিসাবে জীবের পক্ষে অধোগতিরোধক ও ক্রমোন্নতিপ্রাপক কর্মজ্ঞানাদিরূপ গ্রহচন্দ্রের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহাতেও আবার গ্রহ ও চন্দ্রালোকের কারণস্বরূপ যেমন মূলে সূর্যই বিদ্যমান, তদ্রূপ অপর সাধনসকল ফলপ্রসূ হইবার নিমিত্ত ভক্তির সহায়তা ও সংমিশ্রণ প্রয়োজন।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।।

(শ্রীভাগবত—২.৪.১৭)

অর্থাৎ,—[পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি]—তপস্বী, দানবীর, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবিদ এবং সদাচারিগণ যে ভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গললাভে সমর্থ হয়েন না—সেই পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবানকে নমস্কার করি।

জ্ঞানের ফল যে মোক্ষলাভ, তাহাও ভক্তিমুখ নিরীক্ষক। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, —মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী—(বিবেকচূড়ামণি)।

"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" (যোগসূত্র—১.২৩) এই বাক্যে যোগেরও ভক্তি অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হয়। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" (যোগসূত্র—১.২৭) ও "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" (যোগসূত্র—১.২৮) এই সূত্রদ্বয়ে ভক্তির প্রধান অঙ্গ যে নামাশ্রয়, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

কিন্তু ভক্তি নিজে স্বতন্ত্রা, ইহাঁকে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং—" বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভক্তি থাকিলে অপর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। আর ভক্তি না থাকিলে কিছুরই সার্থকতা নাই। শ্রীচরিতামৃতে তাই উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয় প্রধান।
ভক্তি মুখ নিরীক্ষক—কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে ফল।।

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২২.১৪-১৬)

যাঁহার সম্বন্ধের সংযোগ ও বিয়োগে অপর ধর্মসকল সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হয়, সেই স্বয়ংসিদ্ধা ভক্তিই জীবের পরমধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, যথা—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।। (শ্রীভাগবত—১.২.৬)

ইহার অর্থ,—যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ও বিঘ্নশূন্যা ভক্তি (ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা রতি) জন্মিয়া থাকে, সেই ধর্মই মানবমাত্রের পরমধর্ম, যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে আত্মপ্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে।

অপরপক্ষে,—যে ধর্ম-কর্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ পরম প্রয়োজন সুসিদ্ধ না হয়—সেই ধর্মাদির আচরণ নিষ্ফল বৃক্ষে জলসেচনের ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াসমাত্রই হইয়া থাকে। এ'বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি, যথা,—

ধর্ম স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।। (শ্রীভাগবত—১.২.৮)

ইহার অর্থ,—সযত্নে অনুষ্ঠিত হইয়াও যে ধর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কথায় রতি না জন্মে, পুরুষের সেই ধর্মানুষ্ঠান কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র।

সুতরাং ভক্তিপথের যে গতি তাহাই প্রকৃষ্ট গতি। ভক্তিই জীবের সকল জড়সঙ্গ নিরসন করিয়া, সকল চাঞ্চল্য ও গতায়াত নিরোধপূর্বক পরম পদ প্রাপ্ত করান। ভক্তির অনুশীলনেই বিষয়-কামনাদি সকল তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া চিত্তের সুপ্রসন্নতা ও শান্তি লাভ হয়। তাই শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৯.১৩২)

এই ভক্তিসুখের এমনই মহিমা যে, 'ভূমা' প্রাপ্তে পূর্ণকাম যাঁহারা তাঁহাদেরও (সেই সিদ্ধ জ্ঞানীরও) চিত্ত, সেই ভক্তিসুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর ভক্তিসুখাভিলাষ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতেই সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, "মুক্তা অপি এনং উপাসতে"—বা "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"—যাহা শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক সমর্থিত। আবার,—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ।। (শ্রীভাগবত—১.৭.১০)

অর্থাৎ,—আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির প্রতি নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন। যেহেতু ভগবান্ শ্রীহরি এইরূপ কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন।

উক্ত শ্লোকে যোগীরও ভক্তিতে আকৃষ্টতার কথা সগৌরবে ঘোষিত হইয়াছে।

"আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— ২.১৭.১৩৩)

সাধকের এই শুদ্ধাভক্তির জীবহৃদয়ে আবির্ভাবের কাল হইতে, চিত্তের অমার্জিত, মার্জিত ও পরিমার্জিত অবস্থাত্রয় ভেদে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন,—

'সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১.২.১)

জীবের জড়ত্ব হইতে ভক্তত্বের ক্রমবিকাশে ভক্তির বিকাশভেদ পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তি বা প্রেম ভিন্ন নহে,—সাধনভক্তির দ্বারাই প্রেমভক্তি জীবহৃদয়ে ক্রমোদিত হন। অতএব ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়, ভক্তির স্বরূপ-সিদ্ধত্বের কোন হানি হয় না, যথা,—"ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা—" (শ্রীভাগবত—১১.৩.৩১)। মায়াহত জীবের পক্ষে সাধ্যভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম লাভে সাধনভক্তিই কারণ হওয়ায়—তাহাই জীবের সর্বশ্রেয়ঃ প্রধান। সুতরাং এ'স্থলে শ্রেয়ঃ বা সুমঙ্গল অর্থে সাধনভক্তিকেই বুঝাইতেছে। তাই একমাত্র ভক্তিসুখই সকল শ্রেয়ের শ্রেয়ঃ, সকল মঙ্গলপ্রদ এবং এই ভক্তির সাধনই সর্বশাস্ত্র বন্দনীয় নিরপেক্ষ সাধন।

তাই শাস্ত্র ভক্তি অভিন্ন শ্রীনামের সর্বোপরি মহামহিমার কথা উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যথা,—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১-৪৫১) ধৃত প্রভাসখণ্ডের বাক্য]

অর্থাৎ—যিনি মধুর হইতেও মধুর, যিনি সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলদায়ক, যিনি নিখিল বেদলতিকার উপাদেয় ফল এবং চিদেকস্বরূপ সেই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাসহকারে কিম্বা অবহেলাপূর্বক একবারমাত্রও পরিগীত হইলে, হে শৌনক মনুষ্যমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

কৈরব যেমন জ্যোৎস্নালোকের আরম্ভে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়, সেইরূপ সাধনভক্তি শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ জ্যোৎস্নালোকে শ্রদ্ধাদি ক্রমে বিকশিত হন। আবার শ্রেয়ঃরূপ যে সাধনভক্তি, সেই সাধনভক্তিরূপ মঙ্গলের প্রকাশক বলিয়া—তাই শ্রীহরিনামকে মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ (অথবা "কল্যাণানাং নিধানং পাবনং পাবনানাং"—

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্রষ্টব্য। 'নিধান' অর্থে আধার, ভাণ্ডার—শ্রীনামসঙ্কীর্তন এই কল্যাণের আধার বা ভাণ্ডার স্বরূপ।)।

এই নামসঙ্কীর্তন হইতেই জীবের বিষয়বাসনা মলিন, ক্লেদাক্ত চিত্তদর্পণের ক্রমশঃ পরিমার্জন হইয়া শ্রদ্ধাদিক্রমে ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গ সকলের উদ্গাম হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ সেবাসুখসমুদ্র সলিলে নিমজ্জিত হওয়া যায় ; যথা,—

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গাম।।
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গাম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.১০-১১)

সর্বশ্রেয়ঃ প্রধান, যাহার উপর আর অপর কোন মঙ্গল বা শুভ নাই—সেই নবধা ভক্তির সহিত একাসনে শ্রীনাম অবস্থান করিলেও, শ্রীনামের সাধনকে মুখ্য বা অঙ্গী সাধনরূপেই জানিতে হইবে। শ্রীনামসঙ্কীর্তনের এই সর্বোৎকর্ষতার বিষয়ে, স্বয়ং শ্রীনামী কর্তৃকই সুস্পষ্টরূপে বিঘোষিত হইয়াছে, যথা,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৪.৬৫-৬৬)

এই অব্যর্থ নামের মহিমা কোন ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় না—একমাত্র নামাপরাধ ক্ষেত্র ব্যতীত। এই হেতু 'নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন।'—সাক্ষাৎ শ্রীমুখের উক্তি ও নির্দেশ দ্বারা নামাপরাধ হইতে আমাদের সর্বথা সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীনাম হইতে ভক্তিরূপ যে সর্বোত্তম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কৈরব যেমন ক্রমে ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিম্নোক্ত যথাক্রমেই সাধনভক্তি, প্রেমভক্তিরূপে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতেই শ্রেয়ঃরূপ কৈরব অর্থাৎ সাধনভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। প্রেমোদয়ের ক্রম বাস্তব-সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইতে দেখা যায়, যথা,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকনাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১.৪.১৫-১৬)

অর্থাৎ,—প্রথমে শ্রদ্ধা (নির্গুণা), তদনন্তর সাধুসঙ্গ, অতঃপর ভজনক্রিয়া, পরে অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তাহার পর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে, সাধকদিগের প্রেম প্রাদুর্ভাবের ইহাই ক্রম।

এই নির্গুণাভক্তি, প্রথমে সাধনভক্তিরূপে জীবের পক্ষে গ্রহণীয়া হইবার জন্য প্রধানতঃ নয়টি বিবিধ লক্ষণে প্রকাশিত হয়েন। তাই নবলক্ষণকেই শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধা ভক্তিরূপে কীর্তন করা হইয়াছে। যথা,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।। (শ্রীভাগবত—৭.৫.২৩)

অর্থাৎ,—শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, পুরুষ কর্তৃক শ্রীভগবানে সমর্পিত হইয়া গৃহীত হইলে তাহাকে নবলক্ষণা ভক্তি কহে।

এতাবৎ আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে শ্রীনামসঙ্কীর্তন সকল শ্রেয়ের শ্রেয়ঃ। সকল সাধনার মধ্যে সর্বোপরি মহিমায় বিরাজিত। এখন ইহাই প্রণিধানযোগ্য যে—শ্রেষ্ঠতম সাধনায় যাহা লাভ করা যায় তাহাও অর্থাৎ সেই সাধ্যবস্তুও শ্রেষ্ঠতম মহিমায় বিরাজিত। 'সাধ্য' হইতেছে উপেয় বা প্রয়োজন। আর তাহার সাধন হইতেছে 'উপায়' বা অভিধেয় অর্থাৎ কর্তব্য। 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয় উদ্দেশ্যে রায় রামানন্দ সম্বাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই বলিয়াছেন,—

সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৫৮)

সীমাপ্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুই হইতেছেন পরম সাধ্য বা প্রয়োজন এবং সেই সাধ্য বা প্রয়োজন পাইবার উপায় বা অভিধেয় বলিয়া শ্রীনামসঙ্কীর্তনকে পরম উপায় বলা হইয়াছে। তাহাই জগৎকে বিদিত করাইবার জন্য স্বয়ং নামী শ্রীমন্মহাপ্রভু সহর্ষে ঘোষণা করিতেছেন,—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.৭)

সর্বকালেই এই শ্রীনামসঙ্কীর্তন সকল উপায় হইতেও পরম উপায় হইলেও এই কলিতে ভগবৎকৃপা সাপেক্ষে উহা সহজ গ্রাহ্য হওয়ায় 'কলৌ পরম উপায়' বলা হইয়াছে। নামসঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষের সহিত সর্বযুগেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তথাপি কলি ব্যতীত অন্য যুগে কেবল কতিপয় পরম ভাগবত ব্যতীত আপামর সাধারণের গ্রহণীয় হয়েন না। কেবল কলিযুগবিশেষেই (গৌর প্রকটিত বিশেষ কলিতেই) ইহা যুগধর্মরূপে[১]

১। 'যুগ' শব্দে কল্প অর্থে ব্রহ্মার দিবস মধ্যে একবার পরমধর্ম (প্রকৃষ্ট আত্মধর্ম) নিরূপণ কালে।

(কল্পে একবার) সাধারণ্যে গ্রহণীয় হইয়াছেন। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রসংশয়েতি স্থিতম্।" [ভক্তি-সন্দর্ভঃ (২৭৩)] অর্থাৎ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন সর্বযুগে সর্বাভীষ্ট প্রদানে সমানই সমর্থ। তবে এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপা (গৌরকৃপা) সাপেক্ষে উহা গ্রহণীয় হওয়ায় বিশেষরূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন।

তাই সর্বদোষযুক্ত কলিতে সত্যাদি যুগের ন্যায় কঠোর সাধনার পরিবর্তে (তপ, যোগ প্রভৃতি) সহজসাধ্য উপায় হিসাবে ভগবন্নাম সমাশ্রয়ে পরম প্রয়োজন প্রেমভক্তি লাভ করা যায়। ইহাই এই যুগের একমাত্র মহৎগুণ। শ্রীভাগবত তাই বলিয়াছেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেবস্য কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। (শ্রীভাগবত—১২.৩.৫১)

অর্থাৎ,—হে রাজন ! কলি সর্বদোষের আকর হইলেও উহার একটি মাত্র মহৎগুণ এই যে, এই যুগে লোকে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন দ্বারাই সকল পাপ বা অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে। তাই শাস্ত্রে স্বয়ংই আবার এই নামকীর্তনকেই একমাত্র যুগধর্ম বলিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।। (বৃহন্নারদীয়পুরাণ, ৩৮-১২৬)

আর এই নামাশ্রয় ছাড়া কলিহত জীবের আর অন্য কোন প্রকার গতিও যে নাই, তাহা কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপরিউক্ত শ্লোকটির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় বুঝাইতেছেন,—

দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেব কার।।
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান যোগ কর্ম তপ আদি নিবারণ।।
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাই, নাই, নাই তিন—তিনে এবকার।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১৭.২০-২২)

হরিনাম বিনা জ্ঞান যোগ তপ ইত্যাদি কোন সাধনাই যে কলিযুগে ফলপ্রদ নহে, ইহাই এ'স্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য বা উপেয় অর্থাৎ রাগভক্তির সীমা (ব্রজপ্রেম) যাহা, তাহা এই সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরমসাধন বা উপায় হইতে লভ্য হইয়া থাকে, অপর সাধ্য বা প্রয়োজন এই

নামসঙ্কীর্তনের আনুষঙ্গিক গৌণফলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংস্মৃতিঃ।। (শ্রীভাগবত—১১.৫.৩৬)

অর্থাৎ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান দেহিদের পক্ষে যে সঙ্কীর্তন হইতে পরমশান্তি ও সংসারগতি রোধ হয়, তাহার চেয়ে পরমলাভ আর কিছুই নাই।

যাহা পরম প্রয়োজন তাহা পাইলে অন্য প্রয়োজন বা সাধ্যের আবশ্যক হয় না। উহার পরম উপায় ব সাধন হইতেছে শ্রীনামসঙ্কীর্তন। তবে যদি অন্য সাধ্য বা প্রয়োজন প্রাপ্তির জন্য কাহারও আকাঙ্খা থাকে, তাহার পক্ষেও কর্তব্য হইবে নামসঙ্কীর্তনের সহযোগে উহা সাধন করা। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—"অতএব যদান্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।" [ভক্তি-সন্দর্ভঃ—২৭৩] অর্থাৎ কলিযুগে কাহারো পক্ষে অন্য কোন ভক্তির অঙ্গ যদি কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহা ইহার (নামসঙ্কীর্তন) সহযোগে করণীয়। এই হেতু শাস্ত্রের ব্যবস্থা 'সর্বকার্যেষু মাধবম্।' সকল কাজেই শ্রীমাধব স্মরণীয়।

শ্রীনামের সংযোগ ব্যতীত জ্ঞান-কর্মাদির কোন সাধনাই ফলপ্রদ হয় না। দোষদুষ্ট যুগ-প্রভাবে দেশ, কাল, পাত্র ও উপকরণাদি বিষয়ে অশুদ্ধতা বা বিবিধ ছিদ্রত্ব বিদ্যমান। এ'কারণে উহাদের সংযোগে সাধিত যাগযজ্ঞ-তপতীর্থাদি-সাধন সকল স্বতঃই ফলপ্রসু নহে। কিন্তু ঐ সাধন সকলের সহিত শ্রীহরির নাম সংযুক্ত হইলে সেই পরম পবিত্রকর নামের গৌণ ফলবশতঃ সকল অশুদ্ধতা ও ছিদ্রতা নির্দোষত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্র ইহা বিদিত করাইতেছেন।

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব।। (শ্রীভাগবত—৮.২৩.১৬)

অর্থাৎ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, শাস্ত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা দোষ ঘটিয়া থাকে [হে হরে !] তোমার নামকীর্তনে সমুদয়ই নিশ্ছিদ্র হয়।

তপ যজ্ঞাদি অন্যান্য ক্রিয়াসকল বিষ্ণুনাম কীর্তনেই সম্পূর্ণতা লাভ করে।

যথা,— যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্।।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১-৩৭৭) ধৃত স্কন্দপুরাণবাক্য]

অর্থাৎ,—তপ, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়াদিতে যে কিছু ন্যূনতা তাহা যাঁহার নামের স্মরণ ও কীর্তন হইতেই সদ্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে ; আমি সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি।

অতএব অপরাপর সাধন-প্রসূত অভিপ্রেত ফললাভে বিশেষতঃ পাপ-প্রবণ কলিযুগে শ্রীনামের অপরিহার্যতাই প্রতিপন্ন হইতে দেখা যায়। সুতরাং নামসঙ্কীর্তন পরম উপায় বা প্রয়োজন প্রাপ্তির পরম উপায় বলিয়া তৎসকাশে অপর সকল উপেয় প্রাপ্তির উপায়, 'সাধনমহিমায়' অতি সামান্যই বুঝিতে হইবে। সর্বশাস্ত্রেই ইহাই সুস্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীত কথা কোন শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায় না। অর্থাৎ নাম-মহিমাকে অপর কোন শুভক্রিয়াদি বা সাধন হইতে ন্যূন দেখা যায় না বরং তাহার পরম উৎকর্ষের বিষয় ও অসম অনূর্দ্ধ মহামহিমাই সর্বত্র পরিগীত হইয়াছে। বিশেষ অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত ন্যূনতা তো দূরের কথা, এমন কি উহাদের সহিত শ্রীনামের সমতা চিন্তনই শাস্ত্রে অপরাধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে সরোবরস্থিত কুমুদিনী যেমন কোরক হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া প্রস্ফুটিত শতদলরূপে শোভা পায়, জীবহৃদয়ে শুদ্ধাভক্তির বিকাশও তেমনি শ্রীনামরূপ চন্দ্রালোকের দ্বারা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। পঙ্কোত্থিত কমল-কলিকার ন্যায়ই জীবহৃদয়-কমলও যথাক্রমে 'শ্রদ্ধা', 'সাধুসঙ্গ', 'ভজনক্রিয়া', 'নিষ্ঠা', 'রুচি', আসক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়ে, পরে 'ভাবভক্তি' ও পরিশেষে 'প্রেমভক্তি' বা প্রেমশতদলে পরিণত হয়—শ্রীনামের অবিচিন্ত কৃপাশক্তির প্রভাবে—যাহা হইতে মর্তজীবের পক্ষে 'পরমলাভ' আর কিছুই নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, একদা শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কুলীনগ্রামবাসী শ্রীরামানন্দ ও সত্যরাজ খান সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে প্রভু ! আমরা বিষয়ী গৃহস্থ, আমাদের কি সাধন, তাহা কৃপাপূর্বক শ্রীমুখে আদেশ করুন।

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন।।
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০২-১০৩)

তদুত্তরে কৃপাময় মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০৪)

এখানেও প্রশ্নের ঠিক অবসান হইল না, কারণ কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণ বুঝিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের মুখ্য সাধ্যবস্তু। সেই সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তির প্রাথমিক সাধন হিসাবে গৃহস্ত বিষয়ী জনের পক্ষে—বৈষ্ণব-সেবন ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন

এই দুইটি বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ।[১] দ্বিতীয় আদেশটি অর্থাৎ নামসঙ্কীর্তন সম্বন্ধে এখানে আর কোন কথা তেমনভাবে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-সেবা দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়। সুতরাং বৈষ্ণবের সেবা কর—এই যে মহাপ্রভুর প্রথম আদেশ এই আদেশটি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া লইতে হইলে অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে, সেই ভাগ্যবান্ বৈষ্ণব কি লক্ষণে চিনিব,—যাহার সেবায় কৃষ্ণসেবা হয় ? তাই শ্রীসত্যরাজ সবিনয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

সত্যরাজ কহে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০৫)

প্রভু আমার এইবার শ্রীমুখে স্পষ্টরূপে বৈষ্ণব-লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছেন। শুধু লক্ষণে নহে, সেই লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব হইবার অধিকারও নির্ণয় হইতেছে। যথা,—

প্রভু কহে যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম—পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০৬)

বর্ষান্তরে আরও দুইবার কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণ ঠিক এইরূপ ভাবের প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরচ্ছলে এইবার সর্বসাধারণকে বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমতার লক্ষণ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এইরূপ, যথা—

তিঁহ কহে কে বৈষ্ণব কি তাঁর লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন।।
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে।।
বর্ষান্তরে তাঁরা পুনঃ ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল।
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।।
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৬.৭১-৭৫)

শ্রীমুখের এই অতি সুস্পষ্ট উক্তি হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, অন্ততঃ একবারও কৃষ্ণনাম যিনি উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই পূজ্য—তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ,—তিনিই বৈষ্ণব। ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য অলৌকিক গুণাবলীতে বৈষ্ণব

১। সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব যে কিছু মঙ্গল। কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১০) এবং—"মৎ স্মৃতি সাধু সেবয়া।" (শ্রীভাগবত—১১.১১.৪৫) ; কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২২.৪৮) কিম্বা—ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্। (হরিভক্তিবিলাস—১০.৯২) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ভূষিত হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে 'বিশেষ লক্ষণে' বৈষ্ণবতর বা বৈষ্ণবতম রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবেশ পথে, বৈষ্ণব হইবার প্রথম সাধনা—প্রথম অধিকারের কথা এই যে, 'সামান্য লক্ষণে যাহা উক্ত হইয়াছে,— আমরা বলি ইহাই সমগ্র সাধন-জগতের সুসংবাদ, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

পরমকারুণিক শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কৃপাপূর্বক কুলীনগ্রামবাসী বা অপরাপর বৈষ্ণব-গণকে তাঁহাদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহাই কেন আদেশ করুন না, কিন্তু বৈষ্ণবতর বা বৈষ্ণবতম হইবার জন্য নহে,—কেবলমাত্র বৈষ্ণব হইবার অধিকারে যে একবারমাত্র বদনে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ব্যতীত অপর কোন সাধনা আছে, উক্ত শ্রীমুখের বাণী শুনিবার পর আমরা এ'কথা আর কোনক্রমে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বদনের সহিত কৃষ্ণনামের একবারমাত্র সংযোগ যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকারী। প্রেমের পথে—ভক্তির পথে—বৈষ্ণব হইবার সাধনপথের আরম্ভ এইখানে, এই বদনের সহিত কৃষ্ণনামের বারেক সংযোগ হইতে।

কেবল শ্রীমুখের বাক্যের দ্বারা নহে, এ'বিষয়ে ব্যবহারিক প্রমাণও— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বহু স্থানে বহু প্রকারে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে সম্বন্ধে আকর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য অতি সংক্ষেপে নিম্নে কতিপয় প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে উদ্ধৃতাংশ হইতে আপাততঃ অপর অর্থ বা অপর ভাবাবিষ্কারের সচেষ্ট না হইয়া, কেবল কৃপাপূর্বক এইটুকু লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, বদনের সহিত কৃষ্ণনামের যে স্থানে, যে মুহূর্তে হইতে সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহাকেই স্পষ্টরূপে সেই সময় হইতেই 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি।।
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম।।
এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল।।

* * * * *

সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সব বৈষ্ণব করি।।

* * * * *

বৈঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্।।
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিল।

* * * * *

এবে বৈষ্ণব হইল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ।।

* * * * *

সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কাঁদে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্বদেশে।।

* * * * *

তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ নাম।

* * * * *

প্রভু বলে উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে।।
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হইল প্রেমাবেশ।।

* * * * *

সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইল।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।।

* * * * *

যেই যেই জন প্রভুর পাইলা দর্শন।
সেই সেই গ্রামে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।।
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব করিল সব দেশ গ্রাম।।

* * * * *

সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্য বেশে আসি।।
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি যায় প্রেমাবিষ্ট হইয়া।। —ইত্যাদি

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য-৭.১১৬-১১৮, ৯.৮, ১৫.২৭৭,
১৫.২৯২, ১৭.১২৮, ১৮.২০৫-২০৬, ১৮.২১০-২১১)

নিরাশার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া, সাধনরাজ্যের এই আশার সংবাদ পাইয়াছি বলিয়া, তাই আজ আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি যে, হে সংসার মরুপথের পথশ্রান্ত পথিক ! হে ত্রিতাপের তীব্র তুষানলে পরিদগ্ধ কলিহত জীব ! যাহা পাইবার জন্য কত জন্ম জন্মান্তর কাঁদিয়াছ,—কত হতাশার মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছ, সেই 'শ্রেয়ঃ'রূপ বিশাল বিটপীর সুশীতল সমীরণ সিঞ্চিত স্নিগ্ধছায়ায় শয়ন করিয়া, যদি চিরতাপিত চিরশ্রান্ত-চিরনৈরাশ্যপূর্ণ জীবনপ্রবাহ, চিরদিনের জন্য সার্থক করিয়া লইতে চাহ ; যাহা তোমাদিগকে বিনামূল্যে দান করিবার জন্য দয়ার অনন্ত জলধি সেই মহান্ প্রভু স্বয়ং আসিয়া, মা ভৈঃ রবে আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন,—সেই সরল সুন্দর সুগম সাধনতরুর মূল এইখানে,—এই অতি সহজলভ্য দুইটি বর্ণ অতি সহজসাধ্য একবার জিহ্বার উচ্চারণে।

অতঃপর আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব, কেমন করিয়া এই অনায়াসলভ্য কৃষ্ণনাম, একটিবার মাত্র গ্রহণ করিবার পর হইতে, বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হইয়া—যথাক্রমে অভাবনীয় বিবিধ গুণসম্পদে বিভূষিত হইয়া, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমরূপে গণ্য ও চিরাভীষ্ট বস্তুর সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে সমর্থ হয়েন। কেমন করিয়া সাধক এই প্রেমধর্মের স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া, সাধনার শেষ সোপান অতিক্রমপূর্বক 'প্রয়োজন'স্বরূপ—প্রেম-মহাসম্পদের অধিকারী হইতে পারেন ; অতঃপর তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, তৎসহ ইহাও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইবে যে, এই যে স্তরে স্তরে সাধকের সাধনপথে অগ্রসরণ—ইহা তাঁহার নিজ সামর্থ্য—নিজ অধ্যাবসায়গুণে নহে, ইহা কেবল সেই পরমকারুণিক,—অপ্রাকৃত—অচিন্ত্য—নামীর সহিত অভিন্ন—একমাত্র নামেরই অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে। ক্রম অনুসারে বৈষ্ণবসাধক যে বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমরূপে পরিণত হয়েন,—সাধনমার্গের যথাস্থানে উপনীত হইয়া তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ' ইত্যাদি অত্যদ্ভুত গুণগ্রামে ভূষিত হয়েন। অতঃপর আমরা বুঝিতে পারিব,—এই হওয়া তাহার স্বসামর্থ্যে নহে—নামের অলৌকিক শক্তি সাধকের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহাকে এইরূপ 'হওয়ায়'। অয়স্কান্ত যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কি যেন এক মহা আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। লোকে দেখে, তিনি চলিতেছেন,—কিন্তু সাধক অনুভব করিতে পারেন—তিনি চলিতেছেন না,—কে যেন তাহাকে চালাইতেছেন। এই যে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইবার সুসংবাদ,—সাধন-জগতের এই আশার কাহিনী অতঃপর আমরা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করিয়া বর্ণনা করিতে সচেষ্ট হইব।

নির্দিষ্ট ক্রম বা স্তরকে অতিক্রম করিয়া কোনও বিষয় সুসম্পন্ন হইতে পারে না,

ইহা প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। এই নিয়মের অনুসন্ধানে সংবদ্ধ হইয়া আমাদিগের এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক পদার্থই অভিব্যক্তির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই নির্দিষ্ট ক্রম বা ধারার অনুসরণ করিয়া নির্দিষ্ট সুরে বাজিয়া বাজিয়া—নির্দিষ্ট তালে নাচিয়া নাচিয়া প্রত্যেক বিষয়—প্রতি পদার্থ, ক্রমবিকাশের স্তরে নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। যে ক্ষণে, যে মুহূর্তে এই নির্দিষ্ট 'ক্রমের'—এই বাঁধাসুর, বাঁধাতাল কাটিয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত হইতে সে বস্তুকে,—তাহার স্বজাতীয় সমষ্টির —এই অভিব্যক্তির মহা অভিযান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ইহাই যেমন এই প্রাকৃত জগতের ভাঙ্গা-গড়া ও গড়া-ভাঙ্গার ইতিহাস ; সেইরূপ অপ্রাকৃত রাজ্যের দিকে যে অভিব্যক্তি—সেই সচ্চিদানন্দময়ের অফুরন্ত আনন্দের দেশে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার যে অভিধেয় যে সাধনার কথা শাস্ত্রে পরিকীর্তিত হইয়াছে, আমরা একটু স্থিরভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, তাহাও একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম বা স্তরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। এই ক্রমকে উপেক্ষা করিয়া সাধনার পথে পদ মাত্রও অধিক অগ্রসর হইবার যো নাই। সাধনার সেই ক্রমের কথাই আমরা শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিয়া অতঃপর আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইব।

পুরুষার্থ চতুষ্টয় যাহার নিকট অতি তুচ্ছ, সেই পঞ্চমপুরুষার্থরূপ 'প্রেম'ই একমাত্র সাধ্য বা জীবের পরম প্রয়োজনীয় সম্পদ। প্রেম-মহাসম্পদের অধিকারী হইবা মাত্রই জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধি—শ্রীভগবদ্ পাদপদ্ম-সেবাসুখ লাভ করিয়া, পূর্ণকাম হইয়া থাকেন। জীব হৃদয়ে যতক্ষণ না প্রেমের অভ্যুদয় ঘটে, ততক্ষণ শ্রীভগবদ্ সন্দর্শন লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য প্রেমকেই শাস্ত্রকারগণ 'প্রয়োজন' বলিয়া ও প্রেমরূপ প্রয়োজনকে লাভ করিবার উপায় যাহা তাহাকেই তাহার অভিধেয় বা সাধনা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কমল-কোরক যেমন স্তবকে স্তবকে বিকশিত হইয়া প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হয়, সেইরূপ সাধক-হৃদয়, সাধক-অবস্থার কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তরের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া—প্রেমরূপ পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হইয়া থাকেন। শাস্ত্র, সাধনার সেই স্তর বা ক্রম কয়াটির বিষয় এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।৪।১৫-১৬)

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়ঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।

অর্থাৎ সাধক সাধনপথে প্রবেশ লাভ করিয়া, প্রথমে শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া থাকেন, শ্রদ্ধার পরেই সাধুসঙ্গ ঘটে ; এই সাধুসঙ্গের পরে ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় ;

প্রকৃষ্ট ভজনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকে। তাহার পর শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ও তদীয় সম্বন্ধমাত্রেই নিষ্ঠা জন্মে ; তদনন্তর তৎপ্রতি আসক্তি জাগিয়া উঠে ; এই 'আসক্তি'-স্তর পর্য্যন্ত 'সাধনভক্তি'র শেষ সীমা। আসক্তির পরেই ভাবের উদয় হইয়া থাকে ; ইহার নাম 'ভাবভক্তি'। ভাবের বৃদ্ধি হইলে 'প্রেম'-এর অভ্যুদয় ঘটে ; প্রেমের অঙ্কুরাবস্থার নামই 'ভাব' বা 'রতি'। সাধনার প্রথম স্তর 'শ্রদ্ধা' হইতে 'প্রেমভক্তি' প্রাদুর্ভাবের ইহাই শাস্ত্রবর্ণিত—সুনির্দ্দিষ্ট ক্রম। এই ক্রমকে সর্ব্বতোভাবে অপেক্ষা করিয়া 'প্রেমভক্তি'র সাধককে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়।

ইতিপূর্বে প্রবন্ধে আমরা, শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনই যে একমাত্র সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে অতি সহজলভ্য ও এই সুমহান্ ভক্তিধর্ম সাধন-পথে প্রবেশ লাভ করিবার—বৈষ্ণব হইবার প্রধান সাধনা, এ'কথা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। পুনরায় 'শ্রদ্ধা' হইতে 'ভাব' পর্যন্ত এই ক্রমগুলির কথা শ্রবণ করিয়া, ইহাকে সাধনার কঠোরতাবোধে, সাধারণতঃ লোকের মনে পূর্ববৎ ভীতি ও নিরাশার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এই 'ক্রম' বা স্তরের সংবাদে অণুমাত্রও দুঃসংবাদ নিহিত নাই। বহির্দৃষ্টিতে ইহা যতই কঠোরতাময় বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, স্থিরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব—এই স্তরে স্তরে সুসজ্জিত সাধনার পথ। এই 'ক্রম'সকল—বাস্তবিকই কঠোরতার তীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাচ্ছন্ন নহে,—কোমলতার কুসুম স্তবকে আবৃত ! —এইরূপ আশার বাণী যদি এই সাধনার পথে নাই থাকিত, তবে কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়হারী পতিতপাবন শ্রীগৌরহরির সেই মা ভৈঃ রবে জীবের প্রতি অনন্ত আশ্বাস ঘোষণার সার্থকতা কোথায় ? তাই অতঃপর আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, কেমন করিয়া জীব এই সহজলভ্য, এই স্বভাবতঃ সুদুস্তর সাধনার স্তরসকল, অতিসহজে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া, পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমমহাসম্পদের অধিকারী হইয়া—পূর্ণানন্দসিন্ধুর অতল অমৃতে নিমজ্জিত হইয়া যান।

১। আদৌ শ্রদ্ধা—

শ্রদ্ধাই সাধনভক্তির প্রথম স্তর। প্রেম-লাভে প্রবৃত্তির মূলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। শ্রদ্ধাই প্রবৃত্তির উৎপাদক। প্রবৃত্তি ব্যতীত কেহই কোনও কার্য্যে অগ্রসর হইতেই পারে না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাধনার সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যে অপ্রাকৃত—অচিন্ত্য অজ্ঞাত দেশে, যে অজানা আনন্দ লাভ করিবার জন্য, এই প্রাকৃত জগতের প্রাপ্ত সুখ, ক্ষণভঙ্গুর বা পরিচ্ছিন্ন যাহাই হউক না কেন,—তাহা পরিত্যাগ করিয়া তদভিমুখে যে অগ্রসর হইতে হইবে, সেই সাধনার অনুষ্ঠানের যে প্রবৃত্তি, তাহার মূলে শ্রদ্ধার বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এই শ্রদ্ধার নিবাস বদনে নহে—হৃদয়ে ; কারণ প্রতি হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব শ্রীভগবান্ যেমন যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন, জীব নিজেও সে'রূপ পারে না ; তাই 'জনার্দ্দন' ভাবগ্রাহী নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বাক্যদ্বারা অনেকেই নিজেকে পূর্ণশ্রদ্ধরূপে নিজেকে জনসমাজে পরিচিত করিতে পারিলেও, তাঁহাদের সে শ্রদ্ধার ঘোষণা, বাক্যের অবসানের সঙ্গেই অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। জিহ্বাশ্রয়ী শ্রদ্ধার সাধনজগতে কোনই সার্থকতা নাই। কিন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা সাধকহৃদয়ে যে পরিমাণে সঞ্চারিত হইতে থাকে, হৃদয়কমলের 'শ্রদ্ধা'রূপ প্রথম স্তরের প্রত্যেক দলটি সেই পরিমাণে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাতে সংশয় নাই। বিষয়াসক্ত জীবের মলিন চিত্তদর্পণে এইভাবে ক্রমশ শ্রদ্ধার আবির্ভাব—ইহা শ্রীকৃষ্ণনামের অব্যর্থ ও অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবন্নাম- গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, সাধক যথাক্রমে 'কোমলশ্রদ্ধ', 'মধ্যশ্রদ্ধ' ও 'দৃঢ়-শ্রদ্ধ'রূপে পরিণত হয়েন। পূর্ব্বে মালিন্য-বশতঃ যে হৃদয়, ক্ষণভঙ্গুর—পরিচ্ছিন্ন—জ্বালাময়—বৈষয়িক সুখান্বেষণে বদ্ধ-পরিকর হইয়া, ভবিষ্যতের সেই অজানা আনন্দপ্রবাহে নিমজ্জিত হইবার সাধনাকে উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছে,—অনির্ব্বচনীয় শ্রীকৃষ্ণনামের প্রভাবে সেই অলৌকিক ও অচিন্ত্য বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইবার পর, তখন সেই হৃদয়েই যাহা কিছু প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই যেন আর এক নূতন আকারে—নূতন বর্ণে—নূতন ভাবে অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ 'দৃঢ়শ্রদ্ধ' হইবার পর, জাগতিক যে কোন বিষয়, যতই তুচ্ছ হউক না কেন,—সে সমুদয়ই শ্রদ্ধার 'উদ্দীপক'রূপে সাধকের হৃদয়-কন্দর বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়া দেয়। আলোকরশ্মি একই স্থান হইতে একইভাবে প্রতিফলিত হইলেও, যেমন সেই রশ্মির সংস্পর্শে হীরকখণ্ডই দীপ্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু মৃৎপিণ্ডে সে'রূপ কোনও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ যে কোনও একটি বিষয় বা ঘটনা—যাহা সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ হেয় বা লক্ষ্যের অবিষয়ীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, হয়ত তাহাই আবার পূর্ণশ্রদ্ধ সাধক হৃদয়ে, শ্রদ্ধাযজ্ঞের শেষ আহূতির কার্য করিয়া,—তাঁহাকে অনতিবিলম্বেই সাধুসঙ্গরূপ সাধনার দ্বিতীয় স্তর মিলাইয়া দেয়। এই অন্যের উপেক্ষণীয় সামান্য বিষয় হইতে, পূর্ণশ্রদ্ধ সাধক-হৃদয়ে শ্রদ্ধা-যজ্ঞের শেষ আহুতি প্রদানের দৃষ্টান্ত সাধন-জগতে বিরল নহে। আমরা এই স্থলে এইরূপ দৃষ্টান্তের দুই একটিমাত্র লিপিবদ্ধ করিব।

১। শ্রীবিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির বিষয় কেহই অজ্ঞাত নহেন, চিন্তামণি যখন তৎপ্রতি বিল্বমঙ্গলের প্রবল আসক্তি দেখিয়া বিল্বমঙ্গলকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিয়াছেন, 'আমার ন্যায় অপবিত্র ও ঘৃণ্য রমণীর প্রতি তোমার যে অনুরাগ, সেই অনুরাগের শতাংশের এক অংশও যদি শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিতে, তবে তোমার এক সঙ্গে

চতুর্বর্গের ফল লাভ হইত। যথা,—

এহেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ এক ভাগ।।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
তবে কিনা হইত চতুর্ব্বর্গ সেবা যার।। —ভক্তমাল।

এই অতি সাধারণ কথা, যাহা আমরা কত বক্তৃতাস্থলে কতবার শুনিয়াছি, কত গ্রন্থে কতবার পড়িয়াছি, কিন্তু মৃৎপিণ্ডের উপর আলোকরশ্মির প্রতিফলনের ন্যায় তাহার কোনই সার্থকতা হয় নাই,—আর সেই অতি সামান্য কথাটি সাধকশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে শ্রদ্ধাযজ্ঞের শেষ আহুতির কার্য সম্পন্ন করিয়া—অনতিবিলম্বে তাঁহাকে সাধু সোমগিরির পবিত্র সঙ্গ মিলাইয়া দিয়া—তাঁহাকে সাধনার দ্বিতীয় স্তরে উপনীত করিয়া দিয়াছে।

২। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামিপাদের কথা অনেকেই সুবিদিত। এই ভাগবতশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জীবনের প্রথমাংশ হইতেই সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তাহার ফলে তিনি সেই অলৌকিক অচিন্ত্য বিষয়ে ক্রমশঃ 'দৃঢ়শ্রদ্ধ' হইয়াছিলেন, যে দিবস তিনি গৃহত্যাগ করিয়া, পরমার্থের অনুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পরম গুণবতী সহধর্মিণী একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াই কাল প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবৎ করুণার উপর স্বামিপাদ পূর্ণ বিশ্বাসী থাকিলেও—সেই সদ্যোজাত মাতৃহীন নিরাশ্রয় শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার কাহার উপর দিয়া যাইবেন, এই ভাবিয়া কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে জ্যেষ্ঠী নামক ক্ষুদ্র প্রাণীর একটি ক্ষুদ্র ডিম্ব গৃহের উপর হইতে ভূমিতে পড়িয়াই ভাঙ্গিয়া গেল ও তাহার ভিতর হইতে আসন্নজাত একটি শাবক বাহির হইয়াই সম্মুখস্থ একটি মক্ষিকা ধরিয়া উদরস্থ করিল। এই ঘটনা দর্শন করিবামাত্র স্বামিপাদের এই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে,—যিনি এই সদ্যোজাত ক্ষুদ্র জীবটিকে আহার দিয়া রক্ষা করিলেন, তিনি এই নিরাশ্রয় শিশুকে রক্ষা করিবেন।

সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল।। —ভক্তমাল।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা—ইহা সাধারণের নিকট যতই তুচ্ছ হউক না কেন, 'দৃঢ়শ্রদ্ধ' শ্রীধর স্বামীর হৃদয়ে ইহা ভিন্নাকারে প্রতিভাত হইল ও তাঁহার শ্রদ্ধা- যজ্ঞের শেষ আহুতির কার্য সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া—তাঁহাকে সাধনার দ্বিতীয় স্তরে উপনীত করিল। শিশুকে সেই অবস্থায় রাখিয়া স্বামিপাদ গৃহত্যাগ করিলেন।

সাধকদিগের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে এ'রূপ শতশত দৃষ্টান্ত পাওয়া

যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে কেবল দুই একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, বিল্বমঙ্গলের দৃষ্টান্ত হইতে শ্রদ্ধার সাধনা অর্থাৎ নামকীর্ত্তনের দ্বারা সাধকের কোমল শ্রদ্ধ হইতে দৃঢ়শ্রদ্ধ পর্যন্ত এই যে ক্রমবিকাশ,— বিল্বমঙ্গলের জীবনে আমরা তাহার কোন নিদর্শন পাইতেছি না, বরং চিন্তামণির উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া, বৈরাগ্যোদয়ের পূর্বাবধি তাঁহাকে অসৎ কার্যেই লিপ্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং তাহার জীবনে শ্রদ্ধার সাধনাই যখন দেখা যায় না, তখন চিন্তামণির শ্লেষপূর্ণ উপদেশবাক্যেই যে তাহার শ্রদ্ধাযজ্ঞের শেষ আহুতিরূপে পরিণত হইয়াছিল এ'কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? উত্তরে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, নির্দিষ্ট ক্রমকে অপেক্ষা করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়—আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। শ্রদ্ধা না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গ না হইলে প্রকৃষ্ট ভজনক্রিয়া যাহা—তাহার আরম্ভ হয় না, ইত্যাদি সাধনার স্তরগুলিই যথাক্রমে প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন এ'রূপ মনে না করেন যে 'শ্রদ্ধা' হইতে 'ভাব' পর্যন্ত এই স্তর বা ক্রম কয়টির সাধনায় সকল সাধক এক জন্মেই সুসিদ্ধ হইতে পারিবেন। সাধনার আরম্ভকাল ও আয়ুষ্কাল যখন সকলেরই একপ্রকার নহে, তখন অবশ্যই স্বীকার্য প্রেমের সাধনায় সুসিদ্ধ হওয়া কাহারও একজন্মের এবং কাহারও বা জন্মান্তর সাপেক্ষ। যিনি সাধনপথের যে স্তরের যতটুকু অগ্রসর হইয়া দেহত্যাগ করেন, পরজন্মে ঠিক সেই স্তরেই সেই অংশ হইতে তাঁহার সাধনা পুনরায় আরম্ভ হইয়া থাকে। তাই গীতায় অর্জুনের ঠিক এইরূপ প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ-ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।। (গীতা—৬.৪৩-৪৫)

অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া পৌর্বদেহিক বুদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহার ব্রহ্মলাভ বিষয়া বুদ্ধিতে পুর্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন। যোগভ্রষ্টব্যক্তির কোন অন্তরায়বশতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। তখন তিনি যোগজিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্মফল অপেক্ষা সমধিক ফললাভ করেন।

যোগীর পক্ষে যখন এই পূর্বাভ্যাস বিনষ্ট হয় না, তখন তদপেক্ষা শ্রীভগবানের অধিক প্রিয়—ভক্তের পক্ষেও যে পূর্বসংস্কার বিনষ্ট হইবে না, ইহা কৈমূত-ন্যায়ে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে। তাই শ্রীবিল্বমঙ্গল চরিত্রে তাঁহার সেই জন্মে শ্রদ্ধার কোনও

সাধনা পরিলক্ষিত না হইলেও জানিতে হইবে, সে সাধনা পূর্বজন্মের সঞ্চিত ছিল। পূর্ণচন্দ্র যেমন মেঘজালে আবৃত হইয়া, পুনরায় জ্যোৎস্নালোকে জগৎ উদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ কোনও এক অজ্ঞাত কর্ম্মবিপাকে কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার শ্রদ্ধাকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহার ক্ষয়ে পূর্বসঞ্চিত সেই শ্রদ্ধার উজ্জ্বল আলোক তাঁহার হৃদয় কন্দরে পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ও চন্তামণির 'উদ্দীপন'বাণী তাঁহার শ্রদ্ধাযজ্ঞের শেষ আহুতিরূপে অর্পিত হয়। তাহার পরেই তিনি সাধুসঙ্গরূপ সাধনার দ্বিতীয়স্তরে উপনীত হয়েন,—সোমগিরির সঙ্গলাভই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

২। ততঃ সাধুসঙ্গ—

শ্রদ্ধার অনন্তর সাধুসঙ্গ। পূর্ণশ্রদ্ধ সাধককে ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শ্রীভগবান্ সাধুরূপে সাধকের সহিত সম্মিলিত হয়েন। প্রেমোদয়ের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্‌কে কাহারও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে লাভ করিবার অধিকার নাই, অথচ তদীয় অচিন্ত্য শক্তির সংস্পর্শ ব্যতীত "ভজনক্রিয়া" যে সকল কথা, পূর্ব্বে শ্রবণযুগলে স্পর্শ করিয়াই অনন্ত বিস্মৃতির গর্ভে মিলাইয়া গিয়াছে ; সেই "শোনা কথাই" আজ সাধুসঙ্গের পর, সাধুর সত্যময় হৃদয় হইতে উত্থিত ও জিহ্বা হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র, তাহা যেন "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার মত" একটা কি যেন কি আকুলকরা ভাবের স্পন্দনে সাধকের নীরব হৃদয়-বীণা ঝঙ্কৃত করিয়া দেয়। তখন হইতে সেই ভাগ্যবান্ সাধকের পক্ষে সুকঠিন "ভজনক্রিয়া"সকল যেন সহজসাধ্যের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গের ইহাই পরমাশ্চর্য্য মহিমা।

লৌহ ব্যতীত অপর যে কোনও ধাতু অয়স্কান্তের (চুম্বকের) অতি সন্নিকটে বা সংস্পর্শে থাকিলেও যেমন তাহাকে অয়স্কান্ত বলিয়া বুঝিতে পারে না, সেইরূপ একমাত্র শ্রদ্ধান্বিত সাধকহৃদয় ব্যতীত সাধু, অপর কাহারও নিকট প্রকাশ হয়েন না ;—হইবার সম্ভাবনাও নাই। তাই দেখা যায়, সাধনার প্রথমস্তর—শ্রদ্ধার ভূমিকা অতিক্রম করিবার বহুপূর্ব্বে অনেকেই হয়ত তীর্থাদি স্থলে গমন করিয়া, গৃহে ফিরিবার সময় 'একবার সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া লই'—এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধুর অন্বেষণ করেন ; কিন্তু যে'রূপ সাধু দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তেমন সাধু কোথাও না পাইয়া অবশেষে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, নিরাশার সুরে বলিয়া থাকেন, 'প্রকৃত সাধু আজকাল জগতে সুদুর্ল্লভ' ; কই, তেমন সাধু ত কোথাও দেখিলাম না'—ইত্যাদি। বাস্তবিকই ইহা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এ'রূপস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, জগতে কোনদিনই সাধুর অভাব নাই ; অভাব একমাত্র সেই শ্রদ্ধার,—যাহা ব্যতীত সাধুকে চিনিবার—সাধুকে ধরিবার আর কোনও উপায় নাই ! কেবল লৌহই যেমন অয়স্কান্তকে চিনিতে পারে এবং কেবল অয়স্কান্তই যেমন লৌহকে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বশক্তি সঞ্চারে সক্ষম হয়, সেইরূপ কেবল

শ্রদ্ধান্বিত সাধকই সাধুকে চিনিবার অধিকারী এবং কেবল সাধুই পূর্ণশ্রদ্ধ সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়া, স্বশক্তি সঞ্চার দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃষ্ট ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ।

সাধুসঙ্গের প্রকৃষ্টকাল সমুপস্থিত হইলেই অতি সহজেই "সাধুসঙ্গ" লাভ হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিজ দীক্ষা বা শিক্ষা-গুরু দ্বারা, অথবা কোন সাধু-ভক্তের দ্বারা—সাধুসঙ্গের মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, শ্রীভগবন্নামেরই কৃপায়, যদি কোনও মহানুভব সজ্জনের সঙ্গলাভ ও কৃপালাভ ঘটে, তবে সে'রূপ মহৎসঙ্গে, শ্রদ্ধাযজ্ঞের সহায়তাই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎভাবে ভজনক্রিয়া-সম্বন্ধীয় বিশেষ কোনও উপকার হয় না। এ'রূপ সজ্জন-সাধুসঙ্গকে গৌণ সাধুসঙ্গ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধক পূর্ণশ্রদ্ধ হইবার পর যে 'সাধুসঙ্গ' লাভ করেন, (তাহা পূর্বোক্ত সজ্জনগণের দ্বারাও হইতে পারে) তাহাই প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ,—তাহাই প্রেমধর্ম সাধনের দ্বিতীয়স্তর ;—তাহাই ভজনক্রিয়ানুষ্ঠানের একমাত্র উপায়।

৩। অথ ভজনক্রিয়া—

সাধুসঙ্গের পরবর্ত্তী স্তর 'ভজনক্রিয়া'। সাধুসঙ্গের অব্যর্থ প্রভাবে, সাধক বৈষ্ণবজনোচিত সমুদয় ভজনক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ক্রমে ক্রমে সুসিদ্ধ হইতে থাকেন। চৌষট্টি প্রকার ভজনাঙ্গ বা তাহার প্রধান প্রধান অঙ্গসকলের সাধনায় সাধক আর কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ বোধ করেন না, বরং তাহাতে অধিক আনন্দলাভই করিয়া থাকেন। সাধনার এই তৃতীয় স্তরকে প্রাপ্ত হইলে, তখনই তিনি যথার্থরূপে তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও অপরকে মান দানে সমর্থ হয়েন। এইপ্রকার অশেষ সদ্‌গুণরাশি-বিভূষিত সাধক কর্ত্তৃকই শ্রীহরিনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় হয়েন। তখন হইতে যেন কোন এক দৈবশক্তির প্রভাবে সাধকের শুদ্ধহৃদয় ভেদ করিয়া,—শয়নে স্বপনে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে অবিশ্রান্তভাবে নামের প্রস্রবণ ছুটিতে থাকে ; কি করিতেছেন না করিতেছেন, তিনি তখন যেন বুঝিয়াও ভালরূপে বুঝিতে পারেন না। প্রজ্জ্বলিত অনলশিখা যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করিতে থাকে, সেইরূপ নামের প্রবল বাতাসে প্রজ্জ্বলিত ভজনাঙ্গরূপ প্রচন্ড অনলে ভীষণ 'অনর্থ' সমুদয় ভস্মীভূত হইতে থাকে। সাধনার তৃতীয় স্তরের বিষয় ইহাই সংক্ষেপে বলা হইল। অতঃপর 'অনর্থনিবৃত্তি' নামক চতুর্থ স্তরের কথা উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

৪। ততঃ অনর্থনিবৃত্তি—

অনর্থনিবৃত্তি—সাধনার চতুর্থ স্তরেই ভজনক্রিয়ার ফলস্বরূপ এই অনর্থ নিবৃত্তির ভূমিকায় সাধক যখন সমুপস্থিত হয়েন, তখন তাহার অবিদ্যাস্বরূপ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়। পরাবিদ্যার সিদ্ধালোকে তাহার হৃদয়কন্দর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কোন অন্ধ ব্যক্তি মাল্যভ্রমে কণ্ঠে সর্প ধারণ করিবার পর, যদি কোন দৈবশক্তি বলে

পুনরায় দৃষ্টিলাভ করে ও তাহার ভ্রম বুঝিবামাত্র ত্রস্ত হইয়া তৎপ্রতিকারে যে'রূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে—সাধনার এই চতুর্থস্তরে সমুপস্থিত সাধক—অনর্থ নিবৃত্তির জন্য ঠিক সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পূর্বে অবিদ্যাবশতঃ ধন, জন, দারাসুত, প্রতিষ্ঠা ও বৈভবাদির যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে যে একটা বিষয় বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা ছিল,—আজ শ্রীভগবন্নাম ও তাঁহারই ফলস্বরূপ ভজনক্রিয়ার যথার্থ শক্তি বলে—পরাবিদ্যারূপ অভ্রান্ত দৃষ্টিলাভ করিয়া,—সে সমস্ত বিষয়ই এককথায়—অনর্থরূপে সাধকের নির্মল চিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ; সুতরাং 'অনর্থ' যাহা, তাহার জন্য আর বিন্দুমাত্রও আসক্তি বা আকাঙ্খা থাকে না। অন্ধ—নয়নলাভ করিয়া কণ্ঠস্থিত সর্পকে পরিত্যাগ করিতে যে'রূপ ব্যাকুল হয়, সাধক ঠিক সেই ভাবেই প্রাকৃত সুখ—প্রাকৃত ভোগবিলাসাদির উপকরণ সমূহকে ভয়াবহ ও ভীষণ অনর্থরূপে দর্শন করেন। কেবল তাহাই নহে—এই অনর্থ নিবৃত্তির ভূমিকায় সমাগত হইয়া, অচিন্ত্যশক্তি ভগন্নামের পরমাশ্চর্য শক্তিবলে সাধকের সমুদয় সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্মরাশি ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বর্ত্তমানস্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ।।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১-৩৩৯) ধৃত লঘুভাগবতে]

অর্থাৎ যে পাপ বর্তমান, যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও যাহা অনুষ্ঠিত হইবে, শ্রীভগবানের নামরূপ অনলস্পর্শে সে সকল ভস্মীভূত হইয়া যায় ;—এই যে শাস্ত্রবাক্য, ইহা অনর্থনিবৃত্তি স্তরকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এই অবস্থায় সাধক দগ্ধরজ্জুর ন্যায় জীবন্মুক্তভাবে অবশিষ্ট সাধনাংশের সমাপন জন্যই প্রাকৃত জগতে অবস্থান করিতে থাকেন। দুর্ভেদ্য মায়ার বন্ধন নিজ সামর্থ্যে ছেদন করা কোন জীবের পক্ষে কোনও কালে সম্ভব নহে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামের প্রভাবেই সাধক এইরূপে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাই শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীতা—৭.১৪)

অর্থাৎ অত্যদ্ভুত ত্রিগুণময়ী, অত্যন্ত দুস্তরা আমার এক মায়াশক্তি আছে, যাহারা একমাত্র আমার আশ্রয় গ্রহণ করে,—এই মায়া নিতান্ত দুস্তরা হইলেও আমারই অনুগ্রহে তাহারা তাহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

অচিন্ত্যশক্তি, পরমাশ্চর্য শ্রীভগবন্নাম প্রভাবে কেমন করিয়া সাধকগণ 'শ্রদ্ধা'রূপ সাধনার প্রথম স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে 'অনর্থনিবৃত্তি' নামক চতুর্থস্তরে উপনীত হয়েন,

সে সংবাদ আমরা সংক্ষেপে বিদিত হইলাম। অতঃপর অভিধেয় সাধনভক্তির অবশিষ্ট স্তর চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইতেছে।

৫। ততো নিষ্ঠা—

শ্রীভগবদ্ পাদপদ্ম ও তদীয় সম্বন্ধ মাত্রেই নিষ্ঠা,—সাধনার পঞ্চম স্তর। নিরপরাধব্যক্তি, অব্যর্থ কৃষ্ণনামের অচিন্ত্য প্রভাবে, সাধক 'নিষ্ঠার' ভূমিকায় উপনীত হয়েন। মানবচিত্ত কোনও একটি বিষয়কে অবলম্বন না করিয়া অবস্থান করিতে ক্ষণকালের নিমিত্তও সক্ষম নহে। পূর্ব্বে প্রাকৃত বিষয়ে নশ্বর ভোগ-বিলাসাদির উপকরণে যে চিত্তবৃত্তি পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট ছিল, নামের প্রভাবে তাহার যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি হওয়ায় (অর্থাৎ অনর্থরূপে তাহা প্রতিভাত হওয়ায়) চিত্তবৃত্তি তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইয়া থাকে। নিরবলম্বন অবস্থায় মানবচিত্ত কখনই অবস্থান করিতে সমর্থ নহে বলিয়াই অপর আশ্রয়ের অভাবে, অপ্রাকৃত যাহা,—সেই শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম ও তদীয় সম্বন্ধমাত্রকেই নিজ আশ্রয়স্থানরূপে নির্বাচন করিয়া লয়। তখন সাধকের মনোবৃত্তি কেবল একমাত্র সেই ভূমানন্দময়,—সেই নিখিল আনন্দের একমাত্র নিলয়, শ্রীভগবানের কোটিচন্দ্র সুশীতল চরণ ছায়ায়, তদীয় সেবক ও ভক্তগণের সুপবিত্র সঙ্গে, তাঁহার মধুরাদপি মধুর নাম ও গুণলীলাদি স্মরণে, তাঁহার অভিন্নাত্মা শ্রীবিগ্রহাদির বসতিস্থলে ও তদীয় সম্বন্ধবিশিষ্ট নিখিল বিষয়েই সম্পূর্ণ আকৃষ্ট বা নিষ্ঠিত-চিত্ত হইয়া থাকে। অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জমান কোনও ব্যক্তি, ভাগ্যক্রমে একখানি কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহা অমূল্যসম্পদের ন্যায় বুক দিয়া গ্রহণ করে, সেইরূপ ভীষণ সংসার জলধিবক্ষে ভাসমান—নিরাশ্রয় ও অবসন্ন সাধক, পরিত্রাণের আশায়, শ্রীহরির সর্ব্বাভিষ্টপ্রদ মঙ্গলময় নাম ও তাঁহার চরণতরীকে জীবনোপায় মনে করিয়া—সমগ্র মন, প্রাণ, হৃদয় দিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরেন ; আর চতুর্দিকে দেখেন, প্রাকৃত নিখিল বিষয়ই যেন "পাপ-পয়োনিধি"র ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তাই দেখিতে পাই, ঠিক এই স্তরে উপনীত হইয়া, ভবভয়াতুর সাধক কাতরস্বরে গাহিতেছেন—

"এ হরি ! বান্ধো তুয়াপদ-নায়।
তুয়াপদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়।"

সাধকগণের সাধনাবস্থায় এইরূপ কাতরোক্তিসকল, সমুদয় প্রাকৃত বস্তুকে অনর্থরূপে উপলব্ধি ও শ্রীভগবৎ সম্বন্ধমাত্রেই 'নিষ্ঠার' সমুজ্জ্বল প্রমাণ। সাধক হৃদয়ের সুগভীর অন্তঃস্থল হইতে—পরিত্রাণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের প্রতি এই যে কাতরোক্তি, ইহা যেমন অকৃত্রিম, তেমনি অব্যর্থ ! এই পরিত্রাণের আহ্বান—এই আর্তস্বর শুনিবার

জন্য, পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ সর্ব্বক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন ! যে মুহূর্ত্তে এইরূপ অকৃত্রিম কাতরধ্বনি—এইরূপ আবেগ-বিজড়িত আর্ত্তি তাঁহার শ্রবণে বাজিয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেই ভাগ্যবান্ জীব, সকল ভয়ের অতীত হইয়া, সেই আশ্রিতবৎসলের যথার্থ আশ্রিতরূপে, সেই শরণাগত প্রতিপালকের যথার্থ শরণাগতরূপে গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। ভক্ত ও ভগবানের এই প্রকার মধুর সম্পর্কে পরস্পর বন্ধন,—তাহার স্থান এইখানে,—সাধনার এই পঞ্চম স্তর হইতে। কোকিলের পঞ্চম তান যেমন সুমধুর, সেই রূপ এই প্রেম-ধর্ম্ম সাধনের পঞ্চম স্তর হইতে পঞ্চমের মধুর ঝঙ্কার উঠিয়া,—ক্রমে ক্রমে মধুরতর ও মধুরতমে পর্য্যবসান হইয়া গিয়াছে। তাই এই সাধনার স্তরে দেখিতে পাই, একদিকে ভব-ভয়াকুল সাধকের সকরুণ আর্ত্তি, আর অপরদিকে জলদগম্ভীরস্বরে ভবভয়হারীর সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আশ্বাস-বাণী—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১-৬৫৩) ধৃত রামায়ণে শ্রীরঘুনাথেন বিভীষণগমন-প্রসঙ্গ]

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি আমার শরণাপন্ন হইয়া "তোমারই আমি" বলিয়া কেবল একবার মাত্রও প্রার্থনা করে, আমি নিরন্তর তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।

৬। রুচিস্তরঃ—

রুচিই সাধনভক্তির ষষ্ঠ স্তর। নামের অচিন্ত্য প্রভাবে, সাধক হৃদয়ে সমুদয় প্রাকৃত বস্তু 'অনর্থ'রূপে প্রতিভাত হওয়ায়, অপর আশ্রয়ের অভাববশতঃই চিত্তবৃত্তি শ্রীভগবদ্বিষয়ে নিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তাঁহার অনন্ত মাধুর্য ও সৌন্দর্যের উপলব্ধি হয় নাই। প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভের প্রীতি-নিমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হইয়া, মধুকর যখন তদুপরি উপবেশন করে, ঠিক সেই অবস্থায় কুসুমের প্রতি তাহার নিষ্ঠা ব্যতীত তদধিক আর কিছু দেখা যায় না ; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে যখন মধুকর কুসুমের মকরন্দ আস্বাদ করে, তখন যেমন তাহার সেই নিষ্ঠা বিবর্দ্ধিত হইয়া রুচির আকার ধারণ করে, সেইরূপ 'নিষ্ঠা'স্তরে উপনীত হইয়া, সাধক কিঞ্চিৎপূর্ব্বে যাহাকে কেবল ভয়-ভাবনা-উদ্বেগ-রহিত বিমল শান্তিময় আশ্রয়রূপে বোধ করিয়াছিলেন, সাধনার ষষ্ঠস্তরে উপনীত হইয়া, তখন অনুভব করেন, "এ ত' শুধু আশ্রয়স্থল নহে,—এ যে অমৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার ! এমন মিষ্টতা পূর্ব্বে কখনও কোনও বিষয়ে আস্বাদন করিয়াছি এমন ত মনে হয় না। আস্বাদন তো দূরের কথা—এ'রূপ অনুপম মাধুর্যের সংবাদ কখনও অবগত ছিলাম না। হায় ! তোমার অনির্বচনীয় করুণার কথা আর কি বলিব ! তুমি অমরগণেরও সুদুর্লভ অমৃত, আজ আমার ন্যায় জীবাধমকেও প্রদান করিলে !" রুচিস্তরারূঢ় সাধক এইরূপ অনুভব

করিতে করিতে ভজন-সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ের মিষ্টতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন।

৭। অথাসক্তিঃ—

রুচির অনন্তর আসক্তি। ইহাই সাধনভক্তির সপ্তম স্তর। সুতীব্র সুরা বারবার আস্বাদন করিতে করিতে লোকে যেমন উন্মত্ত হইয়া যায় ও তখন যেমন তাহার ভয়, ভাবনা, লজ্জা, মান, অপমান, জীবনমরণ, কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না,—সেইরূপ 'রুচিগ্রস্থ' সাধক, কিছুকাল নিজ অভীষ্ট বস্তুর মধুরতা আস্বাদন করিতে করিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। এই অবস্থাকে 'আসক্তি' নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আসক্তি সমন্বিত ভক্ত অবিশ্রান্ত শ্রীভগবন্নাম-লীলাদির মধুরতা আস্বাদন করিতে করিতে 'নামী'কে পাইবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে,—কোন অবস্থাতেই তিনি যেন তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। চিত্ত-চোরের দর্শনপ্রাপ্তিরূপ চিন্তানলে তাঁহাকে যেন অহরহ পরিদগ্ধ করিতে থাকে। তিনি দিশাহারা—পাগলপারা হইয়া কখন হাস্য করেন, কখন বা তাঁহার সকরুণ ক্রন্দন শ্রবণে যেন স্থাবরজঙ্গমকেও আকুল করিয়া দেয়। তাঁহার উদ্বেগ, অশ্রু, বিষাদ ও দৈন্য দর্শনে কঠিন-পাষাণও যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিনয়ে নত হইয়া তিনি যেন ধুলিকণারও পদধুলি গ্রহণ করিতে লুটাইয়া পড়েন। কোন সাধু, ভক্ত-মহাজনের সন্দর্শন লাভ করিলে, সেই 'মনচোরের' সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য তদীয় চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, কাতরকণ্ঠে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কোথাও কোন বালককে দেখিতে পাইলে সেই ব্রজের রাখাল বা সনকাদি মুনি স্মরণপূর্ব্বক তাহার চরণে প্রণাম করিয়া 'আমি কি সেই ব্রজরাজ-নন্দনকে পাইব ?' এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করেন। কখন বা নির্জ্জন বনভূমে প্রবেশ করিয়া, একাকী কোনও তরুমূলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় করোপরি গণ্ডস্থল বিন্যস্ত করিয়া, পরিম্লান মুখে ঘোরতর চিন্তা করিতে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকেন ; পরিজনগণ তাঁহার এইপ্রকার আকস্মিক মনোবিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন,—কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারেন না। ফলতঃ এই যে প্রাণ-মনহরা আকুলকরা ভাব,—ইহা একমাত্র সেই ভগবদাসক্তির প্রবল আবর্ত্তে নিপতিত ভক্ত যিনি, তিনি ছাড়া অপর কাহারও বুঝিবার বা বুঝাইবার প্রয়াস সম্পূর্ণ অনর্থক। ইহা 'মুকাস্বাদনবৎ',—কেবল অনুভব-গ্রাহ্য মাত্র। তখন সেই অসীম ভাগ্যবান্ সাধক-ভক্তের অহর্নিশ কেবল—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে রহু ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে।।"

(পদাবলী—জ্ঞানদাস)

এই ভগবদাসক্তির উদয়ে কি যেন কি এক মহা আকর্ষণে সাধককে আকুল করিতে থাকে ; তাঁহার দেহ-গেহ-কুলাদি সকলই যেন ভাসাইয়া দেয়।

৮। ততো ভাবঃ —

আসক্তির পরিণতিই "ভাব" বা "রতি" নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন সিদ্ধভক্ত প্রধানতঃ ত্রিবিধ।

১। মূর্চ্ছিত কষায়—অর্থাৎ, যাঁহাদের অন্তরে বিষয় বাসনার কিঞ্চিৎ আভাস থাকিলেও উহা একান্ত মূর্ছিতের ন্যায় বিদ্যমান থাকায় উহার কোন ক্রিয়াশীলতা নাই।

২। বিধৌত কষায়—অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইয়াছে।

৩। প্রাপ্ত ভগবৎ-পার্ষদদেহ—অর্থাৎ যাঁহারা যথাবস্থিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবল্লোকে চিন্ময় দেহে ভগবৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে ভজনক্রিয়ার ফলে অনর্থ-নিবৃত্তির ক্রিয়া সাধক ভক্তের চতুর্থস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবের বা রতির স্তর পর্যন্ত চলিতে থাকে অতি সূক্ষ্মভাবে—যে পর্যন্ত না ভক্ত ভজন-সিঁদ্ধিতে সকল বাধা বিঘ্নের অতীত হইয়া—সিদ্ধভক্তরূপে পরিণত হয়েন। জীব-হৃদয়ে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়কাল হইতেই সেই ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী বা ভক্ত বলা যায়—যে ভক্তত্ব শ্রদ্ধার ["শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২২.৩৮)] তারতম্যে কনিষ্ঠ হইতে উত্তম ভক্তে উন্নীত হইয়া থাকে, অনর্থ-নিবৃত্তির ফলে স্তরের পর স্তর অতিক্রমণের মধ্য দিয়ে। এই মহা উত্তরণের পথে সাধক-ভক্তকে একান্তভাবে নিরপরাধে নামাশ্রয়পূর্বক অতি সাবধানে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। কারণ অনবধানেও নামাপরাধের ফলে ভক্তেরও নরকপাত শ্রুত হয়। যথা,—"নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্‌ভক্তিমতোঽপি অধঃপাত লক্ষণ-ভোগনিয়মাচ্চ"—(ক্রমসন্দর্ভ—২.১.১১)।

সাধন ভক্তিলতার "ভাবই" প্রস্ফুটিত কুসুম। এই "ভাব" পুষ্প হইতে "প্রেম"রূপ সুমধুর অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুসুম প্রস্ফুটিত হইলে, তাহার স্নিগ্ধ সুবাস যেমন বহুদূরস্থিত মধুব্রতকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হয়,—সাধক হৃদয়ে "ভাব" পুষ্প ফুটিয়া উঠিলে, তাহার সুবাসে আকৃষ্ট হইয়া, দেব-মুনীন্দ্র-গুহ্য শ্রীভগবান্ মকরন্দ-লোলুপ মধুব্রতের ন্যায় সাধক ভক্তের সমক্ষে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশির একমাত্র নিলয়-স্বরূপ স্বকীয় তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভাবোদয়ের এই প্রকাশ প্রেমোদয়ের সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় সাধকের নিকট সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হন না ; সুতরাং সাধকের প্রত্যেক দর্শনের মধ্যে একটা "যেন" ভাবের যবনিকা ব্যবধান ঘটাইয়া রাখে। তখন তাঁহার নয়নযুগল যেন সর্ব্বদাই সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের শ্যামলিমা,

তদীয় অধর ও নেত্রান্তাদির অরুণিমা, কোটি লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান স্বরূপ তদীয় বদনস্মিত চন্দ্রিকার ধবলিমা ও তদীয় বসনাভরণাদির পীতিমা প্রভৃতি দর্শন করিয়া, অজস্র অশ্রুধারায় আত্মাকে অভিষিক্ত করিতে থাকেন। কখন বা সেই ভক্ত, শ্রীভগবানের দূরাগত মধুরাদপি মধুর মুরলীর গান শ্রবণ করেন ; কখন যেন তদীয় নূপুরাদির শিঞ্জন তাঁহার কর্ণে বাজিয়া উঠে ; কখন যেন হংস-সারস-ধ্বনি-বিনিন্দিত তদীয় কণ্ঠের মধুরধ্বনি শুনিতে পান ; আবার কখনও বা যেন মনে হয়, চরণে চরণ রাখিয়া, ত্রিভঙ্গিমঠামে সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ হরি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ধীর পবন-বেল্লিত নবপল্লবের ন্যায় ঈষৎ বঙ্কিম শিখিপাখা তাঁহার মোহন চূড়ায় দুলিতেছে ; সুচারু অলকাবলিত ললিতাননে হাসির মৃদুরেখা লাগিয়া রহিয়াছে ; তদীয় শ্রীঅঙ্গের মণি-রত্নাদির প্রভায় দশদিকে যেন কি এক অপ্রাকৃত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে ; নব প্রস্ফুটিত মালতীর মোহন-মালা অলিকুল কর্ত্তৃক চুম্বিত হইয়া তদীয় গলদেশে মৃদুমন্দ দুলিতেছে। আবার সেই ভক্ত, সময়ে সময়ে যেন তদীয় সুশীতল কর-কিশলয়ের স্পর্শলাভ করিয়া ও অঙ্গসৌরভের মধুর হিল্লোলে আকুল হইয়া, বিপুল পুলক-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। সাধক ভক্ত এই সমস্ত মাধুর্য্যাস্বাদ-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া, যেমন অতল আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যান, তেমনি আবার উহার বিচ্ছেদ ঘটিলে নিরতিশয় বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২।৮।২৭২)

এই যে পবিত্র উক্তি,—ইহার প্রারম্ভ এই স্তর হইতেই।

ভাবের এই অনন্ত মাধুর্য-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে সাধকভক্তকে এ'রূপ উদ্বেলিত করিয়া দেয় যে, তৎকালে তাঁহার আত্মা যেন সেই জড়দেহকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার অপ্রাকৃত ভাবময় দেহকেই সর্ব্বদা অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহেন। এই অবস্থায় দেহ-গেহাদির প্রতি তাঁহার কোন মমতা দৃষ্ট হয় না ; বরং তৎকালে বান্ধবগণ—সলিলশূন্য অন্ধকূপের ন্যায়, ভবন—কন্টকাকীর্ণ বনের ন্যায়, আহার—প্রহারের ন্যায়, প্রশংসা—সর্পদংশনের ন্যায়, সুহৃদগণের সান্ত্বনা—যাতনার ন্যায়, কৃত্যকর্ত্তব্য—মর্ত্তব্যের ন্যায়, জাগরণ—অনুতাপ সাগরের ন্যায়, নিদ্রা—প্রখর রৌদ্রের ন্যায় ও প্রাণ—প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তাঁহার মন তখন একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তচ্চরণ চিন্তনই কেবলমাত্র ভববন্ধন ছেদনের প্রকৃষ্ট উপায়রূপে তাঁহার নিকট উপলব্ধি হইতে থাকে। এতাদৃশ সাধক-ভক্ত জন্ম-সম্বন্ধে চণ্ডাল হইলেও তিনি তৎকালে ব্রহ্মাদিরও প্রণম্য হয়েন। জ্ঞানী-যোগিগণ-বাঞ্ছিত,—আত্মারামগণ-নিষেবিত,—সেই রসরাজ শ্রীভগবানের ভক্তি-

পীযুষধারায় যিনি অহরহ পরিস্নাত হইতেছেন, তাঁহার আসন কোন স্থানে—প্রাকৃত লেখনী তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ।

এই "ভাবের" সাধক, কিছুদিন সাধনা করিতে করিতে অব্যর্থ শ্রীকৃষ্ণনামের অবিচিন্ত্য মহিমায় 'সাধন-ভক্তির' শেষ-সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক, 'সাধ্যভক্তি' লাভ করিয়া "সিদ্ধ-ভক্ত" নামে অভিহিত হয়েন। ভাবোদয়ের কিছু পরেই—

৯। "ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি"—

যাহা পরম প্রয়োজন,—যাহা পরম পুরুষার্থ, "অবাঙ্মনসো-গোচর" কে নয়নগোচর করাইবার একমাত্র উপকরণ, সেই প্রেমের অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে। প্রেম-মহাসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গমালার গম্ভীর নির্ঘোষ—শাস্ত্র যাহা বর্ণন করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আপাততঃ তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা না থাকায়,—আমরা উপস্থিত তদ্বিষয়ে নিরস্ত রহিলাম। তবে এখানে এইমাত্র উল্লেখ করিবার প্রয়োজন যে মহাভাগ্যবান্ "সিদ্ধভক্ত"—প্রেম-মহাসম্পদের অধিকারী হইবার পর, আর অধিক দিন তাঁহার পাঞ্চভৌতিক সাধন-দেহ-ভার বহন করিতে পারেন না। তৈলপায়িকা যেমন নবীন দেহ লাভ করিয়া, প্রাচীন জীর্ণ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আসে ; সেইরূপ তিনি, শ্রীভগবৎসেবোপযোগী অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া, পিঞ্জরা-বদ্ধ বিহঙ্গম যেমন মুক্ত হইয়া মলয়ানিল-সেবিত সুশীতল শান্তিময় গহন কুঞ্জাভিমুখে উধাও হইয়া উড়িয়া যায়,—সেইরূপ তিনিও নিজ প্রাণবল্লভের চরণ-সরোজ-গন্ধ-নিষেবিত—চিরসুন্দর—চিরনবীন—চিরশান্তিময় "নিজ ঘরে" মহা-প্রস্থান করেন। তাঁহাকে আর কোন দিন ফিরিয়া আসিতে হয় না ;—"ভব-মহাদাবাগ্নির" প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখার উত্তাপ, আর কোনও কালে তাঁহার প্রেমময় অঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই প্রেম-মহাপারাবারের স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গ-বৈচিত্রও "তটস্থ হইয়া বিচারিলে" তাঁহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য বা মাধুর্য্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও *প্রেমের অভ্যুদয়ই জীবের পূর্ণ অভিব্যক্তি*। পূর্ণতর ও পূর্ণতম অভিব্যক্তির সংবাদ আরও ঊর্দ্ধে নিহিত থাকিলেও, পূর্ণ পিপাসিত জীবের—পূর্ণামৃতের অধিকার,—তাহার সীমা এখানেই—এই প্রেমের অভ্যুদয়েই।

সাধক-ভক্তগণ ভাবোদয়ের সময় হইতেই শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবের যে কোনও একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধন করিতে থাকেন ; পরে প্রেমোদয়ে সেই ভাব-পঞ্চক সিদ্ধভক্তের নিকট 'রস' রূপে পরিণত হইয়া, তাঁহাকে নিজ ভাবানুরূপ সেই সেই রসার্ণবে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন। এই পঞ্চভাবোত্থিত পঞ্চরস, আবার 'রাগানুগা' ও 'বৈধী' ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকেন।

পূর্ণতম আনন্দের উৎস যাহা, তাহা একমাত্র রাগমার্গাশ্রিত পথিকেরই লভ্য

বলিয়া, ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈধভক্ত্যুত্থ প্রেম, মাধুর্য্যপ্রধান রাগভক্ত্যুত্থ প্রেমাপেক্ষা শ্রীভগবানের নিকট কিঞ্চিৎ ন্যূনতার চক্ষেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় গ্রন্থান্তরে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে।[১]

উপস্থিত বক্তব্য এই যে, সাধক-ভক্ত সাধনাবস্থায় তাঁহার হৃদয়কে যে ভাবে ভাবিত করিয়া সাধনা করেন, সিদ্ধাবস্থায়—নিজ বাঞ্ছিত দাস্যাদি যে কোনও ভাবে শ্রীভগবানের সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।। (গীতা।৮।৬)

অর্থাৎ,—হে কৌন্তেয় ! যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তিম সময়ে যে ভাব স্মরণ করিয়া শরীর পরিত্যাগ করে, মৃত্যুর পর সে সেই ভাবানুরূপ দেহাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সংসারাবদ্ধ জীব প্রাকৃত বিষয়েই আজীবন নিবিষ্টচিত্ত থাকে ; সুতরাং দেহত্যাগ সময়ে প্রাকৃত ভাবই চিত্তে উদিত হয় ; এই কারণে বারংবার জরা-মরণাক্লিষ্ট সংসারীভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রেমের সাধনার যিনি সাধক, 'অনর্থনিবৃত্তি' নামক স্তরে উপনীত হইবার পরই পাঞ্চভৌতিক—মায়াময় কোনও বিষয়ে আর তাঁহার চিত্তবৃত্তি লিপ্ত থাকে না। যাহা কিছু নিষ্ঠা—যাহা কিছু আসক্তি—সমস্তই শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে ও তদীয় অপ্রাকৃত বিষয়সমূহে বিজড়িত হইয়া যায় ; সুতরাং সেই সাধক ভক্ত দেহত্যাগ করিবার সময় যাহা কিছু স্মরণ করেন,—তদীয় নির্ম্মল চিত্তদর্পণে যাহা কিছু প্রতিবিম্বিত হয়, সে সমুদয়ই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিষয় ! এই হেতু তাঁহার সাধনদেহ পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনোপযোগী ও স্বীয় ভাবানুরূপ অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে অসম্ভাবনার অণুমাত্রও কারণ নাই।

অতঃপর বক্তব্য এই যে অভিধেয় বা সাধনভক্তির যে ক্রমটি এ'পর্যন্ত প্রদর্শিত হইল, সেই ক্রম বা স্তরাষ্টক, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্ম্মের সাধনা নহে—একমাত্র শ্রীভগবন্নামই এই ধর্ম্মের মুখ্য সাধনা। মুখ্য সাধনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন মানবীয় শক্তি, 'শ্রদ্ধা' হইতে ভাবের পুর্ণ পরিণতি পর্যন্ত—সাধনার এই অষ্ট সোপানাবলী অতিক্রম করিতে স্বসামর্থ্যে কোনও কালে সক্ষম নহে।

সুতরাং উক্ত স্তরাষ্টক,—উহা সাধনা নহে, সাধকের লক্ষণমাত্র। এই সাধকলক্ষণগুলিকে সাধনা মনে করিয়া, যদি আমরা জ্ঞান ও যোগমার্গের কঠোরতাময় সাধনার সহিত ইহার তুলনা করিতে যাই, তবে যে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আমাদের এই ভ্রান্তির জন্য, এই সরল-সুন্দর-সার্বজনীন ধর্ম্মের সাধনপথেও কঠোরতার কঠিন

১। গ্রন্থকার শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীরাগভক্তিরহস্য দীপিকা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পাষাণস্তূপের অবস্থিতি সন্দর্শন করিব, তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি হইতে পারে ? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সাধনপথ কঠোরতাময় নহে। শ্রীভগবন্নামই এই ধর্মের একমাত্র মূল মহামন্ত্র ও সাধনা—একাধারে দুইই, 'নামী' হইতে অভিন্নাত্মা, অপ্রাকৃত অচিন্ত্য ও অব্যর্থ কৃষ্ণনামের অসীম প্রভাবেই সুদুর্লভ সাধকলক্ষণসকল সাধক হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

নামাপরাধ-বিনির্মুক্ত সাধকে শ্রীকৃষ্ণনাম (উপাদান কারণ) হইতেই সাধু দ্বারে (নিমিত্ত কারণ) (নির্গুণা) শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণনামেরই অচিন্ত্য কৃপাতে শ্রদ্ধা হইতেই সাধুসঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণনাম ও সাধুসঙ্গ হইতেই ভজনক্রিয়া।
শ্রীকৃষ্ণনাম ও ভজনক্রিয়া হইতেই অনর্থ নিবৃত্তি।
শ্রীকৃষ্ণনাম ও অনর্থ নিবৃত্তি হইতেই নিষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণনাম ও নিষ্ঠা হইতেই রুচি।
শ্রীকৃষ্ণনাম ও রুচি হইতেই আসক্তি।
শ্রীকৃষ্ণনাম ও আসক্তি হইতেই ভাব বা রতি।

শ্রীকৃষ্ণনাম ও ভাব হইতেই—যাহা পঞ্চম পুরুষার্থ—জীবের সকল কামনা-বাসনা, আশা আকাঙ্খার শেষ নিবৃত্তিস্থল—কল্পনাতীত আনন্দের অসীম সীমা অতিক্রম করিয়া যে আনন্দ মহাপারাবারের উত্তাল তরঙ্গ নিত্য নব নব ভাবে উদ্ভাসিত,—সেই প্রেমামৃত সিন্ধুর অতল অমৃতে সিদ্ধভক্তকে অনন্তকালের জন্য নিমজ্জিত করিয়া রাখে। সেই প্রেম প্রাদুর্ভাবের ইহাই শাস্ত্রবর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্রম বা স্তর—"সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।" (শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু—১।৪।১৫-১৬)

এই পর্যন্ত আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র শ্রীভগবন্নামই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্মের মুখ্য সাধন মন্ত্র। শ্রদ্ধা হইতে ভাব বা রতি পর্যন্ত এই আটটি স্তর—ইহারা নামের অনুষঙ্গ ফলমাত্র ও শ্রীকৃষ্ণনামের অচিন্ত শক্তিতেই সাধক হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত ; সুতরাং ইহা কখনও সাধনা হইতে পারে না,—ইহাও সাধক-লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইহেতু যাহা সাধক-লক্ষণ, তাহাকেই সাধনা মনে করিয়া যদি আমরা সেই সুমহান্ প্রেমাবতারী প্রবর্তিত—এই প্রেমধর্মের পথে, অপরাপর সাধন-পথের ন্যায় কঠোরতার আবিষ্কার করি, তবে যে তাহা, এই সার্বজনীন সহজলভ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ—সমুজ্জ্বল ধর্মের প্রতি আমাদের ঘোর অবিচার—সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই।

সাধনার কঠোরতাই যে সাধন-পথে প্রবেশ লাভ করিবার প্রধান অন্তরায়, এ'কথা আমরা জানি এবং জ্ঞান ও যোগমার্গের সাধনার সহিত তুলনা করিয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-প্রবর্তিত এই ভক্তিপথের সুবিশাল প্রবেশদ্বার যে সকলের নিকট সর্বদাই উন্মুক্ত এবং এই সাধনপথ অতি সরল ও সুগম—এ'কথা প্রতিপন্ন করা সহজ।[1] কিন্তু জ্ঞান ও যোগমার্গের সহিত তুলনা করা হইলেও, উপস্থিত প্রথমতঃ, অপর যে কোনও সম্প্রদায় প্রবর্তিত ভক্তিমার্গ হইতেও এই সুমহান্ ভক্তিপথের সুগমতা প্রতিপাদন করিয়া,—অতঃপর আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্মের অপরাপর সমুজ্জল বৈশিষ্ট্যের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া, সকল ভক্তি-পথানুগামী ভক্তকেই অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই নবধা ভক্তির একটি বা একাধিক অথবা সকলগুলি অঙ্গকেই আশ্রয় করিয়া ভক্তগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়াছেন,—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদবভদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মী পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্।। (পদ্যাবলী-৫৩)

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের নাম ও গুণলীলাদি শ্রবণ করিয়া, শুকদেব তদীয় নাম ও গুণলীলাদি কীর্তন করিয়া, ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ তদীয় অভয় চরণযুগ স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মীদেবী তদীয় রক্তোৎপল-বিনিন্দিত চরণকমলের ভজনা করিয়া, পৃথু তাহার অর্চন করিয়া, অক্রুর তাহার বন্দনা করিয়া, কপিপতি হনুমান তদীয় দাস্যের দ্বারা, অর্জুন তদীয় সখ্যে এবং বলিরাজা সর্বস্ব—পরিশেষে আত্মাকে পর্যন্ত তদীয় পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুতরাং ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, এই নবধা সাধন ভক্তির যে কোন একটি অঙ্গ অথবা বহু অঙ্গই হউক, কেবলমাত্র এই নবধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভক্তিপন্থার পথিকগণ সফল মনোরথ হইতে পারেন, এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ।।
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২২.১৩০)

এখন যদি আমরা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিব, উক্ত নববিধ সাধনার প্রত্যেক অঙ্গের সাধক ভক্তগণের ভক্তিলাভ পক্ষে

১। গ্রন্থকারকৃত 'বৈজয়ন্তী প্রবন্ধাবলী' ধৃত 'আশার আলোক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অব্যর্থ হইলেও একমাত্র নামাশ্রয় ব্যতীত,—অপর আটটি সাধনার অনুষ্ঠান, ক্ষণসুখ-লোলুপ, সংসারবদ্ধ, সাধনার কঠোরতার ভয়ে ভীত কলিহত জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সুতরাং একই আসনস্থিত এই 'নবধাভক্তি'র মধ্য হইতে, শ্রীভগবন্নাম ও নামকীর্তনের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করাইয়া, তাহাকে সাধনভক্তির সর্বোচ্চ সিংহাসনোপরি সংস্থাপনা—অপরাপর ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্তিত ধর্ম হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই দেখিতে পাই, এই সুমহান্ প্রেমধর্মে সুবিরাট যজ্ঞ-ভূমি হইতে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া আশার বিজয়ভেরী নিনাদিত হইতেছে,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.৪.৭০)

আর সেই সঙ্গে দেখি, স্থাবর জঙ্গম এক করা, পশু পক্ষী কাঁদান, আচণ্ডালে কোল দেওয়া, চতুর্দশ ভুবনব্যাপী বিশাল নাম-মহাযজ্ঞ-ভূমে দাঁড়াইয়া, প্রধান ঋত্বিক-বেশে প্রেমাবতারী স্বয়ং ভগবান্, প্রেমবাহু প্রসারিত করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে, মহামিলন মন্ত্র গাহিতেছেন,—

প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার।।
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।।
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে।।
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৫.১০৬)

অতঃপর আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, যেমন কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির সাধনা, ভক্তি মিশ্রিতা না হইলে তাহারা কোনই কার্যকারী হয় না, (শাস্ত্রের বহু স্থানে বহু প্রকারে ইহা পরিকীর্তিত হইয়াছে) এবং তাহা যে পরিমাণে ভক্তির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া থাকে, ভক্তি মিশ্রণের তুলনা অনুসারে সেই পরিমাণে ফলদায়ক হয়, কিন্তু ভক্তি কর্ম, জ্ঞান বা যোগ, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ নবধা ভক্তির তালিকায় উক্ত হইলেও, একমাত্র 'নামকীর্তন'ই অপর কোন সাধনাঙ্গের অপেক্ষা না রাখিয়া, আনুষঙ্গ ফলে সংসার-বন্ধন

মোচন হইতে আরম্ভ করিয়া, নববিধ ভক্তি পূর্ণভাবে প্রাদুর্ভূত করাইয়া থাকেন এবং স্বীয় অব্যর্থ ও অচিন্ত্য প্রভাবে, মুখ্যফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোদয় বা পঞ্চমপুরুষার্থ পর্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। কেবল ক্ষেত্র নিরপরাধ থাকিলেই হইল।

যত প্রকার অপরাধ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে একমাত্র নামাপরাধই সকল অপরাধের শীর্ষস্থানীয় বা প্রবলতম অপরাধ। ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাই, নরহত্যাই প্রবলতম অপরাধরূপে গণ্য বলিয়া, এখানে নরহত্যার প্রাণদণ্ডরূপ চরম শাস্তির বিধান হইয়া থাকে। নরহত্যাকারী ব্যক্তি যদি আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যালয় নির্মাণ প্রভৃতি অপরাপর সৎকার্য সকলের অনুষ্ঠাতাও হয়, তথাপি যখন সেই সকল সদনুষ্ঠানের কোনও পুরস্কার, তাহার নরহত্যারূপ প্রবল অপরাধের যাহা উপযুক্ত শাস্তি তাহার লাঘবতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু সেই সদনুষ্ঠানকারী যদি নরহত্যারূপ অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহা হইলে সেই সদনুষ্ঠান-সকলের ব্যবহারিক জগতের যাহা উপযুক্ত পুরস্কার [জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ, রাজা কর্তৃক সম্মান লাভ প্রভৃতি] তাহা অবাধেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ মায়াতীত রাজ্যে যথাযথ স্থান দানে সক্ষম—যতক্ষণ সাধক নামাপরাধে অপরাধী নহেন। সে'রূপ নরহন্তার অপরাপর সদনুষ্ঠান থাকিলেও সেই শ্রেষ্ঠ অপরাধের বিচারের সহিত—তাহার পুরস্কার যেমন বিবেচিত হইতে পারে না,—সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা (নাম নামীর অভিন্নতাবশতঃ) নামের নিকট যে হতভাগ্য অপরাধী তাহার পক্ষে অপর কোনও সাধনার ফললাভ হয় না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি একান্তভাবে নামেরই শরণাপন্ন হইয়া, অনুক্ষণ নামকীর্তন দ্বারা নামের প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্ব্বক নামাপরাধ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়।

প্রায় কলির জীবমাত্রেই নামাপরাধী। একটি অথবা একটিমাত্র শ্রীভগবন্নামের যৎকিঞ্চিৎ অংশমাত্র কিংবা একটি নামাভাসের দ্বারাও যদি কেহ নিজেকে নিখিল অপরাধের সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া এবং তৎসহ প্রেমের বা মুক্তির অধিকারী বলিয়া অনুভব না করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, তিনি যে কোন প্রকারেই হউক, নামাপরাধে অপরাধী। নামাপরাধের বিদ্যমানতা নির্ণয়ের ইহাই সুস্পষ্ট প্রমাণ। যখন নামাপরাধের বিদ্যমানতা সত্ত্বে, মায়াতীত অপ্রাকৃত ধামে অনন্ত কালের জন্য অবস্থান করিবার অপর যত কিছু সাধনা, তাহার কোন ফলদায়ক হয় না, তখন বিশেষতঃ এই কলিযুগে, নামাপরাধযুক্ত কলিহত জীবের পক্ষে, নামকীর্তন ব্যতীত অপর যে কোনই সাধনা নাই, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একথা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শাস্ত্রের এই সারমর্ম, কলিযুগের এই সারধর্ম, অতি দৃঢ়তার সহিত, অতি

স্পষ্টভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য ত্রিসত্য করিয়া, তাই শাস্ত্র ঘোষণা করিতেছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ—৩৮.১২৬)

ঠিক সেইভাবে, সেই সুরেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাহার ব্যখ্যা করিয়াছনে,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার।।
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেব-কার।।
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপ আদি নিবারণ।।
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
'নাই' 'নাই' 'নাই' তিন তিনে 'এব' কার।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.১৭.১৯-২২)

এই পর্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে,—

১) সর্বপ্রকার সাধনার মধ্যে নামকীর্তনই সহজলভ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ সাধনা।

২) নববিধ সাধনভক্তির মধ্যে নামকীর্তনের আসন সর্বোপরি সংস্থাপিত।

৩) নিখিল অপরাধের মধ্যে নামাপরাধই শ্রেষ্ঠতম অপরাধ।

৪) পরমার্থ সম্বন্ধীয় অপরাপর সাধনাসকল স্ব স্ব শক্তি অনুরূপ ফল প্রদানে সমর্থ হইলেও, নামাপরাধস্থলে সে সকল সাধনার কোনই সার্থকতা নাই।

৫) নামাপরাধ স্থলে, অপর সাধনাসকলকে নামের অপেক্ষা রাখিতে হইলেও, নামকীর্তন কোন অবস্থায়ই কোন সাধনার অপেক্ষা রাখেন না।

৬) নামের শরণাপন্ন হইয়া, নিরন্তর নাম-কীর্তনই (বা স্মরণ) নামাপরাধ হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়।

৭) নামের যথার্থ স্বরূপ ও পরমাদ্ভূত শক্তির উপলব্ধি না হইবার একমাত্র কারণ—নামাপরাধ।

৮) প্রায়শঃ কলির জীবমাত্রেই নামাপরাধী।

সুতরাং একমাত্র শ্রীভগবন্নাম ব্যতীত

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।

অর্থাৎ, হে ভগবান্ ! বিভিন্ন লোকের বাঞ্ছা বিভিন্ন প্রকার বলিয়া তোমার একটি মাত্রই নাম হইলে যদি সকলের গ্রহণ করিবার অভিলাষ না জন্মে, এই জন্য তুমি নিজ নাম বিভিন্ন প্রকারে বহু বহু বিভাগ করিয়াছ। আবার প্রাকৃত শব্দের ন্যায় তোমার এই নামসকল কেবল যে অর্থবোধক শব্দ মাত্র, তাহা নহে, তোমার নিজের সমুদয় শক্তি, নিজ নামসকলে অর্পণ করিয়া নাম নামী অভেদ করিয়াছ। শুধু তাহাই নহে, মায়াহত সংসারবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমার এতই ব্যাকুলতা, এতই করুণা যে, তোমার সেই পরম পবিত্র নামসকল গ্রহণ করিতে কোন কালাদির (অর্থাৎ দেশ, কাল, পাত্রাদির) নিয়ম রাখ নাই। আলস্যাদিবশতঃ যদি তোমার নামকীর্তন করিতেও অবসর না ঘটে, তবে তাহা স্মরণেও কার্যকারী হইবে, তুমি ইহাও নিয়ম করিয়া দিয়াছ। হে ভগবান্ ! হে করুণার অসীম বারিধি ! তুমিত সংসারকূপ হইতে আমার উদ্ধারের জন্য এতাদৃশী করুণার বিস্তার করিয়াছ, কিন্তু আমার এমনই দূর্দৈব যে এমন নামেও অনুরাগ জন্মিল না। (অর্থাৎ সে নামও আমি গ্রহণ করিলাম না।)

তাই বলিতেছি—ইহা অপেক্ষা শ্রীভগবানের অনন্ত অশেষ কৃপার বিস্তার আর কি হইতে পারে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। পরচর্চ্চায়, পরনিন্দায় গ্রাম্য-কথায় আমরা সমস্ত দিন, মাস, বৎসর, এমন কি সমস্ত জীবন ব্যয়িত করিতে যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকি। কিন্তু অশেষ দুর্দৈব আমাদের, আমরা দেশকালাদির নিয়মানপেক্ষী, অত্যন্ত সহজ ও সুখলভ্য শ্রীভগবন্নাম-কীর্তনে, এমনকি স্মরণেও ক্ষণকাল অবসর পাই না। যাহাই হউক, শ্রীভগবানের অনন্ত অসীম কৃপা যে, এই সংসারবদ্ধ জীবের সমীপে নাম-প্রচারেই সার্থক হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমধর্মের সাধন পথে, এই নাম-প্রচারের সুসংবাদ আমরা যাহা সন্ধান পাইয়াছি, আমাদের মনে হয়, তাহাই—তাহাই সমগ্র জীবজগতের আশার বাণী। তাহাই সমগ্র মানব জাতির পক্ষে সাধনার সুসংবাদ।[১]

"বিদ্যাবধু-জীবনম্—" —চতুর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন পরম উৎকর্ষতার সহিত জয়যুক্ত হউন। ইহা পুনরায় কিরূপ ? না, বিদ্যারূপ বধুর জীবনস্বরূপ। এখানে বিদ্যা—উপমেয়, বধু—উপমা। নামসঙ্কীর্তন—উপমেয়, জীবন—উপমা।

১। শুদ্ধাভক্তির ক্রমের পর্যালোচনা অংশটি প্রভুপাদ কৃত, 'শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্মের বৈশিষ্ট্য' নামক প্রবন্ধের অংশ। প্রবন্ধটি তৎকালীন 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' পত্রিকার ১১শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা ফাল্গুণ-চৈত্র ১৩২৭ সংখ্যা হইতে ১৩২৮ ভাদ্র ও মাঘ ১৩২৮ এবং ১২শ বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা চৈত্র-বৈশাখ ১৩২৮-২৯ শে মুদ্রিত।

পূর্বে শ্রেয়ঃরূপ কৈরবের বিকাশ কথায়, ভক্তিই মুখ্য বা যথার্থ শ্রেয়ঃ বস্তু এবং অপর সমস্ত শ্রেয়ই ভক্তিরূপ শ্রেয়ের অধীন—ইহা আমরা অবগত হইয়াছি। একমাত্র ভক্তিই অনন্যাপেক্ষী। অন্যান্য সকল সাধনার সমস্ত ফলই ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান-ধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।। (শ্রীভাগবত—১১.২০.৩২-৩৩)

অর্থাৎ—কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ধর্ম কিম্বা অপর যে কিছু শ্রেয়ো দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়—যদিও আমার ভক্তের অপর কোন বাঞ্ছা থাকে না, তথাপি ভজনানুকূল্যের নিমিত্ত যদি স্বর্গ, মুক্তি কিম্বা আমার ধামে অবস্থিতির জন্য কথঞ্চিৎও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে—মদ্ভক্তি দ্বারা তৎসমুদয় অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সেই পরমশ্রেয়ঃরূপ ভক্তি-কৈরবটি যদি শ্রদ্ধাদিক্রমে বিকশিত সাধনভক্তিরূপ শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল এবং উহা যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনরূপ জ্যোৎস্নালোকে বিকশিত হয়—সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্তন মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ—'মঙ্গলং মঙ্গলানাং'—অতএব সাধনভক্তির অঙ্গী ইহাই বুঝিতে হইবে।

অতঃপর—সেই সাধনভক্তিরূপ শ্রেয়ঃ ক্রমে যে প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়েন—তাহাই বর্তমানের আলোচ্য বিষয়। 'কৈরব' ফুলের 'ফল'স্বরূপ বিদ্যা বা 'প্রেমভক্তি'—ইহাই প্রণিধানযোগ্য।

এখন বিদ্যা বলিতে কি বোঝায় ?—'বিদ্যা' সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথা,—

'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডকোপনিষদ্—১.১.৪-৫)

অর্থাৎ,—ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুইটি, পরা এবং অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতিতেই সকলের কেবল শ্রবণ ও অধ্যয়নাদি জনিত জ্ঞান—তাহারই নাম অপরা বিদ্যা। আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ বা পরতত্ত্বকে জানা যায় তাহাই পরাবিদ্যা।

জ্ঞানমাত্রেই পরোক্ষ ও অপরোক্ষরূপ দ্বিবিধ। কোন এক বস্তু বা স্থানের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বা পড়িয়া যে জ্ঞান তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে এবং উক্ত বর্ণিত বস্তু বা স্থানের প্রত্যক্ষ দর্শন-জনিত যে অনুভূতি তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতির শ্রবণ অধ্যয়নাদি

জনিত যে পরোক্ষ জ্ঞান তাহারই নাম অপরাবিদ্যা। আর তাহারই সারাংশ হইল অপরোক্ষ জ্ঞান। যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ—অচ্যুত-নিত্যপরমাত্মবস্তুকে অবগত হওয়া যায় তাহাই পরাবিদ্যা—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।।"

তাহা হইলে অক্ষর বস্তুকে (পরতত্ত্ব-বস্তু) যাহা দ্বারা জানা যায়—সেই বিদ্যাই 'পরাবিদ্যা'।

শ্রীকৃষ্ণ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও উত্তম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে 'ক্ষর' বা অনাত্মবস্তুর অতীত এবং 'অক্ষর' বা জীবাত্মা ও অপর সর্ববিধ 'আত্মবস্তু' হইতেও উত্তম বা উৎকৃষ্ট—'অক্ষরাৎ পরতঃপর" (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে) তাহাই শ্রীমুখে তদীয় গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।
উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকেবেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।
যো মামেবসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।। (শ্রীগীতা—১৫.১৬-১৯)

অর্থ,—ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষই প্রসিদ্ধ। "ক্ষরঃসর্ব্বাণি ভূতানি" অর্থাৎ "ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি শরীরাণি" ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমুদয় প্রাণিগণ ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ অর্থাৎ রাশি-চৈতন্য-স্বরূপ, চেতন ভোক্তা জীব অর্থাৎ জীবাত্মা—তিনিই 'অক্ষর' বলিয়া কথিত হয়েন।

আবার ক্ষর ও অক্ষর (অর্থাৎ শরীর ও আত্মা) এই উভয় হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষ 'পরমাত্মা' নামে খ্যাত। তিনিই অব্যয় ঈশ্বররূপে লোকত্রয়ের প্রতিপালন করিতেছেন।

আমি কিন্তু এই সমুদয় 'ক্ষর' অর্থাৎ জড়বর্গের অতীত এবং 'অক্ষর' অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট—এ'কারণে লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

হে ভারত ! এইরূপ মোহমুক্ত হইয়া সেই ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিয়া সর্বভাবে সেবা করিয়া থাকেন এবং তদনন্তর সর্বজ্ঞতা লাভ করেন।

এখন পরাবিদ্যার আলোকে যে তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়—তাহাও দ্বিবিধ। পরাবিদ্যার দ্বারা সাধারণভাবে 'আত্ম' ও 'পরমাত্মবস্তু'কে জানা যায়—আর সেই

পরাবিদ্যার সবিশেষ সারস্বরূপ যাহা, তাহা দ্বারা ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে অবগত হওয়া যায়।

"—তদক্ষরমধিগম্যতে।"—এই পদে 'অক্ষর' শব্দে বাহ্যতঃ 'জীবাত্মা' বুঝাইলেও শব্দের মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি গ্রহণ করিলে, তদর্থে অচ্যুত অর্থাৎ নিত্যপরমাত্মবস্তু, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই নির্দিষ্ট হইয়া শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়েন।

তাহা হইলে পরাবিদ্যাও আবার দ্বিবিধা। যথা—সম্বিৎ ও সম্বিৎসার প্রধান।

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৪.৫৮)

শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানা—সম্বিৎসার অর্থাৎ সকল পরাবিদ্যার সার। আর জীবাত্মা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও আংশিক সবিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান তাহারই অধীন সম্বিৎস্বরূপ সাধারণী পরাবিদ্যা।

গ্রাহ্য হওয়ার অর্থ বোধ করা—জানা ও প্রাপ্ত হওয়া। শ্রীভগবান্ ভক্তিকেই (প্রেম) তাঁহাকে জানিবার ও পাইবার একমাত্র উপায় বলিয়াছেন, যথা—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"—(শ্রীভাগবত—১১.১৪.২০) যে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিৎসার পরাবিদ্যার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা ও প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহাই একমাত্র শুদ্ধা বা অমলাভক্তি। সুতরাং ভক্তিও এক অর্থে জ্ঞানবিশেষ—"ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি।"—(সিদ্ধান্তরত্ন—১.৩২)

ভক্তি অর্থে এখানে 'প্রেমভক্তি'কেই বুঝাইতেছেন—যাহা অমলা বা বিশুদ্ধা—কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে—যাহা একমাত্র যদৃচ্ছালব্ধ বা অহৈতুকী মহৎকৃপাদি হইতে জীব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েন।

এই অনন্যাভক্তিই শ্রীভগবান্‌কে জানায়, দেখায় ও পাওয়ায়—যেমন গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।। (গীতা—১১.৫৪)

অর্থাৎ,—হে পরন্তপ অর্জুন ! অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, পর্যবেক্ষণ করিতে, এমনকি অবলোকন করিতেও সমর্থ হওয়া যায়।

পৃথ্বীর নয়নমনোহর দৃশ্যসকল যেমন দিনমণির অনুদয়কাল পর্যন্ত নিবিড় তমিশ্রায় আবৃত থাকে, নিশান্তে দিবাকরের ক্রমোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সসাগরা ধরিত্রী যেমন তদীয় অরণ্যরাজি পর্বত, স্রোতস্বিনী ও প্রান্তর শ্যামলীমার সহিত নয়ন সমক্ষে ক্রমোদ্ভাসিত হইয়া উঠেন তদ্রূপ ভক্তির অনুদয়কালে অজ্ঞান তিমিরাবৃত হৃদয়ে অপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শুদ্ধাভক্তির উন্মেষে তদীয় চিদঘন শ্যামলতনু-মাধুর্য্যের সহিত

মোহন মুরলীধর সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হয়েন।

তাহা হইলে উক্ত বিদ্যা শব্দের অর্থ 'প্রেমভক্তি'—ইহাই শ্রীচরিতামৃতে ধৃত শ্রীল রায় রামানন্দ সম্বাদে স্বর্ণাক্ষরে উদ্ধৃত হইতে দেখিতে পাই ; যথা,—

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৯৯)

অতএব বিদ্যা অর্থে—'প্রেমভক্তি'ই যাহা শ্রেয়ঃরূপ কৈরব-কুসুমের পরিপূর্ণ ফল-স্বরূপ ; ইহাই সাধ্যসার।

অতঃপর বিদ্যাকে 'বধু' বলিবার তাৎপর্য কি ?—তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে। বধু অর্থে 'নবকান্তা'—তাহা হইলে বিদ্যাবধু অর্থে 'কান্তাভাবময়ী প্রেমভক্তি।' কান্তাভাবময়ী অর্থাৎ রাগভক্তির সীমা।[১]

একই শুদ্ধাভক্তি বিধিভক্তি ও রাগভক্তি ভেদে দ্বিবিধা। বিধিভক্তিতে তত্ত্বদৃষ্টির প্রকাশহেতু শ্রীভগবানের সর্বান্তর্যামী, সর্বভূতান্তরাত্মাদি ঈশ্বরভাবেরই প্রাধান্য সূচিত হয়। অপরপক্ষে রাগভক্তিতে নিহিত তত্ত্বদৃষ্টির অপ্রকাশহেতু—মাধুর্যপ্রধান কেবল মমতাস্পদ প্রিয়তম নিজজনরূপেই সমূর্ত শ্রীভগবান্ গ্রাহ্য হয়েন। এই রাগভক্তি আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরূপ বিভিন্ন ভাবের অবলম্বনে রাগ ও অনুরাগের সীমা অতিক্রম করিয়া একমাত্র মধুরেই ভাব ও মহাভাবসীমা পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। সুতরাং দাস্য-সখ্যাদির মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর রসাত্মক প্রেমভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীভগবান্‌কে সর্বাপেক্ষা সন্নিকটবর্তী করিয়া আনিবার পক্ষে বিধিভক্তি হইতে রাগভক্তি বা ব্রজপ্রেমেরই প্রভাবাধিক্য, তন্মধ্যে আবার দাস্যাদি হইতে যথাক্রমে মহাভাব পর্যন্ত প্রসারিত কান্তা-প্রেমেরই উৎকর্ষতা রহিয়াছে। ব্রজলোকের দাস, সখা, পিতৃমাতৃগণ ও কান্তাগণের পক্ষে যথাক্রমে, উহাদের পরিবর্দ্ধনের সীমা হইতেছে,—দাস্যে—রাগের শেষ সীমা পর্যন্ত। সখ্যে—অনুরাগের কিয়দংশ পর্যন্ত। বাৎসল্যে—অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত এবং মধুরে মহাভাব পর্যন্ত। প্রেমের এই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বা মহাভাব, দ্বারকাদি পুরস্থিতা কৃষ্ণমহিষীবৃন্দের পক্ষেও সুদুর্লভ। ব্রহ্মা-রুদ্র-রমাদি বাঞ্ছিত এই মধুরাখ্য ব্রজপ্রেমের আশ্রয় কেবল ব্রজপুর-রমাগণ। তন্মধ্যে শ্রীরাধানুচরী সখীদিগের উৎকর্ষ এবং তদনুগতা সেবিকা বা মঞ্জরীর মহিমা বিশেষ। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ জীবের ইহাই সাধ্যসীমা। প্রেমের পূর্ণতম পরাকাষ্ঠা মহাভাব-শিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমমহিমাই সর্বোপরি জয়যুক্ত—যে প্রেমাস্বাদনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনও প্রলুব্ধ হন।

১। উক্ত 'রাগভক্তি' বিষয়ে গ্রন্থকারকৃত—'শ্রীশ্রীরাগভক্তি রহস্য দীপিকা' গ্রন্থে সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ উৎকর্ষপ্রাপ্ত মহাভাব 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়' ভেদে দ্বিবিধ। অধিরূঢ় মহাভাব আবার 'মোদন' ও 'মাদন' নামে যথাক্রমে উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত। কেবল শ্রীরাধিকার আধার ভিন্ন 'মোহন' ও 'মাদন' অপর কোন আধারে অবস্থান যোগ্য নহে এবং রাধার আধার ও আশ্রয় ব্যতীত কৃষ্ণমাধুর্য্যাসব অন্য কোন পানপাত্রে পূর্ণরূপে আস্বাদন যোগ্য নহে। এইহেতু রাধাপ্রেম ও স্বমাধুর্য্য লুব্ধ ব্রজরাজ-নন্দনকেও রাধাভাবে বিভাবিত ও তদাধারে আধেয় হইয়াই উহার আস্বাদন সামর্থ্য লাভ করিতে হয়। মাদনাখ্য মহাভাবের আস্বাদক কেবল শ্রীরাধারাণী, তদ্ভাব বিভাবিত ও প্রেমবিলাস বিবর্তে একীভূত চিত্ত শ্রীরাধামাধব যুগল এবং তন্মূর্ত-একীভূততনু-শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত ইহার চতু[illegible] স্থলবর্তী কেহ নাই। মাদনের পরিপক্কাবস্থা বা 'প্রেমবিলাসবিবর্তে' ব্রজকিশোরযুগলের [illegible]য় চিত্ত একীভূত হওয়ায়, পরস্পর কর্তৃক উভয় জাতীয় সুখের পরিপূর্ণ আস্বাদন অধিকার লাভ করা সম্ভব হয়। 'বিবর্ত' অর্থে উভয় পক্ষে ভাব বিপর্যয়ান্তে আস্বাদ্য ও আস্বাদক বোধের বিলুপ্ততায়, কেবল এক নিবিড়তাময় আস্বাদন মাত্রের অনুভূতি। ব্রজলীলায়—প্রেমবিলাস বিবর্তে, উভয় চিত্তের একতাতেও কিন্তু উভয়ের দেহভেদ পরিদৃষ্ট হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত আনন্দ যাহার এককণের আভাসমাত্র সেই সর্বাদিরসের সর্বাদিমূল উৎস-রসলোকের এই প্রেমবিলাস বিবর্তিত রসরাজ ও মহাভাব-স্বরূপ ব্রজকিশোর কিশোরী যুগলের দেহভেদেরও বিলোপে, উভয়ের একীভূতস্বরূপ বা সমূর্ত প্রেমবিলাস বিবর্তই হইতেছেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

"তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।।"　(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.২৩৩)

রাধাভাব কান্তিরূপ বাষ্পময় ও বিজলী-বেষ্টিত গৌর-জলধর কর্তৃক নিজ আস্বাদন ও বাঞ্ছাত্রয় পূরণের আনুষঙ্গিক ফলে—নামসঙ্কীর্তনরূপ তুমুল মেঘগর্জনের সহিত যে প্রবল প্রেমধারা বর্ষিত হয় প্রতিকল্পে জীবলোকে—জীবের ভাগ্যেও ইহাই হইতেছে—পরম লাভ ও পরম শান্তি। নিবিড় সঙ্কীর্তনাবিষ্টতার মধ্যেই তাই অনুভূত হইয়াছে রাসস্থলীর শতকোটি গোপাঙ্গনার নটনছন্দের নূপুর শিঞ্জন ও ব্রজবিলাস বৈচিত্রীর ঘন আস্বাদন। আবার পুরদ্বয়ে মহিষীদিগের মধুরাখ্য প্রেম হইতে ব্রজগোপিকাগণের 'প্রেম' অধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া—মহাভাবসীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—যাহা মহিষীগণের সমঞ্জসা প্রেমে দুর্লভ। যথা,—

মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে।।　(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—১৪.১৫৬)

অর্থাৎ,—প্রেমের ক্রমোৎকর্ষ (১) সাধারণী (২) সমঞ্জসা (৩) সমর্থারতি পরম্পরায় সূচিত হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে যে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বা মহাভাব

প্রকাশ—তাহার আশ্রয় সমর্থারতিমতী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তদীয় প্রিয় সহচরীবৃন্দেই সীমাবদ্ধ। উহা সাধারণী বা সমঞ্জসারতিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মা-রুদ্র-রমাদি বাঞ্ছিত এই মহাভাবাখ্য ব্রজপ্রেমের আশ্রয় কেবল ব্রজরামাগণই।

মহাভাবের লক্ষণসকলের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টি লক্ষণ দেখা যায়,—(১) নিমেষাসহনতা—শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনকালে নিমেষের (চক্ষু পল্লবের) আবরণকে বা অদর্শনকে অসহ্য বোধ হওয়া, যথা,—"কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই। তাহাতে 'নিমেষ', কৃষ্ণ কি দেখিব মুই।।" —(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৪.১৩২)[১]

(২) কল্পক্ষণত্ব (মিলনে)—রাসের ব্রহ্মরাত্রি (কল্প) ক্ষণকালমাত্র বোধ হইয়াছিল।

(৩) ক্ষণকল্পতা (বিচ্ছেদে)—শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক, "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং—।" ইত্যাদি। এই শ্লোকে নিমেষাসহনতা ও বিরহ ক্ষণকল্পতা প্রদর্শিত হইয়াছে[১]।

শিক্ষাষ্টকের ষষ্ট শ্লোকেও, যথা,—"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা—" ইত্যাদিতে মহাভাবের উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় উক্ত ভাবসকল দ্বারা ভক্তের চিত্ত আক্রান্ত হইলে উহা 'সত্ত্ব' নামে কথিত হয়। উহা প্রাকৃত 'সত্ত্ব' নহে—অপ্রাকৃত বস্তু। সেই সত্ত্ব হইতে স্বতঃ সমুদিত যে লক্ষণ ভক্তদেহে প্রকাশ হয় তাহার নাম 'সাত্ত্বিকভাব' যথা—

তে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চা স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যাষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু– ২.৩.৭)

ইহার অর্থ,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বাষ্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)—এই আট প্রকার হইতেছে সাত্ত্বিক ভাব।

উক্ত সাত্ত্বিকভাবসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, যথাক্রমে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সুদীপ্ত নামে কথিত ও উত্তরোত্তর মহাভাবে সাত্ত্বিক লক্ষণসকল উদ্দীপতা প্রাপ্ত হইয়া, উহার পরাকাষ্ঠায় কেবল মোহনাখ্য মহাভাবেই সুদীপ্ত সাত্ত্বিকের প্রকাশ হয়।

শিক্ষাষ্টকের ক্রমস্থাপনের শেষপর্যায়ে যখন মহাভাবের লক্ষণই উক্ত হইয়াছে তখন প্রারম্ভিক শ্লোকেও তাহারই সূচনা হিসাবে এই কান্তাভাবময়ী মধুর প্রেমভক্তি যে ব্রজগোপিকাগণের মহাভাবাখ্য প্রেমকেই নির্দেশ করিতেছে—ইহা বুঝিবার পক্ষে আর কোনই অসুবিধা থাকিবার কথা নাই।

সেই মহাভাব আবার 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়' ভেদে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। অধিরূঢ় মহাভাব, মিলনে (সম্ভোগে) "মোদন" ও "মাদন" নামে এবং বিচ্ছেদ দশায় (বিরহে বা

১। এক নিমেষ বা এক ক্ষণ মাত্র কালকে যুগের ন্যায় বোধ হওয়া—এখানে যুগশব্দের অর্থ 'কল্প'। গীতাতে—"সম্ভবামি যুগে যুগে" প্রকৃষ্ট অর্থে "কল্পে কল্পে"।—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

বিপ্রলম্ভে) সেই মোদনই "মোহন" নামে উক্ত হইয়া থাকে। মহাভাবের চরমোৎকর্ষ বা পরাবস্থার নাম—মাদনাখ্য মহাভাব'। কেবল ইহার দ্বারাই অসমোর্দ্ধ 'কৃষ্ণমাধুর্য' পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করিবার যোগ্যতা লাভ করা যায়। উক্ত মাদনাখ্য মহাভাব কেবল শ্রীরাধা ও তদীয়া যূথস্থা গোপিকাসমূহে অবস্থিত। 'মাদন' ও 'মোহন' একমাত্র শ্রীরাধিকারই একান্ত নিজস্ব সম্পদ। আর মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীললিতাদি শ্রীরাধানুচরী গোপিকাগণেরই নিজস্ব। ইহাতে আর অপর কাহারো অধিকার নাই। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ অনুচৈতন্য জীবের পক্ষে উক্ত মহাভাবময়ী গোপিগণের আনুগত্যে মঞ্জরীভাবে কুঞ্জসেবা আস্বাদন করাই সাধ্য-সীমা। এই মঞ্জরীভাবের অবধিও মহাভাব পর্যন্ত। সর্বরস মধ্যে আদি অর্থাৎ সর্বপ্রধান যাহা সেই মহাভাবাখ্য শৃঙ্গার রসের ভক্তগণ নিজ কান্তাভাব দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রিয়তম কান্তরূপে নিকট করিয়া সেবনে উন্মুখ হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন পুনঃ (কিম্ভুতম্) কীদৃশম্ ?—না 'বিদ্যাবধু-জীবনম্'—এই মহাভাবময়ী অর্থাৎ মঞ্জরীভাবময়ী প্রেমভক্তি জীবহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন প্রভাবে উদিত হয়েন। উক্ত প্রকারে প্রেমভক্তির উদয় পর্যন্তই যথাবস্থিত সাধক দেহে সম্ভব হয়। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ রাগানুগা ভক্তগণের যথাবস্থিত দেহে শ্রদ্ধাদি ক্রমে প্রেম পর্যন্তই সীমা। তৎপরে দেহান্তে যোগমায়া কর্তৃক কোন ব্রহ্মাণ্ডগত প্রকট-লীলায় নিত্যসিদ্ধা-ব্রজগোপীর গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়া নিজ ভাবানুরূপ তত্রস্থ দাস-সখাদি লীলা-সঙ্গীগণের সঙ্গপ্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। সেই প্রেম আবার ক্রমে কি হয় ?

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২৩.২২)

এই শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনই প্রেমভক্তিরূপ নববধুর জীবন রক্ষণপূর্বক উহাকে স্নেহ, মান, প্রণয়াদি ক্রমে মহাভাব সীমা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। এইহেতু শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনকেই 'বিদ্যাবধু' বা 'মঞ্জরীভাবাত্মক' প্রেমভক্তির জীবনস্বরূপ বলা হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন সম্প্রাপ্তসিদ্ধ জীবকে প্রকৃষ্ট আনন্দ সমুদ্রের কূলে লইয়া গিয়া আনন্দসিন্ধু বর্দ্ধন করাইয়া জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতি সকল আত্মাকে 'স্নপিত' করাইয়া থাকেন। এই কথাই পরবর্তী অংশে আলোচিত হইবে।

সদ্যোজাত মানবশিশু যেমন জননীর স্নেহ, প্রীতি, করুণার ফল্গুধারায় সিক্ত হইয়া তৎকর্তৃক অতি যত্নে লালিত ও পালিত হইয়া দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে শৈশব, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরের দ্বার অতিক্রম করিয়া যৌবনে স্বাবলম্বন খুঁজিয়া পায়—তদ্রূপ সাধক ভক্তের প্রারম্ভিক কোমল শ্রদ্ধাও শ্রীনামসঙ্কীর্তনের মহামহিমা প্রভাবে সিক্ত হইয়া ও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শ্রদ্ধাদি স্তর অতিক্রমে প্রেমোদয়ের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পূর্বালোচনায় জাগতিক সকল বিষয়সুখকে যে ব্রহ্মানন্দের এককণ পরিমাণ বলিয়াই জানিয়াছিলাম—সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যে আনন্দসিন্ধুর নিকট গোষ্পদ-তুল্য—সেই কৃষ্ণানন্দের কথা একান্তই অবর্ণনীয়।

কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৭.৯৩)

পুনরায় শ্রুতিতেও উক্ত হইতে দেখা যায়,—

তৎসাক্ষাদ্‌করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো।।

(হরিভক্তিসুধোদয়—১৪.৩৬)

অর্থাৎ,—শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রহ্লাদ বলিতেছেন,—হে জগদ্‌গুরো ! আমি তোমার দর্শনলাভজনিত আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, আমার সম্বন্ধে অন্য সুখের কথা দূরে থাক, ব্রহ্মানন্দকেও গোষ্পদতুল্য বোধ করিতেছি।

সুতরাং উক্ত আনন্দাম্বুধির কথা যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে,—ইহা অপর কোন আনন্দ নহে। ইহাতে ব্রজের সেই মধুরাখ্য প্রেমানন্দের কথাই বুঝাইতেছে বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব 'আনন্দাম্বুধি' অর্থে 'প্রেমানন্দাম্বুধি' বুঝিতে হইবে। 'বিদ্যা' অর্থাৎ প্রেমভক্তির উদয়ে ভক্ত সেই (কৃষ্ণ) প্রেমানন্দাম্বুধির সম্মুখে উপনীত হয়েন।

'বিদ্যাবধু' অর্থাৎ ব্রজমঞ্জরীর অনুগত মধুরাখ্য (যাহা চরম পরিণত অবস্থায় মহাভাবাখ্য) প্রেমোদয়ে—উহার জীবনস্বরূপ প্রতিপালক হইয়া শ্রীনামসঙ্কীর্তন—প্রেমানন্দাম্বুধির সম্মুখে প্রেমিকভক্তকে উপনীত করেন। অতঃপর শ্রীনামসঙ্কীর্তন আরও যাহা কিছুর জন্য সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হইতেছেন, তাহা হইলে তিনি এই প্রেমানন্দ-সিন্ধুর বর্দ্ধকও (অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ) বটেন।

সমুদ্রের বর্দ্ধক হইয়া, উহাকে উদ্বেল করিবার পক্ষে যেমন পূর্ণচন্দ্রের ভূমিকা, তেমনি পূর্ণরূপে উদিত শ্রীনামসঙ্কীর্তন সেই প্রেমানন্দাম্বুধিকে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়াদি রূপে বর্দ্ধিত করিয়া মহাভাবে লইয়া যান। পরে নিত্যসিদ্ধা সখী ও মঞ্জরীদের সহিত সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে। তৎপরে উহাতে নিমজ্জিত হইলে হয় "সর্ব্বাত্মস্নপনং"—ইহাই শ্রীচরিতামৃতের উক্তিতে—"সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন"।

শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সেই প্রেমানন্দ-সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। "বর্দ্ধনং" শব্দের অর্থ হইতে ইহাই প্রকাশ পায়। প্রেমানন্দসিন্ধুর বর্দ্ধন দুই প্রকারে হয়। প্রথমতঃ সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া যেমন ভাসাইয়া লইয়া গিয়া নিমজ্জিত করে সেইরূপ। দ্বিতীয়তঃ প্রেমকে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়াদিরূপে বর্দ্ধিত করিয়া 'মহাভাব' সীমা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। ইহাও বর্দ্ধনের অর্থ—যেমন শ্রীচরিতামৃতকার তদীয় অতুলনীয় ভাষায়

প্রকাশ করিয়াছেন,—

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ, ভাব মহাভাব হয়।। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২৩.২২)

তাই বলা হইয়াছে শ্রীনামসঙ্কীর্তন যিনি জীবের সর্বোত্তম আনন্দের এতাদৃশ উদয় ও বর্দ্ধনকারী, তিনি সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন।

"সর্বাত্মস্নপনং—"

পূর্বে 'আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং' আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন যে জীবের সম্মুখে আনন্দ সমুদ্রের উদয় করেন এবং ইহা যে "প্রেমানন্দসমুদ্র" এ'কথা আমরা অবগত হইয়াছি। সর্বোত্তম বা সর্বমুখ্য বস্তুই শ্রীনামসঙ্কীর্তনে লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত শ্রেয়ঃকৈরব অর্থে সাধন-ভক্তির ফলস্বরূপ সাধ্যভক্তি বা প্রেমের উদয়ে জীব প্রেমানন্দ-সিন্ধু-কূলে উপনীত হয়। এই প্রেম হইতেছে জীবের পক্ষে সর্বাধিক সাধ্য যাহা সেই মধুরাখ্য-মঞ্জরীপ্রেম।

শ্রীনামসঙ্কীর্তন প্রভাবে প্রেমানন্দসিন্ধু বর্দ্ধিত হইয়া প্রেমিকভক্তকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির যেমন সর্বাঙ্গ পরিস্নাত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের পর (কৃষ্ণপ্রাপ্তি) ও তৎ সেবারসামৃতে (সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন) প্রেমিকভক্তও তেমনি পরিস্নাত হয়েন।

মধুরাখ্য সেবারূপ রসামৃত সমুদ্রে সম্প্রাপ্তসিদ্ধ জীব নিমজ্জিত হইয়া যুগপৎ আত্মা, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ('সর্বাত্ম' শব্দের অর্থ) পরিস্নাত হইতে থাকে।

সর্বকারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রিয়তার মূল উৎস। তাঁহার প্রিয়তাতেই সকল কিছুর প্রিয়তা সাধিত হয়। নিখিল প্রিয়তার সেই পরম কারণকেই শ্রুতি তাই নির্দেশ করিতেছেন,—

প্রাণবুদ্ধিমনঃ-স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসাংস্ততঃ কোঽন্যঃ পরঃ প্রিয়ঃ।।

(শ্রীভাগবত—১০.২৩.২৭)

অর্থাৎ,—যাঁহার প্রিয়তার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা, পুত্র ধনাদি বিষয়সকল প্রিয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে অন্য কে আর প্রিয় আছে।

"সর্বাত্মস্নপনং—" শব্দই চরিতামৃতের উক্তিতে "সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন" সেবামৃত অর্থাৎ সেবা-রসামৃত। 'আনন্দের' উপর 'রস'। রস আনন্দের আশ্রয়। রসবস্তুই আস্বাদনীয়। রসাস্বাদন হইতেই আনন্দ হয়। রস কারণ, আনন্দ কার্য। পুষ্প হইতে যেমন সৌগন্ধ সমুৎপন্ন হয়, রস হইতেও তেমনি আনন্দ সমুদ্ভুত হয়।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি,—" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২.৭)।

ইহার তাৎপর্যার্থ,—যিনি স্বয়ং ভগবদ্ স্বরূপ (সুকৃত অর্থে স্বয়ং কর্তা) তিনিই রস-স্বরূপ। সেই রসস্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দী বা সুখী হয়।

আনন্দের বিষয় থাকিলেই যে আনন্দ হয় তাহা নহে, আনন্দের আশ্রয় হইতেই ভাবের উচ্ছ্বাস বিষয়ে গিয়া পড়িলে তাহারই সংস্পর্শে বিষয় রসতা প্রাপ্ত হইয়া, আশ্রয়কে আনন্দ দান করে। 'ভাব' হইতেছে আনন্দের 'বৃত্তি', এই ভাবেরই অপর নাম 'ভক্তি'। ভাব ও রস এবং রস ও ভাব পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধ।

ভাব বা ভক্তির সংযোগই, বিষয়কে রসরূপে পরিণত করে। বিষয় রসরূপে অনুভূত হইলেই, সেই রস হইতে আনন্দ উপলব্ধি হইতে থাকে। ভক্তি বা ভাবের সংযোগ ভিন্ন কোন বিষয়ই 'রস' রূপে পরিণত হয় না ; সুতরাং তাহা হইতে সুখ বা আনন্দও হয় না।

ভাবই বিষয়কে রসতা প্রাপ্ত করাইয়া আনন্দের আশ্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং ভাবই আনন্দের বৃত্তি। সুখাস্বাদনের ইহাই সার্বত্রিক প্রণালী। আনন্দিনী বা হ্লাদিনী শক্তিই সর্বানন্দের মূল। আনন্দ এবং ভক্তি—এই উভয়ে ভিন্ন বস্তু না হইলেও হ্লাদিনী যখন ভগবানের ভিতরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম—'শক্তি'। আর যখন সেই আনন্দ সক্রিয় অবস্থায় ভগবানের বাহিরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহারই নাম হয়—'ভক্তি'। আনন্দময় হইয়াও শ্রীভগবান্, যে আনন্দবৃত্তি দ্বারা আপনি আনন্দিত হয়েন এবং অন্যকে আনন্দিত করেন,—আনন্দের আনন্দিত করিবার সেই নিজ সামর্থ্যবিশেষ বা বৃত্তিই হইতেছে 'ভাব' বা 'ভক্তি'। আনন্দ হইতে ইহাই ভক্তির বৈশিষ্ট্য। এইজন্য ভক্তিকে হ্লাদিনীর 'সার' বা 'বৃত্তি' বলা হয়। ইহারই অপর নাম,—'ভাব', 'প্রিয়তা', 'ভালবাসা' প্রভৃতি।

নিশ্চল বায়ু যে সামর্থ্য দ্বারা নিজেকে সঞ্চালিত করিয়া জীবসকলকে শীতলতা দানে পরিতৃপ্তি করে,—সমীরণ হইতে অভিন্ন সমীরণের সেই সামর্থ্যবিশেষকে যেমন উহার বৃত্তি বলা যাইতে পারে—আনন্দ ও ভক্তি উভয়ে এক হইয়াও সেইরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্নই বুঝিতে হইবে। সুখের বিষয় থাকা সত্ত্বেও, যে 'বৃত্তি' বা ভাবের সহায়তা ব্যতীত সেই সুখের অনুভূতি হয় না, আনন্দের বিষয় থাকিলেও আমরা যাহার অভাবে আনন্দিত হইতে পারি না, আনন্দের সেই বৃত্তি-বিশেষের নামই ভক্তি, ভালবাসা বা প্রেম।

তাহা হইলে বুঝিলাম,—শ্রীভগবান্ যে নিজ শক্তি-বিশেষ দ্বারা স্বয়ং স্বরূপতঃ আনন্দময় হইয়াও নিজে আনন্দিত হয়েন, নিজ ভক্তদিগকে ও অপর সকলকেই

আনন্দিত করেন, তাহাই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি, যথা—"হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, ১১৭ অনুঃ)। শ্রীচরিতামৃতের ভাষায়,—

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১২১)

পূর্বে "আনন্দাম্বুধি" শব্দের আলোচনায় আমরা উহাকে "প্রেমানন্দাম্বুধি" বলিয়াই জানিয়াছি। উক্ত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবার উপায় যে মধুরাখ্য প্রেম, উহা স্বরূপশক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা—হ্লাদিনীর সার দ্বারা গঠিত। যথা চরিতামৃতে—"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব"—ইত্যাদি। উক্ত আনন্দ পাইতে হইলে, তদ্বিষয়ে জানা আবশ্যক। এইহেতু উহা জানিবার বা বুঝিবার জন্য তৎসহ সম্বিৎসার মিশ্রিত হইয়াছে। তাই উক্ত ভক্তিলক্ষণে বলা হইয়াছে,—

"হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিতসাররূপেতি।"

সেই আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধিত হইলে প্রেমিকভক্ত সেবামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েন। সেবামৃত অর্থাৎ সেবারসামৃত। পূর্বে আনন্দ, রস ও ভাবের আলোচনায় আমরা রসকে আনন্দের উপর তাহার আশ্রয়রূপেই পাইয়াছি। তাই আনন্দ হইতেও সেবা (সুখ) অধিক। মহাভাবের দ্বারা শৃঙ্গার রসরাজের প্রেমসেবা—ইহা সর্বকালের, সর্বাবস্থায় সর্ব আনন্দের উপর। তাই সেবাকালে ভক্ত, প্রাপ্ত আনন্দকে ধিক্কার দিয়া কেবল সেবামাত্রই প্রার্থনা করেন। যদিও সেবাই রসাস্বাদন—সেবা-রস হইতেই সুখ বা আনন্দের উদয় হয় তথাপি ভক্তের সেবাগ্রহের মধ্যে সুখাভিলাষের কোন স্থান নাই। সুখ ত্যাগ করিয়াও সেবার পরম আগ্রহ থাকে বলিয়াই, বলা হয়—"সুখ বাঞ্ছা নাই সুখ হয় কোটিগুণ।"—ইহাই নিরুপাধিক প্রেমের লক্ষণ।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং—" ইত্যাদি শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নোক্তরূপে বিধৃত হইতে দেখি,—

সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গাম।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম্ প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.১০-১১)

উপরোক্ত পয়ারে শ্রীচরিতামৃতকার, নামাশ্রয় হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবামৃতে চিরনিমগ্ন হইবার সংক্ষিপ্ত স্তর বা ক্রম প্রদর্শন করাইয়াছেন। এতাবৎ আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে,—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হইতেছেন কি জন্য ?—না, নামসঙ্কীর্তন অর্থাৎ নিরপরাধে নামাশ্রয় হইতে পাপক্ষয় ও অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া সংসারের যথার্থ স্বরূপ যে মহাদাবাগ্নি তাহা প্রতিভাত

হইলে—সংসারক্ষয়ে চিত্তশুদ্ধি বা শ্রদ্ধাদি ক্রমের সহিত সর্বভক্তি অর্থাৎ নববিধ ভক্ত্যঙ্গ ও সাধন অর্থাৎ সাধনাঙ্গ সকলের (৬৪ প্রকার) উদ্গমের পর, উহা যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম করাইয়া উহার ক্রমবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির সহিত কৃষ্ণসেবারসামৃত সমুদ্রে নিমজ্জিত ভক্তকে প্রেমামৃত আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ইহাই শ্রীনামসঙ্কীর্তনের তটস্থ লক্ষণ। অতঃপর পরবর্তী পদে আমরা সেই শ্রীনামসঙ্কীর্তনেরই স্বরূপ-লক্ষণ সকল অবগত হইব।

"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্—"

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনং পরং উৎকর্ষেণ বিজয়তে। কীদৃশং ? — "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্"—। এস্থলে প্রতিপদং উপমেয়, অমৃতাস্বাদনম্ উপমা।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং" হইতে "সর্ব্বাত্মস্নপনং" পর্যন্ত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের বিষয়ে যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে তাহাতে শ্রীনামের তটস্থলক্ষণ অর্থাৎ শক্তি বা মহিমার কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে উপরোক্ত "প্রতিপদং"—ইত্যাদি বাক্যে সেই শ্রীনামসঙ্কীর্তনের স্বরূপ-লক্ষণের বিষয় বলা হইতেছে।

আকার প্রকার রূপ—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারে জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.২০.২৯৬)

অর্থাৎ শ্রীনামে কি হয় ? —ইহাই জানার নাম তটস্থ-লক্ষণ বা কার্যদ্বারা তদ্বিষয়ে জ্ঞান। আর শ্রীনাম নিজে কিরূপ ?—ইহাই জানার নাম স্বরূপ-লক্ষণ। অর্থাৎ শ্রীনামের ফলে যাহা হয় এবং নাম নিজে যাহা, তাহাই যথাক্রমে তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণ।

সাধু-শাস্ত্রাদি হইতে বহুল পরিমাণে শ্রীনামের মহিমাদি (তটস্থলক্ষণ) অবগত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীনামের মাধুর্যাদি অর্থাৎ শ্রীনাম নিজে কত মধুর ! (না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি চায়। —চণ্ডিদাসের কবিতায় শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি) কত সুন্দর ! ইত্যাদি (স্বরূপ-লক্ষণ) বিশেষ প্রচার হয় না। কারণ ইহা ভক্ত-সাধকগণের একান্ত নিজ আস্বাদিত ও অনুভববেদ্য বিষয়। অবতরণিকার পর শ্রীনামের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচারের সময় এ'বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এ'ক্ষণে বাহুল্যভয়ে উহার পুনরুল্লেখ পরিত্যক্ত হইল—কেবল কতিপয় নব দিগ্দর্শন ও দৃষ্টান্তই এ'স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীনামী বা শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্নতত্ত্ব[১]। শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৭.১২৮)

১। নাম ও নামীর অভিন্নত্ব বিষয়ে এবং নামের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা পূজ্যপাদ গ্রন্থকার কৃত শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি প্রথম কিরণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

অর্থাৎ,—প্রাকৃত প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম—নাম ও দেহ পরস্পর বিভিন্ন বা পৃথক হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ সম্বন্ধে কিন্তু এ'রূপ কোন ভেদ নাই, ('দেহ দেহি-ভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"—কূর্ম্মপুরাণ।)

নাম ও নামীর অভেদত্ব বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না রাখিয়া, শাস্ত্র জলদ-গম্ভীর স্বরে সুস্পষ্টরূপে 'অভিন্ন' শব্দের উল্লেখেই নির্দেশ করিতেছেন,—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস—১১.৫০৩]

অর্থাৎ—নাম ও নামীর অভিন্নতা নিবন্ধন চৈতন্য রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার নামও চিন্তামণি-স্বরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত স্বভাব।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্ জীব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন, যথা—"নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব অপিতু চৈতন্যাদি লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতীতি।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—৩৩) অর্থাৎ—শ্রীনাম চিন্তামণি স্বরূপ, কারণ তিনি সর্বাভীষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ। নাম কেবল ভগবৎতুল্য সর্বার্থপ্রদানেই সমর্থ নহেন, চৈতন্যাদি লক্ষণযুক্ত যে কৃষ্ণ সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণই কৃষ্ণনাম। নাম ও নামীর অভিন্নত্বাদি বলিবার—ইহাই মূল তাৎপর্য।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি কার্য হইতেই তদীয় মহিমাদি জগতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু তদীয় মহিমার ঊর্দ্ধে যে তদীয় মহামহিমাময় 'স্বরূপের' মহা-মহা-মাধুর্যাদি—উহার সন্ধান অবগত হওয়া এবং উহার আস্বাদন (স্বরূপ-লক্ষণে) কেবল সর্বোত্তম রসিক ভক্তগণেরই পরম আস্বাদ্য বিষয়। শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,—"অতএবানন্দরূপত্বমস্য মহদ্হৃদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—৩১) অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্মূর্ত্তির ন্যায় ভগবন্নামেরও আনন্দরূপত্বাদি সম্বন্ধে মহৎগণের হৃদয়ের অনুভবই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

দুঃখাদি নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি বা আনন্দের সীমা অতিক্রম করিয়া তদীয় রসময় স্বরূপের সন্ধান ও রসলোক প্রাপ্ত হইলে, তখন কেবল সেই রসসিন্ধু মাঝে নিমজ্জিত হইয়া, সেই রসাস্বাদন ব্যতীত অপর কিছুরই সন্ধান থাকে না। এই হেতু শ্রুতিও আনন্দতত্ত্বের উপর রসতত্ত্বকে প্রচার করিয়াছেন। পূর্বোক্ত—"রস বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"।—ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দ্রালোকের পরম রমণীয় শুচিস্নিগ্ধকর প্রভাবে তাপিতজনের তাপ নিবারণ, কৈরবাদি (পদ্ম) কুসুমের বিকাশাদি, কোকিল পাপিয়া পভৃতি পক্ষিকুলের আনন্দ কূজন, নবদম্পতির মধুর রসালাপ প্রভৃতি সুসম্পন্ন হইলেও, তাহা হইতেও—বহু ঊর্দ্ধে

বিচরণশীল চকোরের চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া, যেমন আর অন্য কিছুর সন্ধান না রাখিয়া, কেবলমাত্র তাহার জ্যোৎস্নাসুধার আস্বাদনই অধিক তাৎপর্যমূলক—রসিক ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণ-আস্বাদনও সেইরূপ।

শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভিন্ন বলিয়া, রসিক ভক্তগণের নামীতেও যেমন মাধুর্যাদির আস্বাদন অবগত হওয়া যায়, নামেও তদ্রূপ,—

(১) নামীর দর্শনে ভক্তের অনুভূতি ;—

তৎসাক্ষাদ্-করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো।।

(শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি : হরিভক্তি সুধোদয়—১৪.৩৬)

অর্থাৎ—প্রহ্লাদ শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিতেছেন,—হে জগদ্‌গুরু আমি আপনার দর্শনলাভজনিত আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, আমার সম্বন্ধে অন্য সুখের কথা দূরে থাক—ব্রহ্মানন্দকেও গোষ্পদতুল্য বোধ করিতেছি।

এই শ্লোকে নামীর দর্শনে ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিবার ন্যায় পরমানন্দ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

(২) নাম-আস্বাদনে ভক্তের অনুভূতি ;—

কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম।।

(ভক্তরূপে লীলাকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি : শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১.৭.৯৩)

ইহার দ্বারা নামীর ন্যায় নামেও ব্রহ্মানন্দকে লাঘব করিবার ন্যায় পরমানন্দ-লক্ষণের বিষয় উক্ত হইয়াছে।

এ'বিষয়ে অপর উদাহরণসকল ইতিপূর্বে অবতরণিকায় সন্নিবেশিত থাকায় আর পুনরুল্লেখিত হইল না।

সর্বোত্তম সাধনরূপে শ্রীনামকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদরবুদ্ধিতে নিরপরাধে আশ্রয় করিয়া যতই সাধ্য বা নামীর নিকটতর হওয়া যায়, ততই নাম ও নামীর প্রতি সম অনুরাগ জাগিয়া উভয়ের অভিন্নতা প্রকাশ পাইতে শুরু হয়। তখন সেই সিদ্ধভক্তের দুই পুরুষে আসক্তির ন্যায় বোধ হয়।

নামাশ্রয়ী রসিক ভক্তের উক্ত অনুভূতির পূর্ণপ্রকাশের অনুরূপ অনুভূতি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর পূর্বরাগের প্রথমাবস্থায় তীব্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীভগবানের) নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতা শ্রীরাধিকার নিকট অপ্রকাশিত থাকায় এই তিনের একত্বরূপ মহারহস্যজাল ভেদ করিতে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন। তদবস্থায়, কুলবালার পক্ষে সমকালে ব্যক্তিত্রয়ে সমান আসক্তিরূপ মহা

অনর্থের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প অবধি করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর তীব্র মনোবেদনা-প্রকাশক সেই অভিব্যক্তি ভক্ত কবি শ্রীল গোবিন্দদাস কবিরাজ সুললিত ছন্দে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

(শ্রীরাধিকা শ্রীললিতাদি সখিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কাতরভাবে বলিতেছেন—)

সজনি ! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি,
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি—
জীবন কি এ সুখ লাগি।
পহিলে শুনলু হম্ "শ্যাম" দুই আঁখর,
তৈখন মনচুরি কেল। ....(নাম)
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই,
চমকই শ্রুতি হরি নেল। ....(স্বরূপ)
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি—
নবজলধর জিনি কাঁতি। ....(বিগ্রহ)
চমকিত হই হম যাঁহা যাঁহা ধাবই,
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি।
গোবিন্দ দাস কহে শুন সুন্দরি ;
অতএ করহ বিশোয়াস ;
যাকর নাম, মুরলীরব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ।

পূর্বোক্ত অনুভূতির আরও প্রাঞ্জল উদাহরণস্বরূপ নিম্নে এক রাজদূত ও রাজপুত্রের অভিন্নতার গল্প বিবৃত হইতেছে[১], যথা,—

"সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বর্ণপুরীতে ছিল এক রাজার কুমার, অন্য পারে, তালবনের শীতল কুঞ্জের ধারে—তালপাতার ঘরে একটি হাসিরাশি ভরা সুন্দর মেয়ে থাকতো। তার ধূলা মাটির পাতান খেলা ঘরের খেলার বয়স ছাড়িয়ে উঠতেই একদিন সে শুনলে, সেই সাত সাগরের পারের রাজার কুমারের সঙ্গে অতি শৈশবে তার নাকি বিয়ে হয়েছিল ; তারপর এ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। ভুলে যাওয়া স্বপ্নের ক্ষীণ স্মৃতির মত সেই রাজার ছেলের কথা একটু একটু তার মনে পড়লো। অগ্নিকণা যেমন বেড়ে উঠে অগ্নিপুঞ্জের সৃষ্টি করে, তেমনি সেই তরুণ রাজকুমারের স্মৃতির আগুন তরুণীর সারা হৃদয় ছেয়ে ফেললো। প্রাণবল্লভের রাতুল চরণের সুখসম্মিলন আশায় কৃশাঙ্গিনী একান্ত ব্যাকুলা হয়ে উঠলো। সে আবেগের সংবাদ বুঝি

১। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার কৃত 'বৈজয়ন্তী প্রবন্ধাবলী' ধৃত শ্রীনাম বিগ্রহ স্বরূপের অভিন্নতা শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তার প্রিয়তমের প্রাণের দুয়ারে গিয়ে আঘাত করলো। তাই তার সারারাত লুকিয়ে কাঁদা রাঙ্গা চোখ দুটি মুছতে মুছতে—একদিন প্রভাতে, সে যখন বাহিরে এসে দাঁড়াল, তরুণী দেখলে, আজ যথার্থই তাঁর সুন্দর এক রাজদূত তার সেই অতি সুন্দর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে আজ তাকে তার স্বামীর চরণতলে নিয়ে যেতে। তরুণী, সেই অতি বিশ্বাসী রাজদূতের অনুসরণ করে তার স্বামীর ঘরে চললো। রাজদূতকে দেখে, প্রথমে কেবল একজন হিতৈষী বান্ধব বলেই তার মনে হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে যতই তার সঙ্গে যেতে লাগলো সে ততই তার গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল। তরুণী তার স্বামীর অশেষ গুণের কথা শুনেছিল, আজ এই রাজভৃত্যের গুণের পরিচয় পেয়ে তার সেই শুনা কথা প্রত্যক্ষের মত বোধ হতে লাগলো। ক্রমে তার সঙ্গে একে একে নদ নদী সমুদ্র যতই পার হ'তে লাগলো সে, ততই সে রাজদূতের গুণে আত্মহারা হয়ে পড়লো। এখন শুধু আর গুণ নয়, রাজদূতের রূপ ও মাধুর্য তার কাছে অমৃতময় বোধ হ'তে লাগলো ! হঠাৎ চমক ভাঙ্গতেই—এই অমৃত মাঝে কি যেন এক হলাহলের ঝাপটা এসে তাকে শঙ্কায় ভরিয়ে দিলে, হৃদয়ের মাঝে যে শ্রেষ্ঠতম আসনে সেই তরুণ রাজকুমারের রূপ, গুণ, মাধুরীকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে সে, কে এই রাজদূত—যার রূপ, গুণ, মাধুর্যের এত বিক্রম এতই সাহস যে সেই আসনের অর্ধাংশে বসবার দাবী করে ! দুই পুরুষে সম অনুরাগ—কুলনারীর মরণ অপেক্ষা দুঃসহ। তাই সে ধৈর্যের বাঁধ অতি কষ্টে আরও উঁচু করে, স্বামীর অভয় চরণ দু'খানি হৃদয়ে ধরবার জন্য শীঘ্র রাজদূতের সঙ্গে সেই স্বর্ণপুরীর মধ্যে ব্যাকুল প্রাণ নিয়ে প্রবেশ করলো। রাজকুমারের মণিময় মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্বে, শেষ একবার রাজদূতের মুখপানে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে দেখতে তার সাধ জাগলো। সেই মুখখানি দেখবামাত্র এ'বার তার ধৈর্যের সকল বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। এত সুন্দর ! এত মধুর ! এত রূপ ! —একি আমারই সেই প্রাণবল্লভ ! এই কি সেই অনুপম রাজকুমার ? এই কথা তার মনে হতেই উল্লাসে—উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায়, সংজ্ঞাহীন বালিকা তার অনুমিত রাজদূতের চরণতলে লুটিয়ে পড়লো। পরক্ষণে যেন কার আলিঙ্গনের মোহন স্পর্শ—তার মোহঘোর ভেঙ্গে দিল। আঁখি মেলে চাইতেই দেখল সে, রত্নসিংহাসনের উপর সেই পরমসুন্দর রাজদূত—আর সংবদ্ধা সে তাহারই আবেগভরা আলিঙ্গনে ! বিস্ময়ের বিকলতায় তার শঙ্কিত আঁখি দুটি পুনরায় মুদে আসছে দেখে, তখন সেই সুন্দর তরুণ সহাস্যে বললেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে— "রাজদূত নহি প্রিয়তমে—আমিই সে রাজার কুমার।"

আজ সকল সন্দেহের অবসান হয়ে গেল। লজ্জিতা বালিকা আজ বুঝল এতদিন রাজদূত বলে সে যাকে ভুল করেছিল—সেই তার হৃদয় দেবতা—সে-ই সেই তরুণ রাজপুত্র। আনন্দের পূর্ণ উৎস-ধারা ছুটলো তখন।

তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে,—সাধন বা রাজদূতরূপ 'নামসঙ্কীর্তন' সাধকভক্তরূপ রাজকুমারীকে ক্রমশঃ রাজভবনে লইয়া গিয়া, সাধ্য বা নামীরূপ রাজপুত্রের সহিত মিলন এবং উভয়ের অর্থাৎ রাজদূত ও রাজপুত্রের (নাম ও নামীর অভিন্নতাই দর্শন করান। কারণ "নামই সাধন এবং নামই সাধ্য।"

অতএব যেমন 'শাস্ত্র প্রমাণ' তেমনি 'বিদ্বদনুভব' দ্বারা—সর্বভাবেই ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, শ্রীভগবদ্ সম্বন্ধে,—

নাম বিগ্রহ স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই—তিন চিদানন্দরূপ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৭.১২৭)

সর্বশেষে—রসিকভক্তগণ যেমন কৃষ্ণ-সেবারস-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া,—নামীর রসাস্বাদন করেন, তেমন নাম-রসিক-ভক্তগণ কৃষ্ণনামকীর্তনরস-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া, নাম-রসাস্বাদন করেন।

শ্রীনাম শ্রীভগবদ্ স্বরূপেরই ন্যায় চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়া, স্বরূপাদির ন্যায় শ্রীনামও স্বেচ্ছায় উদিত না হইলে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সামর্থ্য দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন না।

অতএব কৃষ্ণ নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে,' হয় স্বপ্রকাশ।।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১৭.১২৯-১৩০)

তাই রসিক ভক্ত সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন যে,—

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মি নির্যাস মাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা।।

(শ্রীরূপপাদকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক—৮)

অর্থাৎ, হে কৃষ্ণনাম ! নারদ বাণীর উজ্জীবনকারী তুমি,—সুধা-উর্ম্মিমালার সারাংশের ন্যায় নিরন্তর মাধুর্যরাশি বিস্তার করিতেছ। অতএব তুমি আমার রসনায় রসের সহিত সর্বদা যথেষ্টরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ আমাকে নাম-রসিক কর।

পূর্বে চন্দ্রালোকের উদাহরণে নিশাকরের শুচিস্নিগ্ধ রমণীয় আলকে প্রাকৃত জগতের ফুল, পাখী ও নবদম্পতির যে আনন্দ স্ফূর্তির প্রকাশ দেখি তাহা চন্দ্রকিরণের মহিমারই প্রকাশক—জগতের সেই উল্লসিত আনন্দমূর্তি চন্দ্রকিরণের মহিমায় নিমগ্ন—অপরপক্ষে চকোরের সুধাপান চন্দ্রের মাধুর্য আস্বাদনেরই পরিচায়ক। সেইরূপ নামরসিকজনও যে কেবল নামের মাধুর্যামৃতেই নিমগ্ন হয়েন, তাহাই বলা হইতেছে।

যে মুখেতে অবিরাম উচ্চারয়ে কৃষ্ণনাম
সে না মুখ চন্দ্রের সমান।
দেখিতে শীতল করে কৃষ্ণনামামৃত ঝরে
সাধুনেত্র চকোরের প্রাণ।।

আবার সেবারসামৃতে নিমগ্ন রসিক ভক্তেরও সেই একই অনুভূতির কথা বলা হইতেছে,— ও রূপ সম্মুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি করি
পিবইতে জিউ করে সাধা।
নয়নে লাগিল যেই পান করে সদা সেই
ঘন ঘন স্মঙরিয়ে রাধা।।

সুতরাং সাধকাবস্থায় রসময় শ্রীনামস্বরূপের সাধনায়, দুঃখাদি নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি বা আনন্দের সীমাতিক্রমণে সমকালে তদীয় রসময় শ্রীনামস্বরূপ ও শ্রীনামীস্বরূপের সন্ধানও রসলোকপ্রাপ্তিতে (তদবস্থায়) কেবল রসসিন্ধু মাঝে নিমজ্জিত হইয়া—সেই রসাস্বাদন ব্যতীত অপর আর কিছুর সন্ধান থাকে না,—যে শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনের ফলে—সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্তন আজি সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন !

"জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম"।



— উপসংহার —

"শ্রীনামসঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়"। সাধ্য হইতেছে উপেয় বা প্রয়োজন। আর তাহার সাধন হইতেছে 'উপায়' বা অভিধেয় অর্থাৎ কর্তব্য।

সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৫৮)

সীমাপ্রাপ্ত—সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুই হইতেছেন পরম সাধ্য বা প্রয়োজন এবং সেই সাধ্য বা প্রয়োজন পাইবার উপায় বা অভিধেয় বলিয়া 'শ্রীনামসঙ্কীর্তনকে' 'পরম উপায়' বলা হইয়াছে। সর্বকালেই এই শ্রীনামসংকীর্তন সকল উপায় হইতেও 'পরম উপায়' হইলেও এই শ্রীগৌরসুন্দর প্রকটিত কলিতে, তদীয় অনির্বচনীয় কৃপাসাপেক্ষে[১] উহা সহজে গ্রাহ্য হওয়ায় 'কলৌ পরম উপায়' বলা হইয়াছে। নামসংকীর্তন সর্বোৎকর্ষের সহিত সর্বযুগেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তথাপি কলি ব্যতীত অন্য যুগে এমন কি বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরান্ত কলিতে শ্রীগৌর আবির্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবস মধ্যে মাত্র একবার) কেবল কতিপয় পরম ভাগবত ব্যতীত আপামর সাধারণের গ্রহণীয় হয়েন না। কেবল কলিযুগ-বিশেষেই উহা যুগধর্মরূপে সাধারণ্যে গ্রহণীয় হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎ-প্রশংসয়েতি স্থিতম্।" [ভক্তি সন্দর্ভঃ (২৭৩)] অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্তন সর্ব যুগে সর্বাভীষ্ট প্রদানে সমানই সমর্থ, তবে এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপা-সাপেক্ষে উহা গ্রহণীয় হওয়ায় বিশেষরূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। তাই সর্বদোষযুক্ত কলিতে, সত্যাদি যুগের ন্যায় কঠোর সাধনার (তপ, যোগ, ধ্যান প্রভৃতির) পরিবর্তে সহজ-সাধ্য উপায় হিসাবে ভগবন্নাম সমাশ্রয়ে পরম প্রয়োজন যাহাতে সেই 'প্রেমভক্তি' লাভ করা যায়। ইহাই এই যুগের একমাত্র মহৎ গুণ।

স্মরণ রাখিতে হইবে হরিনাম বিনা জ্ঞান যোগ তপ ইত্যাদি কোন সাধনই বর্তমান কলিযুগে ফলপ্রদ নহে ? সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য বা উপেয় অর্থাৎ রাগভক্তির সীমা (ব্রজপ্রেম) যাহা, তাহা এই সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম সাধন বা উপায় হইতে লভ্য হইয়া থাকে। অপর সাধ্য বা প্রয়োজন এই নামসঙ্কীর্তনের আনুষঙ্গিক গৌণ-ফলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা পরম প্রয়োজন তাহা পাইলে অন্য প্রয়োজন বা সাধ্যের আবশ্যক হয় না। উহার পরম উপায় বা সাধন হইতেছে শ্রীনামসঙ্কীর্তন। তবে যদি অন্য সাধ্য বা প্রয়োজন প্রাপ্তির জন্য কাহারো আকাঙ্খা থাকে, শ্রীনাম যুগধর্ম হওয়ায়, তাহার পক্ষেও কর্তব্য

১। গ্রন্থকার কৃত 'বৈজয়ন্তী প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে 'ফাল্গুনী পূর্ণিমা' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইবে নামসংকীর্তনের সহযোগে উহার সাধন করা। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—"অতএব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।" [ভক্তি সন্দর্ভঃ (২৭৩)] অর্থাৎ কলিযুগে কাহার পক্ষে অন্য কোন বিষয় প্রাপ্তি যদি কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা ইহার (নাম-সংকীর্তনের) সহযোগে করণীয়। এই হেতু শাস্ত্রের ব্যবস্থা "সর্ব্বকার্য্যেসু মাধবম্"—সকল কাজেই শ্রীমাধব স্মরণীয়।

শ্রীনামের সংযোগ ব্যতীত জ্ঞান যোগাদি কোন সাধনাই ফলপ্রদ হয় না। দোষদুষ্ট যুগপ্রভাবে দেশ কাল পাত্র ও উপকরণাদি বিষয়ে অশুদ্ধতা ও বিবিধ ছিদ্রত্ব বিদ্যমান। এ'কারণে উহাদের সংযোগে সাধিত যাগযজ্ঞ তপ তীর্থাদি সাধনসকল স্বতঃই ফলপ্রসু নহে। উক্ত সাধন-সকলের সহিত শ্রীহরির নাম সংযুক্ত হইলে, সেই শ্রীনামের গৌণফলবশতঃ সকল অশুদ্ধতা ও ছিদ্রতা নির্দোষত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতএব অপরাপর সাধনপ্রসূত অভিপ্রেত ফললাভে শ্রীনামেরই অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন হইতে দেখা যায়। সুতরাং নামসংকীর্তন পরম উপেয় বা প্রয়োজন প্রাপ্তির পরম উপায় বলিয়া তৎসকাশে অপর সকল উপেয় প্রাপ্তির উপায়, 'সাধন মহিমায়' অতি সামান্যই বুঝিতে হইবে। সর্বশাস্ত্রেই ইহা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীত কোন কথা কোন শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায় না। অর্থাৎ নামমহিমাকে অপর কোন শুভক্রিয়াদি বা সাধন হইতে কুত্রাপি ন্যূন হইতে দেখা যায় না। বরং তাহার পরম উৎকর্ষের বিষয় ও অসম-অনূর্দ্ধ মহা-মহিমাই সর্বত্র পরিগীত হইয়াছে।

কেবল মহিমাধিক্যেই নয়, শ্রীনাম স্বয়ং অঙ্গী সাধনরূপে বিদ্যমান থাকিয়া অপরাপর ভক্ত্যঙ্গ সকলের উদ্গম করাইয়া থাকেন। নামাশ্রয় হইতে পাপনাশ ও অবিদ্যাদি বিদূরিত হইয়া চিত্তশুদ্ধির পথে ভক্ত্যঙ্গ সকলের অর্থাৎ নববিধা ভক্তির ক্রমোন্মেষের পর প্রেমভক্তি লাভ হয়। ভক্ত্যঙ্গ হইতেই সাধনাঙ্গের আদিতে কারণরূপে ভক্ত্যঙ্গ-সকল থাকিলেও মূল কারণরূপে শ্রীনামেরই বিদ্যমানতা সূচিত হইতেছে। চরিতামৃতে তাই উক্ত হইয়াছে,—

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গম।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৩.২০.১০-১৩)

সকল ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি যে বেদে নিহিত, সেই বেদের উৎপত্তি যখন শ্রীনাম হইতে, তখন সেই নামের সহিত আর কোন্ শুভ ক্রিয়াদির তুলনা হইতে পারে ! অধিক কথা কি—তুলনা করিতে যাইলেই নামাপরাধ সংঘটিত হইবে। অন্য ক্রিয়াদির সহিত তুলনা চিন্তন একটি নামাপরাধ বলিয়া শাস্ত্রে সাবধান করা হইয়াছে।

এইহেতু এক নাম হইতেই সকল ধর্ম-কর্ম-যাগযজ্ঞাদি জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সর্ব

শুভ সাধন, এমন কি বেদাধ্যয়ন পর্যন্ত সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সপ্রশংস উক্তি—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।।
নিরন্তর কর তুমি চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন।। —ইত্যাদি।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.১১.১৭৫-১৭৬)

তাই বেদাদি শাস্ত্রেও শ্রীনামকে পরম আশ্রয় এবং পরম উপায় বলা হইয়াছে। "নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।"—(কলিসন্তরণোপনিষদ্) অর্থ,—সর্ববেদে শ্রীনামসংকীর্তন হইতে পরতর (শ্রেষ্ঠ) উপায় আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

শাস্ত্র ও বিদ্বদনুভব প্রমাণে নামী ও নাম অভিন্ন বলিয়াই নামীর সর্বশক্তি নামে নিহিত আছে—ইহা কলিযুগ পাবনাবতার ছন্নহরি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ উক্তি হইতেই জানা যায়। যথা,—

"নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কাল। (শিক্ষাষ্টক-২)

অর্থাৎ,—(জীবের অভিরুচি অনুরূপ) শ্রীভগবান্ নিজেকে বহুবিধ নামরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, আর প্রকাশ করিয়া তদীয় সকল শক্তিই ঐ নামসকলে নিহিত করিয়াছেন। আর ঐ নামের নিয়মিত স্মরণে দেশকালাদির কোন বিচার রাখেন নাই। (অর্থাৎ সকল বিধিনিষেধের অতীত শ্রীনাম। নাম সম্বন্ধে সর্বৈব বিধি।)

এই কারণে নামী হইতে যে কার্য সিদ্ধ হয়, নাম হইতেও নামীকে অপেক্ষা না করিয়াও তাহা সম্ভব হয়। নাম নামীকে নামাইয়া আনিয়া কার্য সিদ্ধি করেন (বলাৎ নাময়তি ইতি নাম) এ'রূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না।

অন্যান্য সাধ্য ও সাধন পরস্পরে ভিন্ন বলিয়া, সাধ্য লাভে সাধন পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবন্নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায়, শ্রীভগবন্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম পরমসাধ্য ও পরম সাধনরূপেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। "তত্রাপি সর্ব্বেষামেব পরম সাধনত্বেন পরম সাধ্যত্বেন চোপদিশতি। এতন্নির্বিদ্যমানানাম্—" (শ্রীভাগবত—২.১.১১) এই হেতু কি নিত্যসিদ্ধ, কি মুক্তকুল, কি সিদ্ধ, কি মোক্ষার্থী, কি বিষয়কামী—সকলের পক্ষেই সর্বভাবে শ্রীনাম অপরিহার্য জানিতে হইবে।

এই শ্রীকৃষ্ণনাম পরমসাধ্যরূপে শ্রীনারদাদি মুক্তকুলের বীণাযন্ত্রাদিকে উজ্জীবিত করিয়া সুধোর্মিমালার ন্যায় নিরন্তর মাধুর্যরাশি বিস্তারপূর্বক ত্রিলোক সম্মোহিত ও সুপবিত্র করিতেছেন। সেই শ্রীনামই আবার পরম সাধনাকারে কৃতপাপী, দুরাচারী,

নিন্দুক, পাষণ্ড ও পতিতদিগেরও পরিত্রাতারূপে মরজগতে অমৃতত্ব প্রদান করিয়া সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবসমষ্টির প্রতি স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক উপদিষ্ট ভাগবতধর্মরূপ করুণার আহ্বান-বাণী প্রদত্ত হয়, ব্রহ্মার দিবসের প্রায় মধ্যবর্তীকালে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের মতই পূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত সেই স্বয়ং ভগবান্ জীবজগতের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইয়া, নবনীত হইতে নিষ্কাশিত হবির ন্যায় পূর্বোপদিষ্ট সার সম্পদ—'ব্রজপ্রেম' ও তৎপ্রাপ্তির পরম উপায়—'কৃষ্ণনাম' জগতে প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ ও নির্বাধে যথেচ্ছরূপে প্রদান করিয়া এই কলিযুগকে সর্বযুগ হইতে পরম ধন্য করিয়া থাকেন।

বেদগুহ্য ভাগবতধর্মেরও অভ্যন্তরে—আরও নিগূঢ়রূপে সন্নিহিত এই 'প্রেমধর্ম' এবং তৎপ্রকাশ ও প্রদানের একমাত্র অধিকার যাঁহার—সেই রসরাজ মহাভাব মিলিত—মূর্তিমন্ত প্রেমস্বরূপ প্রচ্ছন্ন—শ্রীগৌরকৃষ্ণ, ইহাই হইতেছে বেদের গহন-প্রদেশে নিহিত সর্ব নিগূঢ় তত্ত্ব[১]। সুতরাং নিখিল ভগবৎ স্বরূপের মধ্যে, স্বয়ং ভগবানের কেবল এই সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাব-বিশেষটিই সর্বকান্তা—শিরোমণির ভাব-কান্তি দ্বারা 'ছন্নত্ব' নিবন্ধন "ছন্নঃ কলৌ যদ্ভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।" (শ্রীভাগবত—৭.৯.৩৮) ইহা যেমন সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য বিষয়ই হইয়াছে, তেমনি আবার কোন ভাগ্যে ইহা বুঝিলে, ইহার পর বুঝিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। পরম সাধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম হইতে পরম সাধ্যরূপ যে বস্তুটি লভ্য হইবার কথা একান্ত 'ছন্নত্ব' নিবন্ধন তদ্‌বিষয়ে বলা যায়—

আধ্যাত্মিক জগতে ইহার পূর্বে পরতত্ত্বের অবধি এবং সাধ্যের অর্থাৎ প্রয়োজন বা অভীষ্ট বিষয়ের সংবাদ যে পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌররূপটি তাহারও ঊর্দ্ধ সীমায় নিরতিশয় নিগূঢ়রূপে অবস্থিত হওয়ায় জগতের পক্ষে তৎকালে ইহা একান্ত দুর্জ্ঞেয় থাকিবারই কথা। তাই দেখা যায়, এ'যাবৎ জগতে আবিষ্কৃত সাধ্যের অবধি যাহা, তাহারও অনেক উপরে পরতত্ত্বের সীমা যে পর্যন্ত প্রসারিত,—সেই সীমাপ্রাপ্ত নিজতত্ত্বটি শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক শ্রীরায়রামানন্দের সহিত সাধ্য নির্ণয় প্রসঙ্গে যে ভাবে জীবজগতের গোচরীভূত করা হইয়াছে, তাহা আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষে এযাবৎ অপ্রকাশিত এক অভিনব সংবাদ। এ'স্থলে তদ্বিষয়ে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতেছে।

প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৫৪)

'পঢ় শ্লোক' বলিতে শাস্ত্রীয় শ্লোকাদির দ্বারা প্রমাণিত এমন সাধ্য বিষয়েই

১। 'অশেষ শ্রুতিগুঢ়বেশং—' (চৈতন্যচন্দ্রামৃত-৫৭) অর্থাৎ অশেষ শ্রুতিসকলের মধ্যে যিনি নিগূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। কিম্বা 'গতিরতিশয়েনোপনিষদাং—' (শ্রীরূপপাদ কৃত স্তবমালায় চৈতন্যাষ্টক-১.২) অর্থাৎ উপনিষদ্‌সকলের চরমগতি যে স্থানে সীমাপ্রাপ্ত।

শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। যেহেতু পরমার্থ-বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, ('শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ—' ব্রহ্মসূত্র—১.১.৩)[১]

সুতরাং অশাস্ত্রীয় স্ববুদ্ধিকল্পিত কোন কথা তিনি যে শুনিতে চাহেন নাই, উক্ত বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে।

তদীয় শক্তি সঞ্চার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীরামানন্দরায় শাস্ত্রানুসারেই যথাক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৫৪) যথার্থপক্ষে ইহা সাধ্য না হইয়া কোন সাধ্য-বিশেষের সাধনা মাত্র হওয়ায়, ইহা বহিরঙ্গই হইল। তাই—

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৫৫)

মলয়ানিল সেবনার্থীর পক্ষে যেমন তালবৃন্ত ব্যজন দ্বারা পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ জগতে কল্পকাল ধরিয়া অপ্রকাশিত যাহা, সেই সাধ্যবস্তুর সীমা জানিবার ছলে যিনি উহা জীবজগৎকে জানাইতে আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণে তাঁহার চিত্ত কি পরিতৃপ্ত হইতে পারে ? তাই,—

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৫৭)
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।

অর্থাৎ আরও আগাইয়া চল,—আরও উপরের কথা বল—রায়।

তখন রামানন্দ রায়—মিশ্রাভক্তি প্রভৃতির বাহ্যস্তর অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা, প্রেমভক্তির কথা ও তৎপরে—'দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৬০) বলিয়া উল্লেখ করিলেন। তৎশ্রবণে—

প্রভু কহে এহো হয়, আগে কহ আর।

এখন নিরুপাধিক শুদ্ধাভক্তির স্তরে প্রবেশ করায়, ইহাকে আর 'এহো বাহ্য' না বলিয়া 'এহো হয়' বলিয়াই অনুমোদন করিলেও কিন্তু তাঁহার অভীষ্টস্থলে পৌঁছাইবার ব্যাকুলতার এখনও বিরাম নাই ;—তদ্দর্শনে রামরায় কিছু বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে আসিল সখ্য প্রেমের কথা ও তদন্তর বাৎসল্যপ্রেম। এই উভয়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভু—'এহোত্তম' বলিয়াই সমর্থন করিলেন। তথাপি প্রশ্নের বিরাম ঘটিল না। রামরায় আরও বিস্মিত হইলেন। প্রভু কহিলেন— 'আগে কহ আর।' আরও আরও আগাইয়া চল। তখন—

'রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৬৩)

তদন্তর সেই কান্তাপ্রেমের সীমা—ব্রজগোপিকাগণের নিরুপাধিক পরম বিশুদ্ধ

১। "ঔপনিষদং পুরুষং—" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—৩.৯.২৬)

প্রেমমহিমাদির বিষয় কীর্তন করিয়া পরে বলিলেন,—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে।।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৬৯-৭১)

জগতে অদেয় হইলেও এ'যাবৎ প্রকাশিত সাধ্যের সীমা এই পর্যন্তই—ব্রজগোপিকার প্রেম অবধিই পর্যবসিত ছিল। সুতরাং রামরায় মনে করিয়াছিলেন, এইখানেই সকল প্রশ্নের অবসান ঘটিবে। কিন্তু জগতের যাহা অগোচর ছিল,—আধ্যাত্মিক জগতের সংবাদে এ'যাবৎ যাহা প্রচারিত হয় নাই, সেই অপূর্ণতা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে যিনি স্বয়ং প্রপঞ্চে প্রকটিত, তাঁহার প্রশ্নের এখানেই অবসান প্রাপ্ত হইতে পারে কি ? তাই ব্রজরামাগণের প্রেম-মহিমা শ্রবণে পরিতৃপ্ত ও পুলকাঙ্গ হইয়াও পুনরায় সসঙ্কোচে কহিলেন।

প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৭৩)

তৎশ্রবণে রামরায় বিস্ময়ে একান্তই আভিভূত হইলেন। ছন্ন সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৭৪)

তিনি তখন বুঝিলেন এই প্রশ্নকারী জগতের কোন লোক নহেন। প্রশ্নের গতি যে'দিকে চলিয়াছে,—শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন-কর্তাই বোধ হয় স্বয়ং তাহার উত্তর হইবেন,—

অতঃপর যেন প্রশ্নকর্তার ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়াই শ্রীরামরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।

জগতে যাহা অনাবিষ্কৃত ছিল, রামরায় তখন সেই সীমা মধ্যে সমাগত হইয়াছেন। যে বিষয়ে বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন,—'রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে ? তন্মধ্যে প্রথমে শ্রীরাধিকার প্রেমের অসমোর্দ্ধ মহামহিমার কথাই উঠিয়াছে। রায় বলিলেন,—'ত্রিজগতে নাহি রাধা প্রেমের উপমা।' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৭৯) ইহার পর তদ্বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা করিলেন। যে কান্তাপ্রেমের মূর্তিস্বরূপ শতকোটি গোপিকা, একলা রাধিকার প্রেমরসাস্বাদনে তাহা সাধিত হইয়াছে। প্রভুর প্রেরণায় রায়ের মুখে

অমৃতের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে মহাপ্রভু পরিতুষ্ট হইলেন। অনাবিষ্কৃত অপর বিষয়গুলিও জগতে প্রকাশের নিমিত্ত আরও শ্রবণের ইচ্ছা জানাইলেন,—

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকার স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত– ২.৮.৯১)

এই প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসরাজ-স্বরূপ ও উহার আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তাকর্ষক—মহা মাধুর্য, শ্রীরাধিকার মহাভাবস্বরূপ ও উহার প্রেমসীমা, 'রস' ও প্রেমের চরমোৎকর্ষ—ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল এবং ইহাই পূর্বে জগতের অজ্ঞাত ছিল।

শ্রীরায়রামানন্দ এ সমস্ত বিষয়ই যে প্রভুর প্রেরণাশক্তি দ্বারাই বর্ণনা করিতে সমর্থ হইতেছেন, ইহা তদীয় নিজোক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে ; —"রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি। তুমি যে কহাও সেই কহি আমি বাণী।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৯৩) "মোর জিহ্বা বীণা যন্ত্র তুমি বীণা ধারী। তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১০৫)

রায় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ও শ্রীরাধিকার প্রেমসীমা কথিত হইলে, তখন উভয়ের প্রেম-বিলাস শ্রবণের ইচ্ছা জানাইলেন।

প্রভু কহে জানিল রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৪৬)

তখন রামরায়, শ্রীবৃন্দাবন-নিকুঞ্জে সেবিত ধীরললিত নায়করূপে—নব-কিশোর—মূর্তিমন্ত সাক্ষাৎ শৃঙ্গার-রসরাজ-রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব স্বরূপিণী রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রেম-বিলাস বার্তা, পূর্বলীলায় শ্রীবিশাখারূপে যে পর্যন্ত অনুভব ছিল, প্রভুর প্রেরণায় সেই পর্যন্ত বলিয়াই নীরব হইলেন। ইহার পর আর কিছু সাধ্যের সীমা আছে কিনা, তাহা এখন পর্যন্ত তিনি অজ্ঞাত।

এইবার কনককান্তি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু, বেদের নিগূঢ়তম সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্ব 'স্বরূপ' সেই 'নিজতত্ত্ব'টি জীব-জগতে প্রকাশ করিবেন,—যাহার জন্য পূর্ববর্ণিত সকল প্রশ্ন ও উত্তরের উদ্ভাবনা। তাই প্রভু এখানেই বিরত না হইয়া পুনরায় কহিলেন,—

প্রভু কহে এই হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৪৯)

উভয়ের প্রেমবিলাস অবধি যাহা রামরায় এ পর্যন্ত বলিয়াছেন, তাহার পর আর কিছু বলিবার পক্ষে তাঁহার বুদ্ধির সামর্থ্য নাই। ইহাই প্রভুকে নিবেদন করিয়াও, প্রভুরই প্রেরণায় পুনরায় কহিলেন,—

যে বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৫০)

পূর্বোক্ত প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষ বা পরিপক্কাবস্থায় ব্রজনায়ক-নায়িকার মধ্যে ভ্রমজনিত যে এক পরস্পর আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়, তাহারই নাম 'বিবর্ত'। (তৎকালে সেবাপরা সখিগণ কর্তৃক উভয়ের দেহভেদ লক্ষিত হইলেও) উভয়ের চিত্তবৃত্তি যেন নিষ্পেষিত হইয়া একীভূত প্রাপ্ত হওয়ায়, তখন কে রমণ, কে রমণী এই ভেদবুদ্ধিও তিরোহিত হইয়া যায়। রায় কহিলেন প্রেমবিলাসের পর উহার বিবর্ত্তরূপ উভয়ের যে একটি একত্ব বা অদ্বৈত ভাব আছে, তাহা শ্রবণে তোমার সুখ হয় কি না হয় ; আমি বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীরামরায় কথিত উভয়ের এই ঐক্যাবস্থা—ইহা জীব-ব্রহ্মৈক্যরূপ্প সাযুজ্য কিম্বা ঈশ্বর সাযুজ্যের ন্যায় অদ্বৈতভাব নহে। ইহা তাহা হইতে বহু বহু উপরের কথা। ইহাতে জীবের কোন স্থান নাই। একমাত্র রসস্বরূপ পরতত্ত্বের ই পরম রসাস্বাদ-নের পরমাবস্থা ইহা। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্—সাক্ষাৎ রসরাজমূর্তি-রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় স্বরূপভূতা হ্লাদিনী মহাশক্তির পরম সার—মহাভাব মূর্তিমতী রাসেশ্বরী-শ্রীরাধিকার প্রেমবিলাসের চরমাবস্থার একতা। যাহা জীবলোকের এ'যাবৎ অজ্ঞাত ও অপ্রকাশ্য বিষয়। কৃষ্ণকথার আগ্রহ দেখিয়া প্রথমতঃ রামরায়, প্রভুকে পরমভক্ত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। ভক্তের নিকট অদ্বৈত কথা সুখকর না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাই রায় কহিলেন,—"তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।" প্রভু সাধ্যের এই শেষ কথাই শুনিবার ছলে, জগৎকে শুনাইতে আসিয়াছেন। প্রভুর সম্মতি জানিয়া তখন, রামরায় উক্ত বিবর্তভাবের প্রকাশক স্বরচিত একটি গীত গান করিয়া প্রভুকে শ্রবণ করাইলেন।

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৫১)

প্রেমের চরম পরিণতি যে মহাভাব,—শ্রীরাধিকাই হইতেছেন সেই মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ। প্রেমের সেই চরমোৎকর্ষ অবস্থার মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকাই একমাত্র অধিকারী। আবার সেই মহাভাবের চরম বিকাশ হইতেছে—'মাদনাখ্য মহাভাব'। যদ্দ্বারা কেবল শ্রীরাধাই পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবিকা ও কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদিকা হইয়া থাকেন। যাহা হইতে শৃঙ্গার-রসের ভাব-সমষ্টি যুগপৎ উদ্‌গম করাইয়া পরমোল্লাসের উন্মাদনা আনয়ন করেন বলিয়া, এই মাদনাখ্য মহাভাবকে 'সর্বোভাবোদ্গমোল্লাসী' বলা হয়। এই হেতু চরম মিলনান্দের মধ্যেও সুতীব্র বিরহ যুগপৎ এই উভয় রসের অভিব্যক্তি হইয়া, যুগলিত শ্রীরাধামাধবকে মধুর রসের এক পরম চমৎকারিতা প্রদান করিয়া থাকে। যাহা লৌকিক জগতের অচিন্তনীয় বিষয়।

এই ভাবোল্লাসের পরিপক্ক বা চরমাবস্থায় ব্রজকিশোর-কিশোরীদ্বয়ের চিত্তবৃত্তি একীভূত হইয়া, তৎকালে ভ্রমজনিত আত্মবিস্মৃতি-নিবন্ধন পরস্পর কে রমণ, কে রমণী এই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া ভাব বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। ইহাই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। ব্রজলীলায় প্রেমবিলাস এই বিবর্ত পর্যন্তই সীমাপ্রাপ্ত। তদবস্থায় যুগলিত শ্রীরাধামাধবের চিত্তবৃত্তি একতা প্রাপ্ত হইলেও তখন উভয়ের দেহভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এই হেতু বিশাখারূপে পূর্বলীলায় দৃষ্ট উক্ত বিবর্ত ভাবটি শ্রীরামরায় স্বরচিত গীত দ্বারা প্রকাশ করিলেন। তখন প্রভু কর্তৃক স্বহস্তে রায়ের মুখাচ্ছাদন করিবার তাৎপর্য এই যে, —ইহার পর শ্রীরামরায় যদি আর কিছু বলিতে অগ্রসর হয়েন—তাহাই হইবে স্বয়ং প্রশ্নকারীর নিজ স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রজের প্রেমবিলাস-বিবর্তের পরিণতি যাহা—সেই ব্রজকিশোর যুগলের কেবল চিত্তেরই নহে,—উভয়ের দেহভেদ পর্যন্ত বিলুপ্ত অবস্থা যাহা,—'তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং'—সেই রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ—শ্রীগৌরসুন্দর।

সাধ্যের অবধির কথা বলা হইলেও তখনও শ্রীরায় কর্তৃক তৎসাধন বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। এই অবস্থায় প্রশ্নকারীর স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িলে রামরায় আনন্দাতিশয্যে আর কিছুই বলিতে পারিবেন না, সম্ভবতঃ ইহাও বিবেচনা করিয়া, তখনই স্বীয় তত্ত্বটি প্রকাশ হইতে না দিয়া, প্রভু নিজ শ্রীকরপল্লবে রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন। পরে বলিলেন,—

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলু নিশ্চয়।।
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.১৫৭-১৫৮)

অতএব 'মহাভাব' ব্যতীত কৃষ্ণমাধুর্যের সম্পূর্ণ অনুভূতি ও আস্বাদন অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হয় না। সমূর্ত মহাভাবই হইতেছেন—শ্রীরাধিকা। সুতরাং মহাভাব অর্থাৎ রাধিকার সহিত তাদাত্ম্যরূপে একীভূত হইয়া, তদাশ্রয়েই কেবল রসসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বমাধুর্যাদির অনুভূতি ও আস্বাদনরূপ অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ হইতে পারে। এইহেতু মহাভাবময়ী রাধাসহ কেবল চিত্তের একতা সম্পাদনেই নহে,—ব্রজের প্রেমবিলাস-বিবর্তের পরিণতিতে পরস্পর উভয় দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে আলিঙ্গিতরূপে একীভূত হইয়া, যখন কে কান্ত, কেই বা কান্তা ভ্রমজনিত এই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত ও কৃষ্ণ রাধাময় এবং রাধা কৃষ্ণময়—এইরূপ উভয়ের এক নিবিড় ঐক্য সাধিত হয়,—এই রসরাজ মহাভাব দুই একরূপে পরিণত—তপ্তকাঞ্চন বিনিন্দিত কান্তি শ্রীগৌর-সুন্দররূপেই, তৎকালেই কেবল পূর্বে অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করিবার ও তদানুষঙ্গিক রূপেই

তৎকালীন সর্বজীবে অজস্রভাবে—শ্রীনাম ও প্রেম প্রদান করিবার যাহা কিছু অন্তরায় অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইহেতু প্রতিকল্পে একবার করিয়া জীব-জগতে প্রেমধর্মে প্লাবিত করিবার পক্ষে কৃষ্ণ-জলধির অপূর্ণ বাঞ্ছা সূক্ষ্মভাবান্বিত ও প্রেয়সীর বিদ্যুৎপ্রভামণ্ডিত গৌরজলধররূপেই পূর্ণ করিবার যোগ্যতা ধারণ করেন।

"সর্ব্বেষাং মার্গাণাং তারতম্য-জ্ঞানেন স্বমার্গোৎকর্ষজ্ঞানং ভবতি। (ক্রমসন্দর্ভ—১১.১৪.৩১) সকল পথের তারতম্য-জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই নিজ ভজনপথের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবদুক্তি—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।। (গীতা—৭.২৬)

অর্থাৎ,—হে অর্জ্জুন ! আমি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীকে জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না। —এই বাক্যটি অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে একমাত্র সর্বজ্ঞতাস্বরূপে স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অপর কাহারো পক্ষে—সর্ব ধর্মের তত্ত্ব, শক্তি ও রসের তারতম্য জানা সম্ভব নয়—কারণ স্বয়ং ভগবান্ই সর্বকারণের কারণ, সর্বাদি ও সর্বরস।

তাই 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' (গীতা—৪.৮) এই বাক্যে যুগ শব্দে 'কল্প' অর্থ বিধায়—সেই স্বয়ং ভগবানই আবির্ভাববিশেষে ব্রহ্মার দিনের মধ্যে একবার—প্রকৃষ্ট আত্মধর্মের সম্যক্‌রূপে স্থাপনা করেন।

শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের ও ধর্মের ক্রমোৎকর্ষের বিচারে স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন যে—বর্ণাশ্রমধর্ম হইতে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি পর্যন্ত— 'এহো বাহ্য', জ্ঞানশূন্যাভক্তি হইতে দাস্যপ্রেম পর্যন্ত—'এহো হয়', সখ্যপ্রেম হইতে বাৎসল্যপ্রেম পর্যন্ত—'এহোত্তম', তৎপরে ব্রজকান্তা-প্রেমের সাধ্যাবধি ; তাহারও উপরে শ্রীরাধার প্রেম এবং তদনন্তর প্রেমবিলাস-বিবর্তকে সাধ্যবস্তুর চরমাবধিরূপে নির্ণয় করিয়া পরিশেষে, সেই প্রেমবিলাস-বিবর্তের মূর্ত্ত স্বরূপে—"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—নিজ স্বরূপটি জগতের সৌভাগ্যাকাশে উদিত করাইয়াছেন। নিজ পরমবদান্যস্বভাবে, দাস্যবাৎসল্যাদিভাবের অগোচর রাগাত্মিকা সখীসাধ্য ব্রজকিশোর-যুগলের কুঞ্জসেবারূপ পরম সাধ্যবস্তুও সেই রাগাত্মিকা ভক্তির আনুগত্যময় সাধনের মাধ্যমে—যাহার পরম পরাকাষ্ঠা রাধাদাস্যসীমায় পর্যবসিত—তটস্থাশক্তিস্থানীয় ক্ষুদ্র জীবেরও করতলগত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সংকীর্তন-যজ্ঞে সুমেধাগণ কর্তৃক সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসহ স্বয়ং ভগবানের এই পরতত্ত্বসীমা স্বরূপের উপাসনার বিষয়ই কথিত হইয়াছে।

নির্বিশেষভাবে রসের আস্বাদন হয় না। প্রেমের মধ্যেও বিচিত্র বিলাস না থাকিলে

রসাস্বাদনের উৎকর্ষতা সাধিত হয় না। বিচিত্রতার মধ্যে তাই তারতম্য আছেই। নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা এই তারতম্য অনুভূত হয়।

"কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থা হঞা বিচারিলে আছে তর-তম।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৮.৬৭)

শ্রীচরিতামৃতে আবার সেই সকল বিভিন্ন রসের এক অপূর্ব সমন্বয় কৌশলও দেখা যায়। যাহার আবিষ্কর্তা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু যথা—

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়।।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।।
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে।। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২.৬৮.৫-৭১)

স্বয়ং রসরাজ যে রসকে গুণাধিক্য ও স্বাদাধিক্যের কারণে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, যে রসে রসিকশেখরের পরিপূর্ণ প্রীতিময়তা ও বশীকারিতা সাধিত হয়, যে রসের উল্লাসে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি স্বীয় পূর্ব প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইয়াছে এবং স্বয়ং রসিকশেখর যে সেবারস আস্বাদনান্তে ইহার প্রতিদান দিবার অসামর্থ্যে নিজেকে ঋণী অভিমান করিয়াছেন—সেই ব্রজগোপিকাগণের প্রেমসেবা-রসই পরম উন্নত কক্ষায় অবস্থিত। এইরূপ ভাবে যে রস সকলের অন্বয় বা সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে—ইহাই রস সমন্বয়।

বেদগুহ্য ভাগবতধর্মেরও অভ্যন্তরে—আরও নিগূঢ়রূপে সন্নিহিত এই 'প্রেমধর্ম' এবং তৎপ্রকাশ ও প্রদানের একমাত্র অধিকার যাঁহার—সেই রসরাজ মহাভাব মিলিত—মূর্তিমন্ত প্রেমস্বরূপে প্রচ্ছন্ন—শ্রীগৌরকৃষ্ণ, ইহাই হইতেছে বেদের গহন-প্রদেশে নিহিত সর্বনিগূঢ়তম তত্ত্ব—"অশেষ শ্রুতিগূঢ়বেশং—" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৫৭)

শ্রীভাগবতে শ্রীরাসলীলায়, 'ন পারয়েঽহং—' (১০.৩২.২২) ইত্যাদি শ্লোকে স্বয়ং

ভগবান্ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীপ্রেমের নিকট ঋণী থাকিবার কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। সেই সূত্র বা বীজের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে নিহিত রহিয়াছে—শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ উক্ত ঋণ পরিশোধ-লীলা। যাহার পরম নিগূঢ় রহস্য প্রায়শঃ জগতে অপ্রকাশ ছিল।

সে রসরাজ-মহাভাব মিলিত গৌরকৃষ্ণরূপ মূর্তিমন্ত প্রেমস্বরূপের অবতার-কালেই, স্বীয় মাধুর্য ও রসবিশেষ আস্বাদনের আনন্দাতিশয্যে নিজ পরম ঔদার্য্য স্বভাবের পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায় ['ঔদার্যেণ চ কোটি কোটি গুণিতং কল্পদ্রুমং হ্যপ্নয়ন্।' (চৈতন্যচন্দ্রামৃত—৯২)] সেই অদেয় ব্রজপ্রেম, দেয় অদেয় পাত্রাপাত্র কোন প্রকারের বিচার না করিয়া, কেবল 'দিবমাত্র' প্রতিজ্ঞায়, কল্পতরু হইতেও অধিক উদারতায় উহা তৎকালীন আচণ্ডাল সর্বজীবে এমনকি স্থাবর জঙ্গমে পর্যন্ত প্রদান করিয়াছেন।

জগতে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় ও দার্শনিক সম্প্রদায়েরই মূল আকাঙ্খিত বস্তু আনন্দ এবং নির্বাণ বা মুক্তিতেই সেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত রসমূর্তিধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'ধর্মে বা দর্শনে, আনন্দেরও যাহা আশ্রয়, সেই রসসাক্ষাৎকারই প্রয়োজন এবং পরতত্ত্বসীমার প্রীতিতেই রসানুভবের পরাকাষ্ঠা। পরতত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে তত্তৎ ভগবৎস্বরূপের ভক্তগণেরও প্রীতির ও রসের তারতম্য হয়। 'কুসুমে মধুর সঞ্চার যেমন ভ্রমরের প্রয়োজনেই, সেইরূপ ভক্ত হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার কেবল প্রেমমধুপ ভগবানেরই প্রয়োজন বা প্রীতিসাধন নিমিত্ত—ভক্তের স্বপ্রয়োজনে নহে।' (শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা)

রসরাজ-মহাভাব মিলিত তনু সর্বরসাম্বুধি শ্রীমদ্ভাগবত রসমূর্তি শ্রীগৌরহরি স্বলীলায় সমস্ত রসের বিচিত্র বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই রসিকশেখরত্ব, ব্রজগোপীপ্রেমেই রসোল্লাস পরাকাষ্ঠা, শ্রীগৌরপ্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতেই সর্বভক্তি-রসের বিকাশ। এ'জন্য তাঁহারা নিখিল আনন্দের আনন্দস্বরূপ পরম রসময়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তাই শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—দ্বাদশ রসই যাঁহাতে বর্তমান, সেই অমৃত বা পরমানন্দই যাঁহার মূর্তি তিনিই অখিলরসামৃতমূর্তি—রসরাজ। সেই রস মহাভাব-স্বরূপা হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা বলিয়া অমৃত—(পরমানন্দ স্বরূপ)। শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের (বিজ্ঞানে) মূল সেই রসরাজ মহাভাব মিলিত তনু স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

তাই সেই অদ্বিতীয় কল্পাবতার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষের অসাধারণ স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণময় নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলাগর্ভ একটি বন্দনা শ্রীরূপের শ্রীমুখপদ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। (—ইহারই উল্লেখে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার টানিতেছি[১]।)

১। উদ্ধৃতাংশ শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ) গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"

যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পূর্ণ চেতনা দানকারী) যাঁহার রূপ গৌরকান্তি (মহাভাবের বা পরমাদ্ভুতরসের মূর্তবিগ্রহস্বরূপ—অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর) যাঁহার গুণ মহাবদান্যতা (স্বপ্রিয়তম বস্তু উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-সম্পত্তি আপামরে বিতরণ হেতু), যাঁহার পরিকর-লীলা-বৈশিষ্ট্যে ব্রজলীলার ও অন্যান্য তদেকাত্ম ভগবল্লীলার পরিকরবৃন্দের একত্র সমাবেশ, যাঁহার লীলা হইতেছে অন্য ভগবৎ-স্বরূপের অপ্রদেয় যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা প্রদান, সেই কৃষ্ণকে (শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে) নমস্কার করি।

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্"—



শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা কীর্ত্তন

পরিশিষ্ট-'ক'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।।"

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়, প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।।"
(আজ) প্রাণভোরে জয় দাও,
গণের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের—প্রাণভরে জয় দাও।
প্রাণভরে জয় দাও,
জগন্মঙ্গল কৃষ্ণনামের—প্রাণভরে জয় দাও।
প্রাণভরে জয় দাও,
ভুবনমঙ্গল হরিনামের—প্রাণভোরে জয় দাও।
প্রাণ খুলে জয় দাও,
হরিবোল হরিবোল বলে—নেচে নেচে বাহু তুলে। (মাতন)
পঙ্গুর ইচ্ছা যৈছে পর্ব্বত লঙ্ঘনে,
বামনের ইচ্ছা যৈছে সুধাংশু ধারণে,
তেমতি যে ইচ্ছা নামমহিমা কীর্ত্তনে,
যাহার প্রয়াস দেখি হাঁসে সর্ব্বজনে।
তথাপি ভরসা এক হৃদয়ে আমার,
মূর্খেরও নাম গানে আছে অধিকার,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা করিয়া স্মরণ,
নামের মহিমা কিছু করিয়ে কীর্ত্তন।
সর্ব্ব শ্রোতা ভক্ত ঠাঁই এই নিবেদন,
জীবাধমের অপরাধ না করো গ্রহণ।
ভব-পারাবার হতে করিতে উদ্ধার,
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"
হরিনাম হরিনাম হরিনামই কেবল।
নাই-ই নাই-ই নাই-ই অন্য গতি, কলিযুগে নামই সম্বল।।
সম্বল কর ভাই—নাম বল মহাবল।
যার উপর নাই আর কোন বল—সম্বল কর ভাই,
কর ভাই সম্বল—নাম বল মহাবল। (মাতন)
"দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিন বার,
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেব-কার,
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয়-করণ,
জ্ঞান যোগ তপ আদি সব নিবারণ,
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার,
নাই নাই নাই তিন, তিনে এব'কার।"
নাম বিনা আর সাধন নাই রে
বিশেষতঃ এই কলিযুগে—নাম বিনে আর সাধন নাইরে,
সবা হতে বড় নাম—
সকল সাধন মাঝে—সবা হতে বড় নাম,
(বড়) সুন্দর সাধন নাম,
(বড়) সহজ সাধন নাম—
পুরাইতে জীবের মনস্কাম—সুন্দর সাধন নাম।
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন নাম—
সাধু শাস্ত্রে বিশ্বাস দিতে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন নাম।
প্রধান সহায় নাম—
মহতের সঙ্গ মিলায়ে দিতে—প্রধান সহায় নাম।
পরমবান্ধব নাম—
ভজন পথে প্রবেশাধিকার দিতে—পরম বান্ধব নাম।
ঘন বরষণ নাম—
অনর্থের আগুন নিবাইতে—ঘন বরষণ নাম।
সুদৃঢ় আশ্রয় নাম—
কৃষ্ণপদে নিষ্ঠা জাগাইতে—সুদৃঢ় আশ্রয় নাম।
মহা মহৌষধি নাম—
কৃষ্ণ ভজনে রুচি আনিতে—মহা মহৌষধি নাম।

চিন্ময় আসব নাম—
কৃষ্ণাসক্তির উদয় করিতে—চিন্ময় আসব নাম।
স্নিগ্ধ শিশির নাম—
ভাব ভক্তি অঙ্কুরিতে—স্নিগ্ধ শিশির নাম।
তপন কিরণ নাম—
প্রেম শতদল ফুটাইতে—তপন কিরণ নাম।
প্রেম সৌরভের আমন্ত্রণে—
কৃষ্ণ ভ্রমর আকর্ষিতে—কমল সৌরভ নাম।
(সাধনার) সকল স্তরেই সহায় নাম।
শ্রদ্ধা হতে প্রেমোদয় অবধি—সকল স্তরেই সহায় নাম।
কত সুন্দর সাধন নাম,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম—কত সুন্দর সাধন নাম।
বল বল ভাই অবিরাম—হরে কৃষ্ণ হরে রাম। (মাতন)
"নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার,
অনন্ত কৃষ্ণের নাম-মহিমা অপার।"
পার নাই সীমা নাই—
কৃষ্ণনামের মহিমার—পার নাই সীমা নাই,
অনন্ত অসীম তার পার নাই সীমা নাই।
"গ্রহণের কালে করিলে কোটি গাভী দান,
প্রয়াগে গঙ্গায় কল্প কাল অবস্থান,
যজ্ঞাযুত সুমেরু সমান স্বর্ণ-দান,
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান।"
কোন যজ্ঞ নহে কৃষ্ণ নামের সমান,
'সমতায়' অপরাধ শাস্ত্রের প্রমাণ,
"কোটি অশ্বমেধ সম এক কৃষ্ণ নাম,
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম।"
সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত, পাপ নাশিবার তরে
কৃষ্ণনাম সম কেহ শক্তি নাহি ধরে।
(দেখ) গৌড়-রাজ-কর্ম্মচারী সুবুদ্ধি রায় নাম,
কোন কারণে (রাজ)মহিষী তার প্রতি হৈলা বাম,
প্রাণে বধ না করিয়া এক কৌশল কৈল,

ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট জল মুখে দেওয়াইল,
নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ তিহো না দেখি উপায়,
বারানসী আইল প্রায়শ্চিত্ত অভিপ্রায়।
ধূলি ধূসরিত দেহ মলিন বদনে,
বিধান পুছিল সর্ব্ব পণ্ডিতের স্থানে,
শুনিয়া পণ্ডিতগণ কহিল তাহারে,
তপ্ত ঘৃত পান করি দেহ ত্যেজিবারে।
কেহ কহে তুষানল উচিত যে হয়,
হেন কালে কাশী আইলা গৌর দয়াময়।
প্রভুরে পাইয়া রায় নয়নের জলে,
নিবেদিলা সব বলি চরণের তলে।
শুনিয়া সকল কথা কহে ভগবান্,
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম।
"বিলাপ সম্বর রায় যাহ বৃন্দাবন,
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন,
এক নামাভাসে তব পাপ দোষ যাবে,
আর নাম হৈতে কৃষ্ণের চরণ পাইবে।"
(ও ভাই) আর কিসের বা প্রয়োজন—
পাপের প্রায়শ্চিত্ত লাগি—আর কিসের বা প্রয়োজন,
(অনুতপ্ত হৃদে) কর কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন।
পাপ যাবে প্রেম পাবে—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে (মাতন)
কোন কর্ম্ম নহে কৃষ্ণ নামের সমান,
নামাশ্রয়ে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব প্রয়োজন।।
হেন নাম জগ ভরি করিতে প্রচার,
কৃপাতে করিলা তাহা বহুত বিস্তার,
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার,
এক কৃষ্ণ-নামও দেখ অনেক আকার।
গোবিন্দ মুকুন্দ হরি পতিতপাবন,
দীনবন্ধু দয়াময় লজ্জানিবারণ,
কাঙ্গালের সখা আর করুণানিলয়,
অফুরন্ত নাম, সংখ্যা না হয় নির্ণয়।

(শ্রীহরি) ধরেছেন অনন্ত নাম—
পুরাইতে সবার মনস্কাম—ধরেছেন অনন্ত নাম,
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম—হরে কৃষ্ণ হরে রাম। (মাতন)
এক নাম হৈলে যদি সকলে না লয়,
বহুধা হইলা নাম, তাই দয়াময়,
যাহার যেমন রুচি কিম্বা বাঞ্ছা হয়,
অবাধে সে-সেই নাম লইতে পারয়।
(দেখ) পতিত যে তার তরে—পতিতপাবন,
দীনজন তরে নাম—দীনশরণ,
কাঙ্গালের সখা—নাম কাঙ্গালের তরে,
বিপদভঞ্জন—নাম বিপদ মাঝারে,
যত বাঞ্ছা তত নাম কোথায় এমন,
অপার করুণা কেহ হেরেছ কখন।
সেই ভাবেতে কৃপা করে—
যে যেভাবে ডাকে তারে—সেই ভাবেতে কৃপা করে।
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন—ভক্তবৎসল পতিতপাবন। (মাতন)
সংসার জলধি মাঝে যত জীব ভাসে,
এক এক নামের ভেলা দেখ তার পাশে।
যেই জন লয় যত্নে সে ভেলা আশ্রয়,
ভব মহাপারাবারে তার কিবা ভয়।
সে জন হেঁসে খেলে চলে যায়—
নামের ভেলা আশ্রয় কোরে—হেঁসে খেলে চলে যায়,
সংসার সমুদ্র দিয়ে—হেসে খেলে চলে যায়,
হরিবোল হরিবোল বোলে—নামের ভেলা আশ্রয় কোরে। (মাতন)
অনন্ত অশেষ তাঁর আরও কৃপা শুন,
নিজ সর্বশক্তি নামে করিলা অর্পণ।
যদি কোন ভ্রান্ত মতি করয়ে সংশয়,
গোটা কত বর্ণ নাম কিবা তাহে হয়,
নাম শুধু বর্ণ নহে, হও অবহিত,
শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তি নামেতে নিহিত,
নিজে কৃষ্ণ যাহা কিছু পারেন করিতে,
সে সকলি হয় ভাই এক নাম হৈতে।

"নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ,
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ,
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ,
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ।"
কিছু ভেদ নাই ভেদ নাই—
তিনেতে অভিন্ন ভাই,—কিছু ভেদ নাই ভেদ নাই।
একেই দেখি তিন রূপে—নাম বিগ্রহ স্বরূপে। (মাতন)
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিঁহো সর্ব্বশক্তিমান,
অচিন্ত্য তাঁহার শক্তি বেদ করে গান,
সেই অচিন্ত্য শক্তি নামের প্রত্যেক অক্ষরে,
অনুভব হয় তার সাধন যে করে।
আরও তাহার ভাই দেখহ প্রমাণ,
কৃষ্ণ নাম ভিন্ন কোন প্রাকৃতিক নাম,
আজীবন যদি কেহ জপে নিষ্ঠা করি,
এক ফোঁটা নেত্রে তার না ঝরিবে বারি,
কিন্তু কৃষ্ণ নামে দেখ কি অচিন্ত্য শক্তি,
জপিতে গাহিতে নাম উপজিবে ভক্তি।
স্পর্শমণি সম এই নামের পরশে,
অভক্তও নৃত্য করে বিপুল হরষে।
কেহ নাচে হাসে কেহ কাঁদিয়া আকুল,
কেহ ভুমে গড়ি যায় হইয়া ব্যাকুল,
অশ্রু কম্প স্বেদ দৈন্য পুলক হুঙ্কার,
এসব লক্ষণ বল হয় কিসে আর।
তুচ্ছ মণি প্রবালাদি করিয়া ধারণ,
তাহার অচিন্ত্য শক্তির হয়ত প্রমাণ,
আর এই অপ্রাকৃত হরিনামে ভাই,
থাকিবে অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি সংশয়।
সাধন করিলে পাবে ইহার প্রমাণ,
তখন বুঝিবে নাম সর্বশক্তিমান।
করে দেখ নামের সাধন—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন নাম কীর্ত্তন—করে দেখ নামের সাধন। (মাতন)

নামের অচিন্ত্যশক্তি জীবে শিক্ষা দিতে,
প্রকাশানন্দে কহে প্রভু বিনয় ভঙ্গিতে।
"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ,
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন,
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার,
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।
কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন,
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম,
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম।
এই আজ্ঞা পায়া নাম লই অনুক্ষণ,
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন।
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত,
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত।"
"পাগল হৈলাম আমি ধৈর্য্য নহে মনে,
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে,
কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল,
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন,
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব,
যেই জপে তারে কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।"
"ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ,
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন
কৃষ্ণ নাম উপদেশী তার ত্রিভুবন।"
কৃপায় প্রকাশ হন এই সব তত্ত্ব,
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব,
অতএব বৃথা তর্ক না করিহ ভাই,
অপ্রাকৃত কৃষ্ণ নামের তুলনা কোথায়।
বল বল রে—সংশয় ত্যাগ করে,

প্রাণ খুলে বাহু তুলে—বল বল রে—
হরে কৃষ্ণ হরে হরে—বাহু তুলে প্রাণভোরে। (মাতন)
"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার,
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।"
(দেখ) নাম মাত্র সার করি প্রহ্লাদ বাঁচিল,
বিষে জলে অগ্নি কুণ্ডে কিছু না হইল।
নাম ছাড়া নামী কভু নহে অন্য স্থানে,
যথা নাম তথা নামী জেনো ভাই মনে।
বহু সাক্ষী আছে এর—
নাম নামীর অভিন্নের—বহু সাক্ষী আছে এর,
লীলায় শ্রীগোবিন্দের—বহু সাক্ষী আছে এর।
(দেখ) কৌরব সভায় যবে দ্রৌপদী আকুলা,
লজ্জা রক্ষা হেতু কত উপায় চিন্তিলা,
ইন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামী সম্মুখে বসিয়া,
জগত বিমুগ্ধ যাদের প্রতাপ হেরিয়া,
তাদেরও দেখিয়া আজ অক্ষম দুর্ব্বল,
লজ্জায় দ্রৌপদী আরো হইলা বিকল।
যথা নাম তথা নামী দ্রৌপদী ভুলিয়া,
অন্য উপায়ের পানে ছিলেন চাহিয়া,
যখন দেখিলা আর নাহিক উপায়,
কৃষ্ণনাম সেই মনে হইল উদয়।
"লজ্জানিবারণ" বলি যেমনি ডাকিলা,
লজ্জানিবারণ নাম তখনি শুনিলা,
বসন রূপেতে আইল লজ্জানিবারণ,
যত টানে তত আসে অনন্ত বসন,
কার সাধ্য লজ্জা দেয় তাঁর ভক্ত-জনে,
নাম নামী যেই জন এক করি মানে।
শ্রীমুখের বাণীরে—
"ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"—শ্রীমুখের বাণীরে,

"মোর সুদর্শন চক্রে রাখে মোর দাস,
মহা প্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ।"
অভয় দেওয়া, হরিনাম,
সর্ব্ব ভয়হারী নাম—
হরে কৃষ্ণ হরে রাম—সর্ব্ব ভয়হারী নাম,
বল বল অবিরাম—হরে কৃষ্ণ হরে রাম। (মাতন)
এবে শুন আরও তার করুণা অপার,
নাম লৈতে না রাখিলা কালাদি বিচার।
যদি কেহ কহে নাম জানি বহু হয়,
অচিন্ত্য তাহার শক্তি ইহাও নিশ্চয়,
নানা কার্য্যে থাকি ব্যস্ত বিষয় লইয়া,
কখন লইব নাম নিয়ম করিয়া।
বদ্ধ জীব উদ্ধারিতে হরি দয়াময়,
মনে হয় নিজে যেন ঠেকেছেন দায়,
হেন ভাবে কহে প্রভু শুন জীব আর,
নাম লৈতে নাহি কোন কালাদি বিচার।
খাইতে শুইতে কিম্বা উঠিতে বসিতে,
স্বদেশে বিদেশে কিম্বা পথেতে যাইতে,
নগরে গ্রামেতে কিম্বা পর্ব্বত প্রান্তরে,
মরু বা সাগর মাঝে গহন কান্তারে,
যখন সুবিধা হবে তখনই নাম,
যেখানে যেভাবে থাক করিও গ্রহণ,
শুচি বা অশুচি হোক কোন শঙ্কা নাই,
কৃষ্ণ নাম পরশেই সব শুদ্ধ হয়।
কলিহত জীবে হেরি দুর্ব্বল অক্ষম,
নাম লৈতে না রাখিলা কোনই নিয়ম।
"খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়,
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"
"যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ,
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ।"
কহ, শুন, জপ স্মর, কর সঙ্কীর্ত্তন,
যে নাম যে ভাবে ইচ্ছা করহ গ্রহণ,

শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণ হোক কোন শঙ্কা নাই,
নামের আভাস মাত্রে সব শুদ্ধ হয়।
মুখ্য ফলে কৃষ্ণ পদে ক্রমে প্রেম ভক্তি,
গৌণ ফলে সর্ব্বানর্থ করয়ে নিবৃত্তি।
"শ্রদ্ধায় হেলায় যেবা লয় একবার,
সত্য সত্য সেই তরে এ ভব সংসার।"
পুরে সব মনস্কাম—
যে কোন ভাবে নিলে নাম—পুরে সব মনস্কাম,
পুরায় সবার মনস্কাম—হরে কৃষ্ণ রাম নাম। (মাতন)
তাই গৌরহরি বলেছেন,
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু—গৌরহরি বলেছেন,
"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন,
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন,
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য,
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য,
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার,
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্,
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।"
কুলের গরব ত্যাগ কর—
পাণ্ডিত্যের অভিমান ছাড়—
দীন হয়ে ভক্ত চরণে পড়—
হরে কৃষ্ণ নাম বুকে ধর, নামের মালা গলায় পর। (মাতন)
আরও এক কৃপা তার শুন চমৎকার,
বদ্ধজীব উদ্ধারিতে এত যত্ন কার।
সারাদিন খাটিয়াছ সংসারের তরে,
অবসন্ন দেহ যদি বাক্য নাহি সরে,
কৃষ্ণ নাম তবে জীব করহ স্মরণ,
উচ্চারিতে যদি তবে নাহি লয় মন,
স্মরণেও সব পাপ দূরে তবে যাবে,
অচিরাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবে।

ইহাতেও কৃষ্ণ নাম যেই নাহি লয়,
দুর্দ্দৈব তাহার সম জগতে কোথায়।
সবার উপর মানব জনম—
অতি সৌভাগ্যের নিদর্শন—
ভজন সাধন ইহার ধরম—
নাম কীর্ত্তন পরম সাধন—কর হরিনাম স্মরণ কীর্ত্তন। (মাতন)
কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন,
নামাশ্রয়ে কর আর যা কিছু সাধন,
মুখ্য ভাবে নাম, গৌণ ভাবে অন্য অঙ্গ,
করিলে সাধন নাশে সংসার তরঙ্গ।
"হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রামরায়,
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন,
সেইত সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ।"
"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম,
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।"
নামকীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম—কলি জীবের পরম সাধন। (মাতন)
(আবার) নামী হতে নাম বড়,
গোবিন্দের কৃপার কথা যদি চিন্তা কর—
দেখবে নামী হতে নাম বড়,
ধর হেন নাম ধর,
কৃপাধিক্যে নাম বড়—ধর হেন নাম ধর
নামী হতে নাম বড়—ধর হেন নাম ধর। (মাতন)
(দেখ) স্বরূপে প্রকট হয়ে, পরিকরগণ লয়ে,
করিলা যে লীলার প্রকাশ।
সাধারণ জীব যত, চিরদিন বঞ্চিত,
শ্রবণ গোচর শুধু সে সব বিলাস।
বিগ্রহের অর্চ্চনে, যোগ্য নহে সব জনে
তাহে কত নিয়ম আচার।

নীচ তুচ্ছ জাতি যত, দর্শনেও বঞ্চিত,
কত বাধা পদে পদে তার।
কিন্তু দেখ সেই হরি, অক্ষর আকৃতি ধরি
প্রকটিত করিয়া আপনে।
সেবোন্মুখ জিহ্বায়, উচ্চারিত স্বকৃপায়,
(তাই) হরিবলে মদ্যপে যবনে।
(নাম) সবে দিলা অধিকার, বিচার নাহিক আর
যেই লয় পায় প্রেমধন।
ধর হেন নাম ধর, নামী হৈতে নাম বড়,
কায় মনে লহ রে শরণ।

অগতির গতি নাম—
হরে কৃষ্ণ হরে রাম—অগতির গতি নাম। (মাতন)
অনন্ত অসীম তার করুণা অপার,
জীব উদ্ধারিতে ভাই এত যত্ন কার।
যত বাঞ্ছা তত নাম করিলা ধারণ,
প্রতি নামে সর্ব্বশক্তি করিলা অর্পণ।
নাম লৈতে কালাকাল না দিলা বিচার,
নাম লৈতে চণ্ডালেরও সম অধিকার।
যদি কেহ আলস্যেতে না করে উচ্চারণ,
পাপ শূন্য হবে সেহো করিয়া স্মরণ।
অগতির হেন গতি আছে কি কোথায়,
করুণার পারাবার হেন আর নাই।
কৃপাসিন্ধু হরি, হরি নাম—
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ রাম—কৃপাসিন্ধু আনন্দ ধাম। (মাতন)
পক্ষী যৈছে আকাশের অন্ত নাহি পায়,
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায়,
তৈছে হরিনামে হয় অনন্ত মহিমা,
অনন্ত কাল বলিলেও নাহি পাই সীমা।
ক্ষুদ্র হৈয়া আমি তাহা বর্ণিব বা কত,
সংক্ষেপেতে কহি তাই মোর সাধ্য মত।
শ্রীগুরু কৃপায় পাইনু যে শক্তির কণ,
তাহা দিয়া হৈল মোর এ মালা গ্রন্থন,

ভক্তগণ কৃপা করি পর এই হার,
সার্থক হউক সব উদ্যম আমার।
দাস গোকুলানন্দের এই নিবেদন,
হরিনাম হোক সবার কণ্ঠের ভূষণ,
(যেন) সবে মিলে প্রাণ খুলে বলি অবিরাম,
জয় যুক্ত হউক, সদা হরে কৃষ্ণ নাম।
গৌর হরিবোল হরিবোল হরিবোল বল ভাই। (মাতন)

শ্রীশ্রীঠাকুরকানাই বংশীয়
গ্রন্থকারের অনুজ
শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী
বিরচিত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা কীর্ত্তন
সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট—(খ)

শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের পদ্যে ভাবানুবাদ

(১)

স্বাভাবিক সুনির্মল মানস মুকুর
মানবের দর্পণের মত কলুষিত
হয় তাহা, কামক্রোধলোভ মায়া—ঘাত
প্রতিঘাতে, মালিন্যের মলভার করে,
যবে তায়, বিমলিন হয় ; অন্ধকার ;
একমাত্র প্রতিকার, আছে, আছে তার,—
নাম সঙ্কীর্ত্তন ; হরিনাম সুধারসে,
রজনী দিবসে, ঐকান্তিক নিমগন ।।১।।

দাবদগ্ধকায়, হরিণীর প্রায়, নর
ত্রিতাপ তাপিত যবে, করে ছুটাছুটি
ভবে, শান্তিহীন নিশিদিন সকাতর,—
একমাত্র প্রতিকার আছে, আছে তার,—
নাম সঙ্কীর্তন ;—হরিনাম সুধারসে,
রজনী দিবসে, ঐকান্তিক নিমগন ।।২।।

বিষাদেতে চিরখিন্ন—আশা আলো শূন্য
বিষয়ী মানব, একদিকে যথা পায়
আনন্দ অভয়, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
করিয়া আশ্রয়, অন্য দিকে ভক্তদল,
ভুবন মঙ্গল নামসঙ্কীর্তনে করি
নিরীক্ষণ,—দেখে সেথা শত শতদল
শ্রেয়োরূপপরিমল করে বিতরণ ।।৩।।

বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ পাঠ ক'রে প্রাণ
যদিও নিমগ্ন হয় বিপুল হরষে,—
সলাজ বালিকা প্রায়, বিদ্যাবধু চায়—
সঞ্জীবিত হয় সেগো নাম সুধারসে ।।৪।।

আনন্দের উর্ম্মিমালা, নামে প্রেমে ক'রে
খেলা, দীর্ঘ হ'তে হ'তে হয় দীর্ঘকায়,—
নামে,—প্রত্যেক অক্ষরে, কি অমৃত ঝরে !
ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ হয়, তার তুলনায় ।।৫-৬।।

স্থাবর জঙ্গম আদি যেখানে যে আছে,
সকলেই চিরতৃপ্ত সঙ্কীর্ত্তন মাঝে।
সর্বেন্দ্রিয়-বিমোহন হরিসংকীর্তন,—
প্রতিধ্বনি তৃপ্ত করে, যেবা অচেতন ।।৭।।

নামসংকীর্তন হ'তে এ জগতে আর
নাহি শ্রেষ্ঠতম কিছু,—মঙ্গল আধার ;
সর্বশ্রেষ্ঠ সংকীর্তন—ভুবন-মঙ্গল
বিজয় পতাকা ঐ শোভে শীর্ষস্থল ! ।।৮।।

(২)

সংসার জলধিবক্ষে মজ্জমান হায় ?
শত শত নারী নর, ব্যাকুল অন্তর,
দিতেছে সাঁতার—অহর্নিশ অসহায়,
তাহাদের উদ্ধারের উপায় বিধান
করিবারে প্রভো ! ধরেছ সহস্র নাম !
অসংখ্য নামের ভেলা উড়াইয়া তাহে
বিজয় নিশান—পতিতের তরে প্রভো !
'পতিতপাবন' নাম, অনাথের তরে
'অনাথ-শরণ, দীন তরে দীনবন্ধু,
"লজ্জা নিবারণ" তার তরে,—যেই জন
লজ্জায় কাতর,—ছাইয়াছ নামে নামে
উত্তাল জলধিবক্ষ ; প্রয়োজন যার
যাহা আছে, তার কাছে ঠিক ঠিক তাই—
অপূর্ব নামের ভেলা ! বুক দিয়া তাহা
করিলে আশ্রয়—কি ভয় জীবের আর ?
ভবপারাবার, গোষ্পদ আকার, হয়

কাছে তার ! শুধু নাম নহে—নাম সহ
সর্বশক্তি তব দেব ! দিয়াছ গাঁথিয়ে,—
নাম নামী কোন ভেদ রাখ নাই—দুয়ে।
তাহা ছাড়া নাম ল'তে কঠোর নিয়ম
নাহি কোন—কালাকাল নাহিক বিচার,—
ভুবন-মঙ্গল নাম—যথা তথা, যার তার !
এতাদৃশী তব কৃপা, ওহে দয়াঘন !
কিন্তু কি দুর্দ্দৈব ঘোর ! এ' নামেতে মোর,
নাহি হ'ল অনুরাগ—ধিক এ জীবন !

(৩)

বিদ্যাবিত্ত, কুলশীল, রূপের সম্ভার
নহে চিরস্থায়ী কিছু—হয় অন্তরায়,
শ্রীহরি পূজায় ; তৃণতুল্য তাই করি
জান আপনারে,—যে ভজিতে পারে, দীন—
ভাবে ভগবান্,—সংসার প্রান্তরে, বৃক্ষ
সম করে, যেই দীন হীন অকিঞ্চনে
আশ্রয় প্রদান ; একমাত্র করে যেই
ঈশ্বরে নির্ভর ;—পর গলগ্রহ, কিম্বা
পরমুখাপেক্ষী, হয় নাক সেই নর,
শত অপকার সহ্য করে অকাতর ;
সকলেই যথোচিত করে মান, ভাবে
মনে, সর্বজীবে শ্রীহরির অধিষ্ঠান—
অমানী আপনি,—জানি, শ্রীহরি কীর্তন
তাহারই সার্থক ভবে—ধন্য সেই জন।।

(৪)

ধন জন নাহি মাগি সুন্দরী রমণী,
নাহি চাই কবিতায় প্রতিষ্ঠা—সম্মান,
ফুটে যেন জন্মে জন্মে, করুণা নিধান।
শুদ্ধাভক্তি তব প্রতি—আপনি আপনি।।

(৫)

সংসার পারাবার—দুরন্ত দুর্গম, হে নন্দনন্দন !
পড়িয়াছে দাস তাহে মায়াবদ্ধ হয়ে,
শ্রীচরণপ্রান্তে তারে কর হে স্থাপন।
ধূলি যথা থাকে সদা চরণ আশ্রয়ে।।

(৬)

সেই শুভদিন কভু হবে কি আমার ?
তব নাম নিতে নয়নে বহিবে ধার !
বদনে গদগদ বাণী—পুলকের ভরে
রোমাঞ্চিত কলেবরে লুটাব অবনী—
সেই শুভদিন হবে কি আমার স্বামী ?

(৭)

তোমা হারা হ'লে প্রভো ! সব অন্ধকার !
নিমেষ যে হয় জ্ঞান—যুগের সমান,
বহে অশ্রু—যথা বরষার বারিধার !
গোবিন্দ বিরহে যার হৃদয় কাতর,—
তার জ্বালা সেই জানে—কি জানে অপর ?

(৮)

বুকে ক'রে, স্নেহভরে, পদাশ্রিত জনে
দিন আলিঙ্গন, কিম্বা না দিয়ে অধীনে
ধরা, দিন তারে মর্ম্মপীড়া,—কিম্বা চির
অদর্শন, লম্পটের মত পরাসক্ত—
চিত্ত, কিম্বা যথাতথা করুণ ভ্রমণ—
আমার প্রাণের প্রাণ তিনি,—নহে অন্যজন !
তাঁর ইচ্ছা হয় যাহা, হ'ক তাহা, আপুরণ!
তিনি প্রভু, তিনি স্বামী—তাঁতে বিকায়েছি আমি,
নাহিক স্বাতন্ত্র্য আর—তাঁহা ছাড়া মোর কোন।।

আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাতীর্থ,
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, বি.এ., এল.এম.এস.,
বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক রচিত।

পরিশিষ্ট—(গ)

বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা

বিশ্বাসই ভজনের প্রাণস্বরূপ। ভজনরাজ্যে বিশ্বাসই আদি—বিশ্বাসই মধ্য—বিশ্বাসই অন্ত্য ; বিশ্বাস হইতেই ভজনসাধনের আরম্ভ ও বিশ্বাসই ভজনসাধনের পর্য্যবসান। সূত্রের দ্বারাই যেমন বস্ত্রের পরি-নির্ম্মাণ,—সেইরূপ ভজনসাধন শুধু বিশ্বাসময়—বিশ্বাস দিয়াই পরি-গঠিত। বিশ্বাসের অপর নাম "শ্রদ্ধা"।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।।" (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২।২২।৬২)

কোমল শ্রদ্ধা বা অপরিপক্ক বিশ্বাস হইতে ভজনের আরম্ভ ও প্রগাঢ় বিশ্বাসই ভজনের পরিসমাপ্তি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সাধনভক্তি হইতে প্রেমভক্তি প্রাদুর্ভাবের স্তর এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তি স্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়ঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।। (১।৪।১৫-১৬)

উক্ত শ্লোকে যে সাধুসঙ্গ (দ্বিতীয়) ভজনক্রিয়া, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, উহা সেই প্রথমোক্ত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসেরই ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর অবস্থাভেদের নামান্তর মাত্র। যাহা পূর্ণ বিশ্বাস—যাহা প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা, তাহারই নাম 'প্রেম'। প্রগাঢ় বিশ্বাস বা প্রেমই সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন।

জীবমাত্রেই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আছে। তবে "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।২।২০।১১৭) বলিয়া জীবের সেই বহির্ম্মুখ বিশ্বাসের আলোকে পশ্চাদ্বর্ত্তী চিৎবস্তু সকল প্রকাশিত না হইয়া সম্মুখস্থিত জড়ীয় বা ব্যবহার বিষয়কেই নিয়ত প্রকাশ করিতেছে। জাহাজের "সার্চলাইট" যেমন সম্মুখের বস্তু প্রকাশ করিলেও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বস্তুসকল প্রগাঢ় অন্ধকারেই আবৃত থাকে, সেইরূপ বহির্মুখ জীবেও শ্রদ্ধার আলোক বিপরীতমুখতা প্রাপ্ত হওয়ায় জড়ীয় বা মায়িক বিষয়ব্যাপারের উপর তীব্র বিশ্বাস প্রতিফলিত হইতেছে ও চিন্ময় ভগবৎ বিষয় প্রগাঢ় অবিশ্বাসের অন্ধকারেই আবৃত রহিয়াছে। তাই জীবসাধারণের বিষয়সুখে প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং কৃষ্ণসেবা সুখে প্রগাঢ় অবিশ্বাস দেখা যায়। জীবমাত্রেরই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকিলেও, যাহা প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধা বা বিশুদ্ধ বিশ্বাস,—অনাদি বহির্ম্মুখ জীব তাহা

হইতে চিরবঞ্চিত ! শ্রীভগবানে বিশ্বাসই প্রকৃষ্ট বিশ্বাস ও বিশ্বাস-নামের যথার্থ সার্থকতা। প্রাকৃত বিষয়সুখে বিশ্বাস, ইহা খুবই সাধারণ—খুবই সুলভ ; সুতরাং ইহা হেয় বস্তু ; ইহা কীটেতেও সম্ভব হইয়া থাকে বলিয়া তাই ইহার নাম 'কাম' ; —চিরকর্ম্মবন্ধন—চিরগতায়তের যাহা একমাত্র কারণ। শ্রীভগবানে বিশ্বাস খুবই অসাধারণ—খুবই দুর্ল্লভ বস্তু ; এমন কি ইহা দেবতাতেও দুর্ল্লভ বলিয়া তাই ইহার নাম 'প্রেম' ;—পরমানন্দ সাগরে চিরাবগাহন—চিরপূর্ণতা প্রাপ্তিই যাহার ফল। ভগবানে বিশ্বাস, অর্থাৎ জীবের স্বভাবসিদ্ধ ও বিপরীত গতি প্রাপ্ত বিশ্বাসে দিক্‌পরিবর্ত্তন কার্য্য, বহুভাগ্যসাপেক্ষ। ইহা কোন ভাগ্যে, কোনও জীবের লাভ হইয়া থাকে ; তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।২।২৩।৯) ইত্যাদি। সাধুসঙ্গই উক্ত অনির্ব্বচনীয় কোন ভাগ্যের' জন্মমূল ; তাই শাস্ত্র আবার বলিয়াছেন—"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ২।২২।৪৯) ;—ইত্যাদি। বহির্ম্মুখ শ্রদ্ধার আলোকে ধন, ধান্য, স্ত্রী, পুত্র, প্রতিষ্ঠা, বিভবাদিকেই সুখের হেতু মনে করিয়া সে সকলের প্রতি জীবের নিত্যশ্রদ্ধা রহিয়াছে ; সাধু শাস্ত্রাদির কৃপায় সেই শ্রদ্ধা ক্রমশ দিক্‌পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণোন্মুখী হইবার প্রারম্ভকাল হইতেই শুদ্ধ বিশ্বাসের আরম্ভ হয় ; অতএব সুদুর্ল্লভ ভগবৎ বিশ্বাস প্রাপ্ত হওয়া অতি ভাগ্যসাপেক্ষই জানিতে হইবে।

ভগবৎ-বিশ্বাস-কণা কোন ভাগ্যে প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে ঘনীভূত বিশ্বাস বা প্রেমরূপে পরিণত করিবার জন্য, সেই বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষা আবশ্যক হইয়া থাকে। অনল-পরীক্ষায় সুপরীক্ষিত বিশ্বাসই বিশুদ্ধ প্রেম-নামের যোগ্য হয়। তরল বিশ্বাসের মধ্যে যে অবিশ্বাসের মলিনতা লুক্কায়িত থাকে, অনল-পরীক্ষা ব্যতীত তাহার পরিশুদ্ধির অন্য উপায় নাই ; অতএব এই পথে বিশ্বাসী বা ভক্তকে বিশ্বাসের অনল-শুদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

অগ্নিতে পরিদগ্ধ না হইলে সুবর্ণ ব্যবহারোপযোগী হয় না ; যতক্ষণ তাহাতে ধাতুমল নিহিত থাকে ততক্ষণ যেমন অগ্নিতে পরিদগ্ধ হইবারও আবশ্যকতা থাকে, কিন্তু পরিশুদ্ধ হইয়া যাইলে যেমন তাহার অনল-শুদ্ধির অবসান হয় ; বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষায়ও সেই এক উদ্দেশ্য। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ; সুতরাং পরীক্ষার দ্বারা কিছুই অবগত হইবার আবশ্যকতা তাঁহার নাই ; অতএব এই পরীক্ষাকে শিক্ষাই জানিতে হইবে ; অগ্নি পরীক্ষার অর্থ 'অগ্নিশুদ্ধি'।

ভগবৎ-বিশ্বাসের মালিন্য-নাশই প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা ; বিশ্বাসের তারল্যকে প্রগাঢ়তা প্রদান করা দ্বিতীয় অগ্নি-পরীক্ষা ; এবং সর্বপ্রকার দহনে অপরিদগ্ধতা

সংসিদ্ধই তৃতীয় পরীক্ষা ; যে বিশ্বাস অনলশুদ্ধির এই আদি, মধ্য ও অবসান অতিক্রম করিয়াছে, তাহারই নাম সিদ্ধ-বিশ্বাস বা 'প্রেম'। একমাত্র ইহার দ্বারাই ভগবৎ সেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং কেবল সিদ্ধভক্তগণই ইহার অধিকারী।

অতএব ভক্তির সাধকমাত্রকে বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য উৎসাহের সহিত প্রস্তুত হইতে হইবে ; তাহার জন্য ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। বিশ্বাসের অনল-শুদ্ধি যত শীঘ্র আমরা শেষ করিয়া ফেলিতে পারিব, সকল পরীক্ষার অবসান-কাল ততই দ্রুততর আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। যে পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারা যায়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষারও বিরাম অসম্ভব বলিয়াই জানিতে হইবে। বিশ্বাস যে মুহূর্ত্তে নির্ম্মল ও প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইবে, যে মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার দহনেও দাহিকাশক্তি আর অনুভূত হইবে না, জানিতে হইবে সেই বিশ্বাস সুসিদ্ধ হইয়াছে, সেই বিশ্বাসীর আর কখনও কোনদিন—কোনও পরীক্ষা নাই, অগ্নি-শুদ্ধির যাহা উদ্দেশ্য,—সেই প্রয়োজন তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অগ্নিশুদ্ধ কনকভূষণ যেমন রাজ-অঙ্গে চির শোভিত থাকে,—আর তাহার অগ্নি-পরীক্ষা নাই, তেমনি অনল-পরীক্ষিত বিশ্বাসী বা সিদ্ধভক্ত, নিখিল বিশ্বের রাজাধিরাজ যিনি, সেই শ্রীভগবানের চরণভূষণরূপে চির-ভূষিত হইয়া, চিরদিনের মত চির-পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পরীক্ষিত তিনি আর কোনও দিন তাঁহাতে কোনও পরীক্ষার সম্ভাবনা নাই।

বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষার জন্য যদি আমরা প্রস্তুত হইতে না পারি, তাহা হইলেও অনলতাপ হইতে অব্যাহতি লাভের সম্ভাবনা নাই। ভব-দাবানল হইতে নিরন্তর উত্থিত ত্রিতাপের তুষানলে, এই সংসার-সাধন-ভূমিতে সকলকেই পরিদগ্ধ হইতে হইতেছে ও হইবে। এই সংসার, শোধনাগার বলিয়া ইহা অনলকুণ্ড-স্বরূপ জানিতে হইবে। জীবের অশুদ্ধ বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্যই এই অনল-গেহ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং যজ্ঞের অগ্নি হইতেও এই সংসারের এই শোধনাগ্নি পরম পবিত্র—পরম মঙ্গলময় ! এই সংসারকে 'কৃষ্ণদাস' নির্ম্মাণের কারখানা বলিয়া বুঝিতে পারিলে তখন আর মায়াকে পিশাচী বলিবার ইচ্ছা হয় না ; তখন মনে হয় মায়া মঙ্গলময়ী শিক্ষয়িত্রী, জীবের দোষদুষ্ট বিশ্বাসকে শিক্ষার অনলে শোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার যিনি উপযুক্ত করিয়া দিতেছেন, তাঁহা অপেক্ষা জীবের হিতাকাঙ্ক্ষিণী আর কে আছে ? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২।২০।১১৭)

মায়াকর্ত্তৃক এই সংসার দুঃখ প্রদান, ইহা দুঃখ দিবার উদ্দেশ্যে নয়,— কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্যই। সংসার শোধনাগ্নি-কুণ্ডে অবস্থানকালে, দুঃখে ভয় ও সুখে অভিলাষ—ইহা অপেক্ষা অবিদ্যার পরিহাস আর কিছুই হইতে পারে না ; অগ্নিকুণ্ডে পার্শ্বপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক শয়নসুখাভিলাষের মতই ইহা বাতুলতা মাত্র।

এই সংসার-শোধনাগারে যতক্ষণ আমরা দুঃখে ভীত ও সুখের আশায় ধাবিত হইব সে পর্য্যন্তই মায়া কর্ত্তৃক কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে সংসার অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান করিতেই হইবে ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা সংসারকে শোধনাগার বুঝিয়া বিশ্বাসের অগ্নিশুদ্ধি গ্রহণ করিবার জন্য, দুঃখের অনলশিখাকে দেবতার নির্ম্মাল্যের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিতে পারিব, তখন হইতেই মায়া, আমাদের কর্ম্মপাশ খুলিয়া দিবেন ; তখন হইতেই সেই জীবের সুখ দুঃখ আর কর্ম্মাধীন নহে,— ঈশ্বরাধীন। অনাদিকাল হইতে এই সংসারের ত্রিতাপজ্বালা আমরা ভোগ করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু স্বেচ্ছায় নহে—অনিচ্ছায়। আর এই অনিচ্ছা—এই দুঃখভীতি যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ; কিন্তু সেই একই ত্রিতাপ—একই সংসার দুঃখ, যখনই আমরা বিশ্বাসের অনল-পরীক্ষারূপে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারিব, সেই আলিঙ্গিত অনল শিখাই সমস্ত অনলতাপ চিরনির্ব্বাণ করিয়া দিবে। উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে বিষই যেমন বিষের ঔষধ হয়, সেইরূপ এই সংসার-দুঃখে যে পর্য্যন্ত ভয় থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভবভয়ে কাহারও অব্যাহতি নাই ; আর যখনই সংসার দুঃখকে বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষা বলিয়া বোধ হইবে, সেই দুঃখ ভোগেই সকল দুঃখের চিরাবসান হইবে। প্রয়োগের পার্থক্যে একই বস্তুর এতাদৃশ বিভিন্ন ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; তাই শাস্ত্র বলিয়া- ছেন ;—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্মব্রহ্মণি ভাবিতম্।।
আমায়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্।।

(শ্রীভাগবত—১।৫।৩২-৩৩)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, দুঃখপরিহার ও সুখ-প্রাপ্তি ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহাই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই একই কর্ম্ম, সর্ব্বনিয়ন্তা—পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত হইলে, সেই কর্ম্মই তাপত্রয়ের নিবর্ত্তক হয় বলিয়া, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছেন ;—হে সুব্রত ! যে ঘৃতাদি গুরুপাক দ্রব্য সেবন করিয়া জীবের রোগোৎপত্তি হয়, কেবল সেই দ্রব্য সেবনে কখন ব্যধিনাশ হয় না ; কিন্তু সেই

ঘৃতাদি দ্রব্যই ভেষজাদি দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত করিয়া (যেমন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত ঘৃতাদি ঔষধ) সেবন করিলে আবার তাহাতেই ব্যধি নিরাময় হইয়া থাকে।

সংসারে দুঃখ, শোক, অপমান, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার আগুন যতই অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে, বিশ্বাসী সাধককে মনে করিতে হইবে, তাঁহার বিশ্বাসের পূর্ণ-শুদ্ধির দিন ততই নিকটতর। দুঃখের অনল অধিকতর প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া মুখে বিষাদরেখা ফুটিয়া উঠিলে তাহাকে দুর্ল্লক্ষণ বলিয়াই জানা আবশ্যক। দুঃখ ও বিপদের শত অশনিপাতেও যে বিশ্বাস ম্লান না হইয়া যত অধিকতর উজ্জ্বলতা ধারণ করে সেই বিশ্বাসই প্রগাঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইবার তত উপযুক্ত। বিশ্বাসীকে ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া, অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়াই এই সংসার পথ অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সকল অবস্থায়—সর্ব্বভাবে সেই চিরাভীষ্ট দেবতা যিনি,—তাঁহার পদকমলের পরাগকণার উপর বিশ্বাস-ভ্রমরকে অটল ও অচলভাবে সংরক্ষিত করিতে হইবে। জগতের সুখ ও দুঃখ তাঁহারই মঙ্গল-হস্তের দান মনে করিয়া, সমচিত্তে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। মেঘাম্বুব্রত চাতক যেমন তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াও একমাত্র জলধরের কৃপাকণার প্রতীক্ষায় চাহিয়া থাকে ; তাহার ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট সিক্ত করিয়া দিবার পক্ষে পৃথিবীতে নদ, নদী, খাল, বিল যথেষ্ট জলধারণ করিলেও সেই জলধরের জলকণার একনিষ্ঠ পাখী, যেমন অন্য বারি পান করে না ; বারিবিন্দুর আশায় মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যদি বেলা অবসানে বারির পরিবর্ত্তে বজ্রও পতিত হয়, তথাপি যেমন চাতকের নিষ্ঠা সেই জলধরের প্রতিই অবিচলিত থাকে,—সেইরূপ কৃষ্ণ-জলধরের প্রেমবারির চাতক হইতে অভিলাষী যাহারা, তাঁহাদিগকে গগনবিহারী চাতকের মতই ব্রতধারী হইতে হইবে ; চাতকের মতই কৃষ্ণ-জলধরের একনিষ্ঠ সেবক হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইতে হইবে ; সেই আত্মার আত্মা—সেই প্রাণবল্লভ—সেই জীবন দেবতার নিকট হইতে, শোধনের উপযুক্ত বিবেচনায় বারি অথবা বজ্র, যে ব্যবস্থাই আসুক না কেন, তবু তাঁহারই চরণে বিশ্বাস-ভক্তি চাতকের মতই অবিচলিত রাখিতে সমর্থ যাঁহারা,—বিশ্বাসের বিজয়-মাল্য তাঁহাদেরই।

সংসারে শত ঘাত-প্রতিঘাতেও যে বিশ্বাস অবিকৃত, শত নির্য্যাতনে—শত পরীক্ষার দহনেও যে বিশ্বাস অবিকৃত, শ্রীভগবৎপাদপদ্ম অর্চ্চিত হইবার পক্ষে তাহাই উপযুক্ত অর্ঘ্য ; ভবদাবাগ্নির উত্তাপ হইতেই তাহার উৎপত্তি। সেই প্রাণবল্লভের পূজার সম্ভার যে অনলতাপ হইতে প্রস্তুত হয়, সেই পবিত্র ত্রিতাপের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, শুদ্ধির অনলকুণ্ডে যাঁহারা আত্মাহুতি দিতে পারিয়াছেন, সেই

অগ্নি-শিখার অব্যক্ত ধ্বনির মধ্যে তাঁহারাই শুনিতে পান,—বাইশ বাজারের প্রত্যেক বেত্রাঘাত শব্দের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীব্রহ্মহরিদাসের সেই জ্বলন্ত বিশ্বাসবাণী এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম"।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত—১।১৬।৯৪)

বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষায় অবিকৃত যাঁহারা, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উক্ত হইয়া থাকে ; যথা—

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণম্।।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনঃ চন্দনশ্চারুগন্ধম্।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি-বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাম্।।

অর্থাৎ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়াও যেমন ইক্ষুদণ্ড তাহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টতাকে পরিত্যাগ করে না, দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াও যেমন কাঞ্চন তাহার স্বভাবসিদ্ধ কান্তি ও বর্ণকে পরিত্যাগ করে না, ঘর্ষণ প্রতিঘর্ষণেও যেমন চন্দন তাহার স্বাভাবিক সুগন্ধকে পরিত্যাগ করে না, তেমনি প্রাণান্তেও সাধুগণের স্বভাব কখনও বিকৃত হয় না।

ভজনের পথে, বিশ্বাসের মালিন্য নাশের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখাগ্নিতে আত্মাহুতি রূপ ইহাই প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা।



বিঃদ্রঃ—গ্রন্থকার কৃত উক্ত রচনাটি 'বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা' নামক প্রবন্ধের অংশবিশেষ, যাহা শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দেব দাস সম্পাদিত 'শ্রীশ্রী সোনার গৌরাঙ্গ' নামক মাসিক পত্রিকাতে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের (৯ম বর্ষ) শ্রাবণ মাসে (১ম সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান জগতের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মসংকটের জটিলতার মধ্যে বিভ্রান্ত ধর্মানুসন্ধিৎসু জনগণকে বেদ ও ভাগবতাদি শাস্ত্র নিরূপিত সাম্যবাদ ও প্রেমধর্মের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শনের পক্ষে আলোকস্তম্ভ ও শান্তিলাভের পরম উপায় স্বরূপ কতিপয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

নামবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী বিরচিত
(মৌলিক সিদ্ধান্ত সমন্বিত ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জলুদাহরণ সহ)

(১) জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম— আনুকূল্য- ৫০ টাকা
(২) বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা— আনুকূল্য- ৬০ টাকা
(৩) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি, ১ম কিরণ— আনুকূল্য- ৩০ টাকা
(৪) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি, ২য় কিরণ— আনুকূল্য- ৪০ টাকা
(৫) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি, ৩য় কিরণ— আনুকূল্য- ৬০ টাকা
(৬) শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা — আনুকূল্য- ১০০ টাকা
(৭) শ্রীশ্রীরাগভক্তিরহস্য দীপিকা — আনুকূল্য- ৪০ টাকা
(৮) মানবজন্মের সার্থকতা ও সাধনা — আনুকূল্য- ৪০ টাকা

নামবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী সম্পাদিত
(৯) শ্রীভাগবতামৃতকণা — আনুকূল্য- ১০ টাকা

প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিহারীলাল গোস্বামী প্রণীত
(১০) শ্রীশ্রী কানুতত্ত্ব নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ— আনুকূল্য- ২৫ টাকা

প্রভুপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রণীত
(১১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণকমল গীতিকাব্য— আনুকূল্য- ১২০ টাকা

প্রভুপাদ শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী বিরচিত
(১২) শ্রীনামমহিমা কীর্তন, দ্বিতীয় সংস্করণ— আনুকূল্য- ২ টাকা

শ্রীমৎ গৌররায় গোস্বামী প্রণীত
(১৩) বৈদুর্য্য প্রবন্ধাবলী— আনুকূল্য- ৬০ টাকা
(১৪) ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নপঞ্চক— আনুকূল্য- ৮০ টাকা

শ্রীমৎ গৌররায় গোস্বামী সম্পাদিত
(১৫) আয়ুর্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও নাম-বিজ্ঞানাচার্য্য প্রভু-পাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য — আনুকূল্য- ৫০ টাকা

(১৬) মহৎসঙ্গ প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় সংস্করণ— আনুকূল্য- ৮ টাকা

(১৭) পত্রামৃত— আনুকূল্য- লৌল্যমেকলম্

শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী বিরচিত ভক্তিকাব্য গ্রন্থ

(১৮) পথের গান ও লালসা মুকুল, ১ম স্তবক — আনুকূল্য- ১১ টাকা

(১৯) লালসা মুকুল, ২য় স্তবক— আনুকূল্য- ১০ টাকা

(২০) লীলা মাধুরী— আনুকূল্য- ৪ টাকা

(২১) প্রেমাশ্রুধারা— আনুকূল্য- ১৬ টাকা

(২২) শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দলীলা—স্মরণমঙ্গল— আনুকূল্য- ৫ টাকা

(২৩) ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি— আনুকূল্য- ৪৫ টাকা

(২৪) ভক্তিকাব্য সংকলন— আনুকূল্য- ৪০ টাকা

(২৫) ভক্তিকাব্য মঞ্জুষা— আনুকূল্য- ৮০ টাকা

(২৬) ভক্তিকাব্য চয়নিকা— আনুকূল্য- ৫০ টাকা

(২৭) ভক্তিকুসুম পরাগ— আনুকূল্য- ৫৫ টাকা

(২৮) ভক্তিসুধা লহরী— আনুকূল্য- ১৭ টাকা

(২৯) ভক্তিসুধা তরঙ্গিণী— আনুকূল্য- ১৫০ টাকা

(৩০) ভক্তিরত্নমালা— আনুকূল্য- ১৫০ টাকা

শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী বিরচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ

(৩১) ভক্তিসিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা— আনুকূল্য- ৩০ টাকা

(৩২) ভক্তি-ব্রজ নবদ্বীপ (মাহাত্ম্য-কণিকা)— আনুকূল্য- ৩০ টাকা

পূর্ব বর্ণিত কতিপয় গ্রন্থের অন্যান্য সংস্করণ

(৩৩) The True Nature & Function of Living Entity (English Edition of 'Jiver Swarup O Swadharma')

(৩৪) The dawn of the Age of Love (English Edition of two articles of Srimat Kanupriya Goswami)

(৩৫) শ্রীশ্রীভক্তি-রহস্য কণিকা (হিন্দি)— আনুকূল্য- ৪০ টাকা

গ্রন্থপ্রাপ্তি স্থান

(১) শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী, শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ, নতুন চড়া, প্রাচীন মায়াপুর দক্ষিণ, নবদ্বীপ-৭৪১৩১০২, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

(২) স্বাগতম, মহাপ্রভুপাড়া, নবদ্বীপ-৭৪১৩০২, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

(৩) মডার্ন বুক ডিপো—হরিসভাপাড়া, নবদ্বীপ।

(৪) স্বর্গীয় শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী, ৩বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা- ৭০০০০২

(৫) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা- ৭০০০৭৩

(৬) শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস—শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর মন্দির, সীতানাথ লেন, প্রাচীন মায়াপুর, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

